তাওহীদের মূলনীতি
১ম খন্ড

شرح الأصول الثلاثة

আহমাদ মুসা জিবরিল

www.banglakitab.weebly.com

তাওহীদের মূলনীতি

প্রথম খণ্ড

আহমাদ মুসা জিবরিল

www.banglakitab.weebly.com

তাওহীদের মূলনীতি

[প্রথম খন্ড]

আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ
ইলমহাউস অনুবাদক টিম

অনুবাদ নিরীক্ষণ ও তথ্যসূত্র সংযোজন
শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

Ilmhouse

www.banglakitab.weebly.com

তাওহীদের মূলনীতি

[প্রথম খন্ড]

প্রথম সংস্করণ

সফর ১৪৪৯ হিজরি, নভেম্বর ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব © ইলমহাউস পাবলিকেশন ২০১৮

সর্বস্বত্ব ইলমহাউস পাবলিকেশন কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN: 978-984-8041-12-3

Ilmhouse

প্রকাশক

ইলমহাউস পাবলিকেশন

ফোন : +৮৮ ০১৮২৮৬১৬০৬৭

www.facebook.com/IlmhouseBD

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়
বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

নির্ধারিত মূল্য: ৩৬০ টাকা

Tawhider Mulniti (Principles Of Monotheism), Based on the lecture series 'Explanation of The Three Fundamental Principles' by Shaikh Ahmad Musa Jibril, Published by Ilmhouse Publication. First Edition, November 2018.

www.banglakitab.weebly.com

উৎসর্গ

বিশুদ্ধ তাওহিদের পথের পথিকদের প্রতি......

www.banglakitab.weebly.com

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

পূর্বকথা		১৭
লেখক পরিচিতি		২২
ভূমিকা	ইলম অর্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া	২৫
	ইলম অর্জনের তিন পদ্ধতি	২৭
	সালাফদের নিয়ম ছিল ইলম লিখে রাখা	২৮
	আল উসূল আস-সালাসাহ	২৯
দারস-১	বাসমালাহ	৩০
	বাসমালাহ-এর মাঝে নিহিত তাওহিদের শিক্ষা	৩০
	তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ	৩১
	তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত	৩১
	বাসমালাহ-এর ভাষাতাত্ত্বিক কিছু নিয়ম	৩২
	প্রথম নিয়ম	৩২
	দ্বিতীয় নিয়ম	৩৩
	বাসমালাহ দিয়ে শুরু করার দলিল	৩৪
	এটি কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ	৩৪
	রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চিঠির শুরু করতেন বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দিয়ে	৩৪
	বাসমালাহ-এর ব্যাপারে একটি দুর্বল হাদিস	৩৫
	বাসমালাহ-এর বারাকাহ্	৩৬
দারস-২	বিসমিল্লাহ নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম?	৩৮
	আল্লাহ	৪২
	আল্লাহ এক অনন্য নাম	৪৪

www.banglakitab.weebly.com

	শুধু 'আল্লাহ' শব্দে কোনো যিকির নেই	৪৫
	যে পবিত্র নামের অনুগামী অন্য সব নাম	৪৫
	আল্লাহ নামের মাঝে নিহিত তাওহিদ	৪৬
	আল্লাহ এক পরাক্রান্ত নাম	৪৬
	আর রাহমান আর-রাহীম	৪৮
	আর-রাহমান ও আর-রাহীম	৫০
	আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ	৫৩
	আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ অর্জন	৫৬
দারস-৩	ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ	৫৯
	ইলমের গুরুত্ব	৫৯
	ইলম ছাড়া কোনো নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই	৬৩
	ইলমের সংজ্ঞা	৬৫
	মানুষ ছাড়া অন্য কিছুকে কি শেখানো সম্ভব?	৬৫
	নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কি ই'লাম বলা যাবে?	৬৮
	ইলমের স্তর	৬৯
	ইলমের মর্যাদা	৭১
	সালাফদের সময়ের আলিম	৭৭
	জাবির এবং আবু আইয়্যুব(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)	৭৭
	মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ও আসাদ ইবনুল ফুরাত	৭৯
	সাইদ ইবনু মুসাইয়্যিব, আর-রাযি ও আল-বুখারি	৮০
	ইমাম নাওয়াউয়ী, লিসানুদ দ্বীন, ইবনুল খাতীব ও মুয়ায ইবনু জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)	৮২
	সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক এবং আতা ইবনু আবি রাবাহ	৮৪
	আল-কাসায়ি ও খলিফাহ হারুনুর রশিদের ছেলেরা	৮৫

www.banglakitab.weebly.com

আশ-শাফে'ঈ ও ইবনুল জাওযী ৮৬
রাহিমাকাল্লাহ ৮৬
একজন কাফিরকে উদ্দেশ্য করে কি রাহিমাকাল্লাহ বলা যাবে? ৮৭
লেখক কেন শুরুতে ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ বললেন? ৮৯

দারস-৪ চারটি বুনিয়াদি বিষয় ৯৫
ওয়াজিবের সংজ্ঞা কী? ৯৫
ওয়াজিব আর ফরয কি আলাদা? ৯৬
যারা ওয়াজিব ও ফরযকে সমার্থক মনে করেন, তাঁদের দলিল ৯৬
যারা ওয়াজিব ও ফরযকে আলাদা মনে করেন, তাঁদের দলিল ৯৯
এ মতপার্থক্যের ফল কী? ১০১
ইসলামি জ্ঞানের শাখাগুলো পরস্পর সংযুক্ত ১০৩
লেখক ওয়াজিব বলতে কী বুঝিয়েছেন? ১০৪
আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান ১০৪
ফারযুল আইন ১০৫
ফারযুল কিফায়াহ ১০৫
ইলম, আমল, বিরত থাকা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে ফারযুল আইন ১০৬
আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারে ফারযুল আইন ১০৬
বিরত থাকার ক্ষেত্রে ফারযুল আইন ১০৭
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ফারযুল আইন ১০৮
চারটি আবশ্যক বিষয় ১০৮
মাসআলার সংজ্ঞা ১০৯
প্রথম বুনিয়াদি বিষয়—ইলম ১১০
আল্লাহ ﷻ-কে জানা ১১০

www.banglakitab.weebly.com

মা'রিফাতুল্লাহ ১১০
হালাল ও হারামের ব্যাপারে জ্ঞান ১১২
মা'রিফাতুল্লাহর গুরুত্ব ১১২
আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান হলো সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ১১৩
মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা ১১৬
নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানা ১১৮
ইসলামকে জানা ১২১
ইসলামের সংজ্ঞা ১২১
আল্লাহ ﷻ-এর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম ১২১
ইসলামে আমলের ভিত্তি ১২৫
দারস-৫ ইলমের সংজ্ঞার ক্রমধারা ১২৬
আল্লাহ ﷻ, নবি মুহাম্মাদ ﷺ ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে দলিলসহ জানা ১২৬
আকিদাহর ক্ষেত্রে তাকলিদ ১২৮
প্রথম মত—দলিল জানতে হবে ১২৯
দ্বিতীয় মত—দলিল জানা বাধ্যতামূলক না ১২৯
তৃতীয় মত—দলিল প্রমাণ জানার চেষ্টা করা হারাম ১২৯
প্রথম দুটি মতের সারসংক্ষেপ ১৩০
আকিদাহর ক্ষেত্রে তাকলিদ জায়েজ হবার প্রমাণ ১৩১
দ্বিতীয় বুনিয়াদি বিষয়—ইলমের ওপর আমল করা ১৩৫
আমলের শ্রেণিবিভাগ ১৩৫
হারাম থেকে বিরত থাকার কারণে কি মানুষ পুরস্কৃত হবে? ১৩৫
ইলম প্রয়োগের অপরিহার্যতা ১৩৬
যে ব্যক্তির আমল তার ইলমের সাথে মেলে না ১৩৮

www.banglakitab.weebly.com

	ব্যক্তি তার ইলমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে	১৩৯
	ব্যক্তি নিজে যা করে না, তা বলা	১৩৯
	অনুপকারী ইলম	১৪০
দারস-৬	অপ্রয়োজনীয় ইলম	১৪৬
	ইলম ও আমলের পার্থক্য	১৪৬
	ইলম নাযিলের উদ্দেশ্য আমল	১৪৭
	ইলমের ওপর আমল না করার পরিণাম	১৪৯
	জবাবদিহিতার ভয়ে ইলম অন্বেষণ পরিত্যাগ করা অনুচিত	১৫১
	ইলমসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন	১৫৩
	ইলমের ওপর আমলের উদাহরণ	১৫৬
	ওলামায়ে সু	১৫৯
	ওলামায়ে সু কারা?	১৫৯
	দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইলম অনুযায়ী আমল করা	১৬৩
	ইবনুল জাওযী ও তাঁর শাইখগণ	১৬৩
	স্রষ্টা কিংবা সৃষ্টি, কারও সামনেই নিজেকে নিয়ে অহমিকায় ভুগবেন না	১৬৫
দারস-৭	দাওয়াহ্ কি ফারযুল আইন নাকি ফারযুল কিফায়াহ?	১৬৮
	বিশদ ইলম অর্জন করা ফারযুল কিফায়াহ	১৬৮
	দাওয়াহ প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব	১৭০
	পরিপূর্ণ ইলম অর্জনের আগে কি দাওয়াহ্ বন্ধ রাখা উচিত?	১৭২
	আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে না জেনে কথা বলার বিপদ	১৭৪
দারস-৮	দাওয়াহর অজুহাতে গুনাহয় লিপ্ত হবেন না	১৮১

www.banglakitab.weebly.com

	পাপাচার ছড়িয়ে পড়লে সবার ওপরে এর প্রভাব পড়ে	১৮৫
	দাওয়াহর সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে	১৮৮
	দাওয়াহর প্রমাণপঞ্জি	১৯১
	মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করুন ইলমের সাথে	১৯১
	দাওয়াহ আমাদের গর্ব	১৯২
	উঠুন, সতর্ক করুন	১৯৪
	একজন মানুষকে হিদায়াতের ওপর আনার মূল্য	১৯৫
	উহুদ ও তাইফের দিবস	১৯৬
	শ্রোতার জ্ঞান ও অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াহ	১৯৯
দারস-৯	দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হিকমাহর	২০৪
	দাওয়াহ হবে সর্বোত্তম আচরণের সাথে	২০৪
	হিকমাহর অর্থ ইসলামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া না	২০৬
	দাওয়াহর ক্ষেত্রে রাহমাহ	২০৮
	কঠোরতাও হিকমাহর অন্তর্ভুক্ত	২১৭
	মুদারাহ ও মুদাহানাহর মধ্যে পার্থক্য	২২৫
	সালাফদের দাওয়াহর উদাহরণ	২২৬
	দাওয়াহ ইলাল্লাহর ব্যাপারে উপসংহার	২৩২
দারস-১০	চতুর্থ বুনিয়াদি বিষয় : সবর	২৩৩
	সবর একজন দা'ঈর অপরিহার্য গুণ	২৩৪
	সবরের প্রতিদান	২৩৫
	সবরের সংজ্ঞা	২৪০
	অভিযোগ কি সবরকে বাতিল করে দেয়?	২৪১
	সবরের প্রকারভেদ	২৪৩
	আল্লাহ ﷻ কেন আমাদের পরীক্ষা করেন?	২৪৪

www.banglakitab.weebly.com

পরীক্ষা নেই এমন জীবনের প্রত্যাশা করবেন না ২৪৭
কুরআনে পরীক্ষা-সংক্রান্ত কিছু আয়াত ২৫৪
একজন দা'ঈ তার কঠিনতম মুহূর্তে
সবচেয়ে বেশি আশাবাদী হবে ২৬১

দারস-১১ ২৬৭
সত্যের পথ দুঃখ-কষ্টে ঘেরা ২৬৯
পরীক্ষা গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধির উপায় ২৭১
নিয়্যাতের গুরুত্ব ২৭৪
সত্যের ওপর দৃঢ় থাকুন একাকী হলেও ২৭৭
কুরআনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের তিরস্কার করা হয়েছে ২৭৮
কুরআনে অল্পসংখ্যকদের প্রশংসা করা হয়েছে ২৭৯
আল্লাহ ﷻ তো সবকিছু জানেন,
তারপরও কেন আমাদের পরীক্ষা করেন? ২৮০
মুমিনের জন্য সবকিছুই কল্যাণকর ২৮৩
কষ্টদায়ক কথার বিপরীতে সবর করুন ২৮৪
পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তাওবাহ করুন,
আল্লাহ ﷻ-এর রহমতের প্রত্যাশী হোন ২৮৭
দাওয়াহর পথে সবরের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ২৯১
শাইখ মুসার কিছু প্রজ্ঞাময় বাণী ২৯২
উপসংহার ২৯৬

দারস-১২ ২৯৮
ভূমিকা ২৯৯
'আসর' অর্থ ৩০১
প্রথম অভিমত : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় ৩০১
দ্বিতীয় অভিমত : নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগ ৩০২
তৃতীয় অভিমত : দিনের শেষাংশ ৩০২

www.banglakitab.weebly.com

	চতুর্থ অভিমত : সালাতুল আসর বা আসরের সালাতের ওয়াক্ত	৩০৫
	নির্বাচিত অভিমত	৩০৫
	আল-আসরের গুরুত্ব	৩০৯
	কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শপথ	৩১০
	কেন কুরআন ও সুন্নাহয় শপথের কথা এসেছে	৩১২
	মানুষের শপথ	৩১৪
দারস-১৩	সময়ের অপচয় করবেন না	৩১৭
	শপথের মূল বিষয়বস্তু	৩১৯
	মানবজাতি ক্ষতিতে নিমজ্জিত	৩১৯
	খুসর কেন নাকিরাহ (অনির্দিষ্ট) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে	৩২০
	আল্লাহ ﷻ 'আলা' (على) এর বদলে 'ফি' (فى) ব্যবহার করেছেন	৩২০
	এই সূরার সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তব জীবনের কিছু উদাহরণ	৩২১
	ক্ষতির বিভিন্ন মাত্রা	৩২৭
	কেন সূরাতে প্রথমে সর্বজনীন ঘোষণার পর নির্দিষ্ট করা হয়েছে?	৩২৭
	আল্লাহ ﷻ মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ উল্লেখ করেননি	৩২৯
	যারা ঈমান আনে	৩৩০
	ঈমান ইলম থেকে উৎসারিত	৩৩০
	এই আয়াতে ঈমানের তাৎপর্য	৩৩১
	আল্লাহ ﷻ কেন সবিস্তারে ঈমানের আলোচনা করলেন না	৩৩১
	আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ মেনে চলা	৩৩১
	যারা সৎকর্ম করে	৩৩৩

www.banglakitab.weebly.com

	ঈমানের শর্ত আমল	৩৩৩
	ঈমানবিহীন আমল	৩৩৬
	সর্বপ্রকার নেক আমল এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত	৩৩৮
	হক ও সবর-সংক্রান্ত কিছু নাসীহাহ	৩৩৯
	দাওয়াহ কারও একচেটিয়া অধিকার নয়	৩৪০
	পরামর্শ দান একটি সামষ্টিক প্রচেষ্টা	৩৪০
	হক হলো কুরআন ও সুন্নাহ	৩৪১
	সবর	৩৪২
	সম্পূর্ণ সূরাব্যাপী সবরের শিক্ষা নিহিত	৩৪২
	সর্বপ্রকার ধৈর্য 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত	৩৪২
	আশ-শাফে'ঈ এর বক্তব্য	৩৪৫
দারস-১৪	বুখারি থেকে উদ্ধৃত অধ্যায়ের শিরোনাম	৩৪৮
	বুখারির শিরোনামকে দলিল সাব্যস্তকরণের কারণ	৩৫০
	আমলের আগে ইলম	৩৫২
	লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	৩৫৩
	রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে নাযিলকৃত আয়াত কি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য?	৩৫৪
	উসুল আস-সালাসাহ পুস্তিকার গঠন-বিন্যাস	৩৫৫

www.banglakitab.weebly.com

www.banglakitab.weebly.com

পূর্বকথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-এর, যিনি আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি তাওবাহ কবুলকারী, যিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর, যিনি অতীব দানশীল। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবি ﷺ-দের ওপর।

বিভিন্ন ব্লকবাস্টার সিনেমা, বেস্টসেলার নভেল এমনকি ছোটকালের শোনা রূপকথাগুলোর মধ্যে একটি কমন থিম দেখতে পাবেন। ভালো ও মন্দের চিরন্তন যুদ্ধ। ইসলামও আমাদের কাছাকাছি ধরনের একটা ধারণা দেয়। তবে মানুষের কল্পনায় গড়ে ওঠা গল্পের সাথে ইসলামের জানানো এ সত্যের কিছু পার্থক্য আছে। ইসলাম ভালো ও মন্দের এ লড়াইকে চিরন্তন বলে না। এর শুরুটা আমাদের পিতা আদম ﷺ-এর সৃষ্টির সময় থেকে। আর এ লড়াই চলবে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত। মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তার উদ্দেশ্য– আমাদের মধ্য থেকে যত বেশিজনকে সম্ভব তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া। নানাভাবে মানুষকে সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে, সত্য থেকে বিচ্যুত করা। যুগে যুগে মানুষ ও জিনজাতির অনেকেই এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আর-রাজীম ইবলিশের অনুসারী হয়েছে।

অন্যদিকে আল্লাহ ﷻ যুগে যুগে তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের সতর্ক করেছেন এ যুদ্ধের বাস্তবতা এবং আখিরাতের পরিণতি সম্পর্কে। অবহিত করেছেন মানব অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে। একইসাথে কীভাবে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব তার পুঙ্খানুপুঙ্খ দিকনির্দেশনা তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং একদিকে বিতাড়িত শয়তান এবং মানুষ ও জিনজাতির মধ্যেকার তার

www.banglakitab.weebly.com

অনুসারীরা যুদ্ধ করছে আমাদের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে। অন্যদিকে আর-রাহমানের বান্দারা যুদ্ধ করছেন আমাদের আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্য ও সত্যের ওপর দৃঢ় ও অবিচল রাখতে। আর-রাহমানের এ বান্দাদের মধ্যে অগ্রগামী হলেন নবি ও রাসূল আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণ। আর মূল যে বিষয়টির শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ ﷻ তাঁদের পাঠিয়েছেন তা হলো তাওহিদ, যার স্তম্ভ হলো দুটি। কুফর বিত তাগুত ও ঈমান বিল্লাহ। সকল তাগুত, সকল মিথ্যা উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ﷻ-কে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা। এটিই হলো মানবজাতির ওপর প্রথম ফারযিয়্যাত, প্রথম দায়িত্ব।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুতকে বর্জন করো। অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের ওপর অবধারিত হয়েছে গোমরাহী, অতএব জমিনে ভ্রমণ করে দেখো, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী ঘটেছিল! (সূরা আন-নাহল, ৩৬)

এবং তিনি ﷻ বলেন :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ

অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। (সূরা আল-বাকারাহ, ২৫৬)

যারা আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কিছু ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে, যারা আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার আনুগত্য করে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করাও এই তাওহিদের অংশ। আল্লাহ ﷻ বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করো তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি; তোমাদের ও

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের মধ্যে শুরু হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আনো। (সূরা আল-মুমতাহিনা,৪)

অতএব প্রত্যেক নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের মিশন ছিল এক ও অভিন্ন। সমস্ত মিথ্যা ইলাহকে প্রত্যাখ্যান ও এক আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদতের শিক্ষা দেওয়া। শিরক ও শিরকের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। তাওহিদের শিক্ষা দেওয়া। এটিই ইসলামের মূল ভিত্তি। তাওহিদ ছাড়া ইসলাম হয় না। যার তাওহিদ নেই তার কিছুই নেই। পাহাড়সম আমলও তাওহিদ ছাড়া মূল্যহীন। তাওহিদ হল সকল মূলনীতির চূড়ান্ত মূলনীতি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজ একদিকে সমাজের বিশাল একটি অংশের কাছে ইসলাম অবহেলিত। অন্যদিকে যারা ইসলামকে আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করেন তাওহিদের বদলে আজ তারা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও মতপার্থক্য নিয়ে ব্যস্ত। শেকড়কে ভুলে আজ শাখা-প্রশাখার দিকে আমাদের সব মনোযোগ। অন্তর বিগলিত করা, পিতা-মাতা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ইতিহাস, বিশ্লেষণ কিংবা নানা ফিকহি মতপার্থক্য–বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আমরা দেখেছি। 'আল্লাহ আছেন কি নেই' এ প্রশ্ন নিয়েও আমরা আলোচনা করছি। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আমার দায়িত্ব কী? আমার কাছ থেকে আল্লাহ ﷻ কী চাচ্ছেন–সেটা নিয়ে আলোচনা বিরল। আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি বিশ্বাসের শর্ত কী, কীভাবে এ বিশ্বাস পূর্ণ হবে–সেই বিশুদ্ধ তাওহিদ নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা নেই।

এই শূন্যস্থান পূরণের ইচ্ছা থেকেই শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিযাহুল্লাহ-এর শারহুল উসুল আস-সালাসাহ (Explanation Of The Three Fundamental Principles) নামের লেকচার সিরিযটি (যা ‹তাওহিদ সিরিয› নামে অধিক পরিচিত) বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শাইখ আহমাদ বর্তমান সময়ের ওইসব বিরল সত্যপন্থী আলিমদের একজন যারা বিশুদ্ধ তাওহিদকে আঁকড়ে আছেন। যাদের কথা ও কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যারা কেবল মুখে সালাফ আস-সালেহিনের অনুসরণের কথা বলেন না; বরং তা করে দেখান। শাইখের তাওহিদের সিরিয এখনো পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়ে উপস্থাপিত সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিস্তারিত আলোচনাগুলোর অন্যতম। এ আলোচনাতে তিনি শুধু তাত্ত্বিকভাবে তাওহিদের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেননি, বরং এর বাস্তব প্রয়োগ এবং আমাদের বর্তমানের সাথে এর সম্পর্ককেও তুলে ধরেছেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের এ লেকচার সিরিযে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ ও সালাফ আস-সালেহিন ﵏-এর শিক্ষার ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ মহান সংস্কারক ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব ﵀-এর দাওয়াহর মূল নির্যাস। প্রায় দীর্ঘ এক বছরের চেষ্টা এবং বিভিন্ন চড়াই-উতরাইয়ের পর শেষ পর্যন্ত বইটির প্রথম খণ্ড মলাটবদ্ধ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ﵀-এর রচিত পুস্তিকা উসুল আস-সালাসাহ নিয়ে ব্যাখ্যামূলক এ আলোচনাকে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। এই চারটি অধ্যায়ের প্রথমটি নিয়েই 'তাওহিদের মূলনীতির'এর প্রথম খণ্ড। শাইখের লেকচার সিরিযের প্রথম চৌদ্দটি

www.banglakitab.weebly.com

দারসের আলোচনা এই খণ্ডে উঠে এসেছে। ইন শা আল্লাহ বাকি খণ্ডগুলোও যথাশীঘ্র পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হবে বিইযনিল্লাহ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে শাইখ আহমাদের মূল আলোচনা ও বক্তব্যকে কোনোরকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন ছাড়াই উপস্থাপন করার। মূল লেকচার চলাকালীন উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশে বলা শাইখের অল্প কিছু কথা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বাদ দেয়া হয়েছে। যুক্ত করা হয়েছে শাইখের দেয়া উদ্ধৃতিগুলোর রেফারেন্স (তাখরীজ) এবং প্রয়োজনীয় টীকা। আমরা আশা করি এ বইটি বাংলা ভাষায় তাওহিদ-বিষয়ক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে। বইটির কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে আছে অনেক মানুষের স্বপ্ন, সময়, শ্রম। তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি না, যার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা সেই সর্বজ্ঞানী তো তাঁর বান্দাদের চেনেনই। তিনি যেন এ কাজটি কবুল করুন, এর সাথে জড়িত সকল উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তাঁর এই গুনাহগার বান্দাদের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন।

'মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য কী' দার্শনিকরা যুগে যুগে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। কিন্তু আসমানি জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে সত্যকে চিনতে পারেনি। তত্ত্বকথার ফুলঝুরি, আর জটিল থেকে জটিলতর আলংকারিক বিশ্লেষণ যে সত্যকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে, আল্লাহ ﷻ কুরআনে অল্প কিন্তু গভীর অর্থবোধক কথায় আমাদের তা জানিয়ে দিয়েছেন। তাওহিদের মূলনীতি বইটি এই সত্যকে নিয়েই। ছকে বাঁধা যান্ত্রিক জীবনের চক্র থেকে কিছুটা সময় বের করে এই সত্যের আলোতে পাঠক নিজেকে বিচার করবেন, নিজের প্রকৃত গন্তব্য ও উদ্দেশ্যকে চিনে নেবেন সেই প্রত্যাশা রইল।

ইলমহাউস পাবলিকেশন

সফর ১৪৪০, অক্টোবর ২০১৮

www.banglakitab.weebly.com

www.banglakitab.weebly.com

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা শাইখ মুসা জিবরিল ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় মদিনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই তিনি *বুখারি ও মুসলিম* মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি *বুখারি ও মুসলিমের* সনদসমূহ মুখস্থ করেন, এরপর হাদিসের ছটি কিতাব (কুতুবুস সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। তারপর তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াহও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের সাথে একান্ত দারসে তিনি আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামাহ হামুদ বিন উকলা আশ শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাযকিয়াহ লাভ করেন।

তিনি তাঁর পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ মুসা জিবরিল শাইখ ইহসানকে অ্যামেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান অ্যামেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইন শা আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল *আর রাহিকুল মাখতুম* বইয়ের লেখক শাইখ সফিয়ুর রাহমান আল মুবারাকপুরির অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন

www.banglakitab.weebly.com

শাইখ মুকবিল, শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াহ আস সালিমের অধীনে। শাইখ আতিয়াহ আস সালিম ছিলেন শাইখ আল্লামাহ মুহাম্মাদ আমিন আশ শানকিতির প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ আশ শানকিতির ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *আদওয়ায়ুল বায়ান* এর কাজ শেষ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবরাহিম আল হুসাইনেরও ছাত্র ছিলেন। শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতাহর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আব্দুল্লাহ আল কুদের সাথে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান।

মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল আনসারির অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন তিনি। তিনি শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল আলবানি ওয়াসিয়াহতে শাইখ আবু মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল কারনিরও ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাযাহপ্রাপ্ত হন শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে। শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায অ্যামেরিকায় থাকা বিলাদুল হারামাইনের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকেও তাযকিয়াহ অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তিনি (আলিমদের কাছে) পরিচিত এবং উত্তম আকিদাহ পোষণ করেন। শাইখ আহমাদ বর্তমানে অ্যামেরিকায় নিজ পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন।

www.banglakitab.weebly.com

তাওহীদের মূলনীতি

www.banglakitab.weebly.com

ভূমিকা

'উসুল আস-সালাসাহ' অর্থ তিনটি মূলনীতি। এটি তাওহিদের তিনটি মূলনীতির ওপর লেখা একটি ছোট্ট পুস্তিকা। শব্দ-সংখ্যার দিক দিয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও ছোট্ট এ পুস্তিকার অর্থের গভীরতা ব্যাপক। এতে বর্ণিত শিক্ষা ও মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে কারো অজ্ঞ থাকার সুযোগ নেই। বইটি প্রকাশ হবার পর থেকে আলিমগণ সব সময় বইটি অধ্যয়ন করে আসছেন, এর ওপর দারস দিয়েছেন এবং তাওহিদ-বিষয়ক অধ্যয়ন সব সময় এই পুস্তিকা দিয়েই শুরু করা হয়।

এই পুস্তিকাতে আলোচিত তিনটি মৌলিক নীতি এবং এগুলোর ব্যাপারে লেখকের আলোচনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, মূলত কবরে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হবে লেখক এই পুস্তিকাতে সেগুলো নিয়েই আলোচনা করেছেন। আমাদের সবার এ তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে যথাসম্ভব ভালোভাবে জানা দরকার, যাতে করে আমাদের জীবনকে এই নীতিগুলোর আলোকে আমরা সাজাতে পারি, জীবনে এই শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করতে পারি এবং কবরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দ্রুত ও সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হই।

ইলম অর্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া :

তাওহিদের মূলনীতি-সংক্রান্ত এ আলোচনায় আমরা এগোব ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে। কারণ, দ্বীন ইসলামের জ্ঞান ধীরে ধীরে শেখা উচিত। রাতারাতি কেউ আলিম হতে পারে না। ইবনু আব্দিল বার ﷬ আল-জামিতে উল্লেখ করেছেন, যুহরী ﷬ বলেছেন,

من رام العلمَ جملة ذهب عنه جملة، إنما يُطلب العلم على مرّ الأيام والليالي

যে রাতারাতি জ্ঞান অর্জন করতে চায়, জ্ঞান তাকে ত্যাগ করে। আসলে জ্ঞান অর্জিত হয় ধীরে ধীরে, দিন-রাতের সাধনায়।[১]

১ ইবনু আবদিল বার ﷬, জামিয়ু বায়ানিল ইলম, বর্ণনা নং : ৪৭৬ (শাব্দিক ভিন্নতা-সহকারে)।

www.banglakitab.weebly.com

ইলম অর্জনের জন্য ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এই পথে অগ্রসর হতে হয় ধাপে ধাপে। শুরুতেই আকিদাহ অথবা তাওহিদের গভীর আলোচনার বইগুলো দিয়ে শুরু করলে আপনি এমন কিছু বিষয়ের মুখোমুখি হবেন যা হয়তো পুরোপুরি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন না। যার ফলে আপনি হতাশ হয়ে যাবেন। কিন্তু ধাপে ধাপে অগ্রসর হলে হয়তো বিষয়গুলো আপনি বুঝতে পারতেন। অনেক ভাইকে দেখা যায় শুরুতেই আকিদাহ ও তাওহিদ নিয়ে এমনসব বই পড়া শুরু করে দিয়েছেন, যেগুলোকে ভেঙে বোঝাতে আলিমদেরও বেগ পেতে হয়। তারচেয়েও বড় সমস্যা হলো, দেখা যায় তারা কোনোরকমের তত্ত্বাবধান ছাড়া মূল বইয়ের বদলে কোনো অনুবাদ পড়ছেন। এভাবে আসলে কতটুকু সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব? এটা ঠিক যে, আজকের যুগে অনেকেই নানা কারণে সরাসরি আলিমদের তত্ত্বাবধানে পড়ার সুযোগ পান না। আপনার ক্ষেত্রেও যদি ব্যাপারটা এমন হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে সে ক্ষেত্রেও অন্তত ইলম অর্জনের প্রক্রিয়া কীভাবে শুরু করতে হয়, সেটা আপনাকে সঠিকভাবে জানতে হবে।

উসুল আস-সালাসাহ, তাওহিদ নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। হয়তো আমার এই ভূমিকা শেষ করার আগেই আপনি এটি পড়ে শেষ করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু এ ছোট্ট পুস্তিকার গভীর, অন্তর্নিহিত জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রয়োজন প্রতিটি বাক্যের বিশ্লেষণ। ধাপে ধাপে এগোলেও হয়তো আপনার কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু হাল ছাড়বেন না ইন শা আল্লাহ। আপাতদৃষ্টিতে ছোট্ট ও সাধারণ এ বইটি ও এর ব্যাখ্যা আমি অধ্যয়ন করেছি এগারো জন আলিমের তত্ত্বাবধানে। আর কিছু অংশ পড়েছি তারচেয়েও অধিকসংখ্যক আলিমের অধীনে।

আল-খাতীব আল-বাগদাদি তার আল-জামিতে অদ্ভুত সুন্দর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একজন তালিবুল ইলম জ্ঞান অর্জনের জন্য একজন মুহাদ্দিসের কাছে গেলেন। কিন্তু তার কাছে হাদিস-সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। হতাশ হয়ে তিনি ধরে নিলেন, তিনি এ কাজের উপযুক্ত নন।

তারপর একদিন হাঁটার সময় তিনি দেখলেন একটি পাথরের ওপর পানি পড়ছে—হয়তোবা কোনো ঝরনার কাছে। আপনারা দেখবেন, বছরের পর বছর ধরে কোনো পাথরের ওপর পানি পড়লে যে জায়গাটায় পানি পড়ে, সেটা একসময় দেবে যায়। পানি পড়ার সেই স্থানটি আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যেতে থাকে। কোনো ঝরনা কিংবা ফোয়ারার কাছে গিয়ে আপনারা এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এই দৃশ্য দেখার পর তালিবুল ইলম চমৎকৃত হলেন—'কী অবাক ব্যাপার! পানি এত নরম, কোমল, হালকা হওয়া সত্ত্বেও তা শক্ত পাথরকে প্রভাবিত করে। ইলম তো পানির চেয়েও নরম আর হালকা, আর আমার হৃদয় ও বুদ্ধি তো পাথরের মতো শক্ত না।' তারপর তিনি হাদিসশাস্ত্র অধ্যয়নে ফিরে গেলেন এবং একসময় তৎকালীন সময়ের হাদিসের বিখ্যাত আলিম হয়ে উঠলেন।

www.banglakitab.weebly.com

তাই ধীরে ধীরে শুরু করুন। ধৈর্য ধরে, অধ্যবসায়ের সাথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হোন। এটিই হলো ইলম অর্জনের সনাতন (classical) পদ্ধতি, আর এভাবে পড়ার মাধ্যমেই একজন মানুষ আলিম হয়ে ওঠেন। সাধারণত আপনারা যেসব আলোচনা পড়ে ও শুনে থাকেন সেগুলো অনুপ্রেরণা দেয়, তথ্যবহুল এবং নিশ্চয় সেগুলোতে ইলম আছে–তবে এগুলো আলিম তৈরি করে না। আলিম হবার জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন, এ ধরনের লেকচার বা আলোচনা তা দিতে পারে না। আপনি দু-একটা লেকচার শুনলেন, সেমিনারে গেলেন, কিছু কোর্স করলেন, কিছু ভিডিও দেখলেন–এটা ভালো, কিন্তু এর মাধ্যমে আলিম হওয়া সম্ভব না। যদি তা-ই হতো, তাহলে গোটা মুসলিম উম্মাহর সবাই আলিম। কেননা, গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে আমাদের বাবা-দাদারা প্রতি জুমুআয় খুতবা শুনে আসছেন এবং মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত বহু বয়ানও তারা শুনেছেন।

একজন তালিবুল ইলম কিংবা আলিম হওয়ার জন্য, প্রকৃত অর্থে ইলম অর্জনের জন্য, প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতিতে ইসলাম অধ্যয়নের আরও অনেক অনেক উপকারিতা আছে, যা গুনে শেষ করা যাবে না।

ইলম অর্জনের তিন পদ্ধতি

আগেকার দিনগুলোতে তিনভাবে ইলম অর্জন করা হতো। প্রথম পদ্ধতি হলো, 'সামা আল-মুবাশশির' (السماع المباشر), সরাসরি একজন শাইখের কাছ থেকে শেখা। এটা সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি এবং এর জন্য পুরস্কারও অপরিসীম। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো 'আল-ওয়াসিতাহ' (الواسطة), এ পদ্ধতিতে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি থাকবে। আপনি যদি সরাসরি একজন শাইখের কাছ থেকে তালিম নিয়ে অন্য কাউকে গিয়ে পুরো তালিম জানান, তাহলে তা হবে 'ওয়াসিতাহ'। এ ক্ষেত্রে শাইখ এবং যাকে আপনি শেখাচ্ছেন, এ দুজনের মাঝে আপনি হবেন সেই মধ্যস্থ ব্যক্তি। সাহাবিদের অনেকে, বিশেষ করে যারা ব্যবসায়ী বা কৃষক ছিলেন, এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তাঁরা পালাক্রমে নিজেরা শিখতেন এবং একে অপরকে শেখাতেন। ইলম অর্জনের তৃতীয় পদ্ধতি 'ওয়াজাদাহ' (وجادة), কোনো শাইখের লিখিত একটি বই নিজে নিজে অধ্যয়ন করা।

যদি সরাসরি কোনো শাইখের অধীনে পড়ার সুযোগ থাকে তবে 'ওয়াজাদাহ', 'ওয়াসিতাহ' বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা উচিত না। পৃথিবীর অপর কোনাতেও যদি হকপন্থী কোনো শাইখের সন্ধান পান আর আপনার যদি সামর্থ্য থাকে, তাহলে এখনই ব্যাগ গোছান এবং তার কাছে গিয়ে শিখুন।

সরাসরি একজন শাইখের কাছ থেকে শেখার উপকারিতা অনেক। যেমন : একজন শাইখের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শেখার ফলে আপনি তার ব্যক্তিগত জীবন, আচার-আচরণ দেখতে পাবেন। এ থেকে শিখতে পারবেন। জানতে পারবেন তিনি কোন পরিস্থিতিতে কী রকম

www.banglakitab.weebly.com

আচরণ করেন। কাজেই যদি একজন হকপন্থী, যোগ্য আলিমকে খুঁজে পান—এমন কেউ যিনি আল্লাহকে ভয় করেন, যিনি ভণ্ড, বিভ্রান্ত, বিকিয়ে যাওয়া মর্ডানিস্ট নন, যিনি কুফর কিংবা কুফফারের পক্ষে কথা বলেন না, যিনি কোনো সরকারি, অধীনস্থ আলিম না—যদি এমন কাউকে খুঁজে পান এবং রাজি করাতে পারেন, তাহলে তিনি বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, আপনার অবশ্যই তার কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা এবং তাঁকে অনুসরণ করা উচিত।

আলিমদের সংস্পর্শ ছাড়া শুধুই বই থেকে শেখার ব্যাপারে সালাফগণ ভালো ধারণা পোষণ করতেন না। তারা বলতেন,

من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه

বই-ই যদি কারও শাইখ হয়, তাহলে তার ভুলই বেশি হবে।[২]

শাইখ ইবনু উসাইমিন ﷺ-কে আলিমদের অডিও টেপ শুনে ইলম অর্জন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি একে উৎসাহিত করেছেন তবে একইসাথে এও বলেছেন যে, সরাসরি একজন আলিমের তত্ত্বাবধানে শেখা উত্তম। কারণ, এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রয়োজনমতো প্রশ্ন এবং আলোচনা করার সুযোগ পায়।

সালাফদের নিয়ম ছিল ইলম লিখে রাখা

আমার বয়স তখন সাত, মদীনায় থাকতাম। বাবা তখন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন। একদিন তাঁর এক ইরাকি বন্ধু (তিনি ছিলেন সামারার অধিবাসী, ১৯৮০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন) আমাকে বললেন, তোমার বাবা তো একজন সিংহ! ক্লাসে শিক্ষক যা-ই বলেন সে খাতায় নোট করে ফেলে। পরে আমি লক্ষ করলাম, বাবা যেখানেই থাকতেন—মাসজিদ আন-নববি, ক্লাস, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস—সব সময় তিনি সবকিছু খাতায় নোট করতেন। আর তার সাথে সব সময় একটা অডিও রেকর্ডার থাকত যেটা দিয়ে তিনি সব ক্লাস লেকচারগুলো রেকর্ড করে রাখতেন। সেই রেকর্ডগুলো এখনো আমাদের কাছে আছে। তারপর থেকে আমি নিজেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছি। আমি যেসব শাইখদের অধীনে পড়েছি তাঁদের বলা প্রতিটি শব্দ নোট করেছি। যদিও সব সময় সবকিছু লেখার প্রয়োজন হয় না, আর অনেক সময় লেখার সময় কিছু কথা ছুটেও যায়, তবু আমি সব সময় চেষ্টা করেছি শাইখরা যা বলছেন তার সবকিছু লিখে রাখার। এখনো আমি আমার এই নোটগুলোর সহায়তা নিই।

সালাফদের অভ্যাস ছিল ইলম লিখে রাখার। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসগুলো লিখে রাখতেন। একসময় কুরাইশরা তাঁকে এ কাজে বাধা দেয়। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আবারও হাদিস লেখা শুরু করতে বলেন এবং তাঁকে উৎসাহ দেন। মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ আবি ইয়াস ﷺ বলেছেন,

২ আল-হিসবাতু আলা তা'লিবিল ইলম, পৃ. ৩

www.banglakitab.weebly.com

مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِلْمَهُ لَمْ يَعُدَّ عِلْمَهُ عِلْمًا

যারা তাদের ইলম লিপিবদ্ধ করে না তাদের ইলমকে ইলম গণ্য করা হয় না।[৩]

হয়তো এ ক্ষেত্রে হাদিসের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটা আজ আমরা যে ধরনের ইলম অর্জনের চেষ্টা করছি সেটার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাঈদ ইবনু যুবাইর ﷺ যা শুনতেন তা-ই লিখে রাখতেন। লেখার জন্য অন্য কিছু না থাকলে বালুতে লিখে রাখতেন। তারপর অপেক্ষা করতেন ভোর হওয়া পর্যন্ত। ভোর হবার পর অন্য কিছু খুঁজে বের করে তাতে লিখে নিতেন। মাওয়ারদি, খালিল ইবনু আহমাদ এবং অন্যান্যদের ব্যাপারেও এ ধরনের বর্ণনা আছে। তারা নিজেরা ইলম লিখে রাখতেন অথবা ইলমকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের জন্য উৎসাহ দিতেন।

আল উসূল আস-সালাসাহ :

উসূল আস-সালাসাহ অত্যন্ত ছোট একটি পুস্তিকা। লেখক ভূমিকা হিসাবে চারটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করার পর তিনটি মূলনীতির আলোচনা করেছেন। তারপর একটি উপসংহার এসেছে। অল্প কিছু পৃষ্ঠা। কিন্তু অল্প এ কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে ছড়িয়ে আছে গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান। তাই আমরা চেষ্টা করব বইটির প্রতিটি বাক্য, সম্ভব হলে প্রতিটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করার। আমরা আলোচনা শুরু করব, বাসমালাহ বা 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' দিয়ে। আমরা ভেঙে ভেঙে এর অর্থ শিখব। একজন তালিবুল ইলম হিসেবে বিসমিল্লাহর ব্যাপারে আপনার বুঝ আর দশজনের মতো হলে তো হবে না। আজ পৃথিবীতে প্রায় ১.৫ থেকে ১.৮ বিলিয়ন মুসলিম আছে। কিন্তু কোনো কাজের শুরুতে কেন আমরা বিসমিল্লাহ বলছি, এ প্রশ্ন করলে তাদের অনেকেই হয়তো উত্তর দিতে পারবে না। একজন তালিবুল ইলম হিসেবে এ ব্যাপারে আপনার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা উচিত। উসূল আস-সালাসাহ বা তাওহিদের মূলনীতি নিয়ে আলোচনার শুরুটা আমরা বিসমিল্লাহ থেকেই করব।

৩ দারিমি, আস-সুনান, বর্ণনা নং : ৪৯৯

www.banglakitab.weebly.com

দারস ১

বাসমালাহ :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

বাসমালাহ-এর মাঝে নিহিত তাওহিদের শিক্ষা :

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীমকে বাসমালাহ বলা হয়।

কোনো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলার মানে হলো, ওই কাজের শুরুতে আল্লাহ ﷻ-এর একত্বের ওপর বিশ্বাসের সবক'টি দিক প্রয়োগ করা। বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীমের মধ্যে নিহিত আছে তাওহিদের প্রতিটি দিক।

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা মূলত বলছি, 'আল্লাহ ﷻ-এর নামে শুরু করছি, আল্লাহ ﷻ আমাদের এই কাজের অনুমতি দিয়েছেন, (أذن الله لي)। আল্লাহ ﷻ যদি অনুমতি না দিতেন, তাহলে আমরা কাজটি করতাম না।'

সুতরাং কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ﷻ আমাদের এ কাজের অনুমতি দিয়েছেন এবং আমরা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কাজটি করছি। আযিনাল্লাহু লি। এ কারণে কোনো হারাম কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলা যায় না। যেহেতু আল্লাহ ﷻ আমাদের এ কাজের অনুমতি দেননি; বরং তা হারাম করেছেন। যেমন, মদ পান করার আগে (لا سمح الله) বিসমিল্লাহ বলা যাবে না। কারণ, আল্লাহ ﷻ মদ্যপানকে হারাম করেছেন। যদি কেউ মদ পান করার আগে বিসমিল্লাহ বলে, তাহলে সে দুটো গুনাহ করলো। প্রথমত বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে সে সাক্ষ্য দিলো, আল্লাহ তাকে মদপান করার অনুমতি দিয়েছেন–অথচ আল্লাহ ﷻ তাকে এ কাজের অনুমতি দেননি। তাই এই কারণে সে গুনাহগার হলো। আবার হারামে লিপ্ত হবার দরুন, অর্থাৎ মদ পান করার কারণেও সে গুনাহগার হলো।

www.banglakitab.weebly.com

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, কিছু মুসলিম দেশে মদ পানের আগে বিসমিল্লাহ্ বলার এই প্রবণতা চালু আছে।

কাজেই বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি–আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আল্লাহ ﷻ আমাকে এ কাজের অনুমতি দিয়েছেন এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই আমি এই কাজটি করছি। আর এটাই হচ্ছে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ।

তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ

আমরা যখন লেখি, কে আমাদের লেখার শক্তি দেন? আল্লাহ ﷻ-ই আমাদের লেখার শক্তি দিয়েছেন। তাই লেখার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ﷻ লেখার শক্তি না দিলে আমি লিখতে পারতাম না। কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া শক্তির মাধ্যমে আমি এই কাজ করছি। বিসমিল্লাহ–আল্লাহ ﷻ-এর নামে আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া রিযিক থেকে আমি খাচ্ছি এবং আল্লাহ ﷻ যদি আমাকে সক্ষমতা না দিতেন, আমি খেতে পারতাম না। বিসমিল্লাহ–আল্লাহ ﷻ-এর নামে আমি লিখছি, কেননা আল্লাহ ﷻ আমাকে সক্ষমতা না দিলে, আমি এ হাত নাড়াতে পারতাম না, তা অবশ থাকত। এটা অনেকটা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ (হাওকালা) বলার মতো। কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা কার্যত বলছি যে, আল্লাহ ﷻ আমাকে এ কাজ করার শক্তি না দিলে, আমার দ্বারা কোনোভাবেই তা করা সম্ভব হতো না। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ....

'তোমাদের নিকট যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে, তা তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসেছে...।' (সূরা আন-নাহল, ৫৩)

কাজেই বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা যা কিছু নিয়ামত পেয়েছি, তার সবই এক আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে। এটাই হলো তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর ওপর বিশ্বাস।

তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলার মাধ্যমে সেই কাজে আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নামের সাহায্যে বারাকাহ্ ও কল্যাণ কামনা করা হয়। এর মাধ্যমে আমরা বলছি–বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহ ﷻ-এর নামে শুরু করছি যাতে তিনি এতে বারাকাহ্ দেন। বিসমিল্লাহ্‌র পর আমরা আল্লাহ নামের সাথে আর-রাহমান এবং আর-রাহীম যুক্ত করি। এগুলো আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা তাঁর পবিত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পরে আমরা এগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ। সুতরাং কাজের

www.banglakitab.weebly.com

শুরুতে আল্লাহ ﷻ-এর নাম নেয়ার মাধ্যমে আমরা এতে কল্যাণ ও বারাকাহ্ কামনা করছি। আর এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত-এর বিশ্বাস।

সুতরাং বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলার মাধ্যমে তাওহিদের প্রতিটি দিকের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হয়।

ধরুন খাওয়া শুরু করার আগে বা পরীক্ষার খাতায় লিখতে শুরু করার আগে আমরা বিসমিল্লাহ বললাম। বিসমিল্লাহ বলার দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নাম উল্লেখ করে বারাকাহ্ ও কল্যাণ কামনা করলাম। এটা হলো তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত। আবার বিসমিল্লাহর মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ﷻ-ই আমাদের লেখার বা খাবার সক্ষমতা দিয়েছেন। এটা হচ্ছে তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ। বিসমিল্লাহর মাধ্যমে আমরা আরও সাক্ষ্য দিলাম যে, আমি আল্লাহ ﷻ-এর জন্য, আল্লাহ ﷻ-এর অনুমতিক্রমেই এই কাজটি করছি। তিনি আমাকে এর অনুমতি দিয়েছেন এবং একে হালাল করেছেন বলেই আমি এটা করছি। আর এটা হলো তাওহিদ আল-উলুহিয়্যাহ। এভাবে প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা তাওহিদের প্রতিটি দিকের ওপর বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিচ্ছি।

ইন শা আল্লাহ এখন থেকে বিসমিল্লাহ বলার সময় আপনার মনে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক ভিন্ন উপলব্ধি কাজ করবে। আগে হয়তো আপনি বিসমিল্লাহ বলতেন, কারণ হাদিসে বিসমিল্লাহ বলার কথা এসেছে, কিন্তু এখন আপনি বিসমিল্লাহ বলার সময় এর যথার্থ কারণ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও অনুধাবন করবেন।

আসুন এবার বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীমের ভাষাতাত্ত্বিক কিছু নিয়ম সম্পর্কে জানা যাক।

বাসমালাহ-এর ভাষাতাত্ত্বিক কিছু নিয়ম :

প্রথম নিয়ম

বিসমিল্লাহর 'ب' দ্বারা ইস্তিয়ানাহ এবং তাওয়াক্কুল বোঝানো হয়। অর্থাৎ বিসমিল্লাহর যে ب সেটা দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরশীলতা নির্দেশ করা হয়। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এই নীতির নাম হলো : الجار والمجرور فى البسملة متعلق بمحذوف، تقديره فعل لائق بالمقام (আল-জার ওয়াল-মাজরুর ফিল-বাসমালাহ মুতায়াল্লিকুন বিল-মাহযুফ তাকদিরুহু ফি'লুন লায়িকুন বিল-মাকাম)।

কাজের শুরুতে যখন আপনি আরবিতে বিসমিল্লাহ বলেন, এটা অটোম্যাটিকালি সংশ্লিষ্ট কাজ—যেমন : খাওয়া, পান করা, লেখা ইত্যাদির প্রতি—ইঙ্গিত করে। আলাদাভাবে— 'আমি খাওয়া, লেখা কিংবা পান করার জন্য বিসমিল্লাহ বলছি'—এটা বলার প্রয়োজন হয় না।

www.banglakitab.weebly.com

আরবিতে বিসমিল্লাহ বললে এগুলো উহ্য থাকে। অর্থাৎ আমি খাচ্ছি, আমি পান করছি এগুলো মুখে উচ্চারণ করতে হয় না—এমনিতেই বলা হয়ে যায়। এটা আরবি ভাষার অসংখ্য মাধুর্যের অন্যতম।

খাওয়ার শুরুতে শুধু বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমেই আপনি বলছেন, 'আমি আল্লাহ ﷻ-এর নামে খাচ্ছি', যদিও আপনি খাওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করেননি। যদি কিছু লেখার আগে বিসমিল্লাহ বলেন, তাহলে অটোম্যাটিকালি এটা বোঝাবে যে, 'আমি আল্লাহ ﷻ-এর নামে লিখছি'। অর্থাৎ যখন কোনো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয় তখন আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কাজটির কথা মুখে উল্লেখ করা না হলেও শুধু বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমেই অটোম্যাটিকালি ওই কাজকে নির্দেশ করা হয়। প্রতিবার বিসমিল্লাহ বলার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এটা প্রকাশ পায় যে, আমি আল্লাহ ﷻ-এর নামে খাচ্ছি, আল্লাহ ﷻ-এর নামে পান করছি, আল্লাহ ﷻ-এর নামে গাড়িতে চড়ছি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় নিয়ম

লক্ষ করুন আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা আগে বিসমিল্লাহ বলছি এবং তারপর খাওয়া, পান করা, গাড়িতে চড়া ইত্যাদি কাজের কথা বলছি। কেন? কারণ, আল্লাহ ﷻ-এর নাম সব সময় বাক্যের শুরুতে বসবে। লক্ষ করুন, আমাদের বলতে হবে 'বিসমিল্লাহ, আমি খাচ্ছি'। 'আমি খাচ্ছি, বিসমিল্লাহ', এমনটা কখনো বলা যাবে না। দুটোর মাঝে বিরাট পার্থক্য।

কেন আমি খাচ্ছি, বলার আগেই বিসমিল্লাহ বলতে হবে? পরে কেন বলা যাবে না?

আরবি ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিদদের মতে, এর দুটি কারণ আছে।

প্রথমত, বাক্যের শুরুতে আল্লাহ ﷻ-এর নাম নিলে তা বারাকাহ্‌পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়ত, এই সামান্য পরিবর্তনের ফলেও বিরাট তারতম্য ঘটে। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রথমে আল্লাহ ﷻ-এর নাম উচ্চারণ করে কাজের উল্লেখকে বিলম্বিত করার মাধ্যমে—অর্থাৎ, 'আমি খাচ্ছি, বিসমিল্লাহ' বলার পরিবর্তে 'বিসমিল্লাহ আমি খাচ্ছি' বলার মাধ্যমে—আপনি আপনার কাজকে শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্দিষ্ট করে নিচ্ছেন। আরবি ব্যাকরণের এই নিয়মটি হলো : تأخير العامل يفيد الحصر (তা'খিরুল আমিল ইউফিদুল হাসর)।

অর্থাৎ শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা কাজটিকে শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্দিষ্ট করে নিচ্ছি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আল্লাহ ﷻ-এর নামে আমি খাচ্ছি। আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কারও নামে আমি খাই না।' বাক্যের শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজকে শুধু আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারণ করে নিলেন। এটাই হলো 'আমি খাচ্ছি, বিসমিল্লাহ' এবং 'বিসমিল্লাহ, আমি খাচ্ছি' এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য। একইভাবে, 'হে আল্লাহ,

www.banglakitab.weebly.com

আমি শুধু আপনারই জন্য লিখি', 'হে আল্লাহ, আমি শুধু আপনারই জন্য পান করি' এমন বলার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজগুলোকে শুধু আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারিত করে নিই।

বাসমালাহ দিয়ে শুরু করার দলিল :

লেখক কেন বিসমিল্লাহ দিয়ে তাঁর বই শুরু করলেন? কেন কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে? যেহেতু এটা এক ধরনের ইবাদত, তাই কোনো কিছুকে ইবাদত বলে দাবি করলে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি যা করছেন তা আসলেই ইবাদত। দলিল পেশ করার এই দায়িত্ব ইবাদতকারীর ওপরেই বর্তায়।

সুতরাং কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার দলিল কী?

এটি কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করার বিষয়টি কুরআন থেকে প্রমাণিত। কুরআনে ১১৪ বার বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম এসেছে। সূরা আত-তাওবাহ ছাড়া বাকি ১১৩টি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম এসেছে, আর সূরা আন-নামলে শুরুর পাশাপাশি মাঝখানেও একবার, অর্থাৎ মোট দুইবার, বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম এসেছে।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

> 'নিশ্চয়ই সেটা ছিল সুলাইমানের পক্ষ হতে (চিঠি)। (এতে বলা হয়েছে) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।' (সূরা আন-নামল, ৩০)

এই আয়াতের কারণে সূরা আত-তাওবাহর শুরুতে বিসমিল্লাহ না থাকা সত্ত্বেও কুরআনে মোট ১১৪ বার বিসমিল্লাহ এসেছে। ইবনু আব্বাস ﵁ বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দ্বারা সূরাসমূহের শুরু ও সমাপ্তি নির্ধারণ করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চিঠির শুরু করতেন বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দিয়ে

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার আরেকটি দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চিঠির শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম লিখতেন। বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠির শুরু হয়েছিল বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দিয়ে। তারপর বলা হয়েছিল, 'যারা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে, তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'।[৪]

৪ সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৭, ২৯৪১, ৬২৬০

www.banglakitab.weebly.com

হুদাইবিয়ার চুক্তির সময়, কুরাইশের পক্ষ থেকে মুসলিমদের কাছে দূত হিসেবে পাঠানো হয় সুহাইল ইবনু আমরকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী -কে বলেছিলেন,

اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'লেখো, বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম।'[৫]

যুহরি অনুরূপ আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে ইবনু হাজার বলেছেন, 'আলেমদের মাঝে এর ব্যাপক চর্চা ছিল এবং এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, তারা সব সময় বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলে তাদের কাজ শুরু করতেন।' আবু বকর -ও একই কাজ করতেন। আনাস ইবনু মালিক -কে সাদাকার ব্যাপারে চিঠিসহ বাহরাইনে পাঠাবার সময় আবু বকর চিঠির শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম লিখেছিলেন।

বাসমালাহ-এর ব্যাপারে একটি দুর্বল হাদিস

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার ব্যাপারে একটি যইফ বা দুর্বল হাদিস আছে। এই হাদিসে বলা হয়েছে–'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম ছাড়া শুরু করা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে কল্যাণ হবে না।'[৬]

একটি বর্ণনায় এখানে আকতা (أقطع) ও অন্য একটি বর্ণনায় আবতার (أبتر) শব্দটি এসেছে। হাদিসটি ইবনু হিব্বানসহ আরও কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং এটি যইফ। কিছু কিছু আলিম এ হাদিসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণের অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হাদিসটি যইফ। ইবনু হাজার, আস-সুয়ুতি, আলবানি এবং আরও অনেক মুহাদ্দিস এই হাদিসটিকে যইফ বলেছেন। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে, যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় আমরা এখন যাচ্ছি না। তবে হাদিসটির যইফ হবার কারণগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে মাগরিবের বিখ্যাত হাদিস বিশারদ শাইখ আল-কাত্তানি -এর–যিনি প্রায় ৮০ বছর আগে ইন্তেকাল করেন–একটি সম্পূর্ণ পুস্তিকা আছে, যার নাম হলো : الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة (আল আকায়িলুল মুফাস্সালাহ লিবায়ানি হাদিসিল ইবতিদায়ি বিল-বাসমালাহ)।

এই হাদিসটি সহিহ হলে, আমাদের অন্য কোনো দলিল পেশ করার প্রয়োজন হতো না। প্রমাণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। কিন্তু হাদিসটি যইফ হওয়াতে আমরা একে দলিল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। এ কারণে আমরা অন্যান্য দলিল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে দেখিয়েছি যে, কোনো কিছুর শুরুতে, যেমন বই লেখার আগে, বিসমিল্লাহ বলার অনুমোদন আছে।

৫ সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৭৩২

৬ এর সনদে কুররাহ ইবনু আবদির রাহমান রয়েছে। ইমাম আবু যুরয়া তাকে মুনকার বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, হাদিসটি মারাত্মক পর্যায়ের অগ্রহণযোগ্য। (দেখুন : তাহযিবুত তাহযিব, ৮/৩৭৩)

www.banglakitab.weebly.com

বাসমালাহ্-এর বারাকাহ্ :

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা এতে বারাকাহ্ চেয়ে থাকি। যেকোনো কাজে বারাকাহ্ পাবার জন্য শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলুন। ইসলাম আমাদের উদ্বুদ্ধ করে সর্বাবস্থায়, সকল পরিস্থিতিতে বিসমিল্লাহ্ বলতে।

যানবাহনে চড়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলুন। নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ....

এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামে। (সূরা হুদ, ৪১)

কুরবানির সময় বিসমিল্লাহ বলুন।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

'যে জন্তুর জবাইকালে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ করো।' (সূরা আল-আনআম, ১১৮)

খাওয়া ও পান করার সময় বিসমিল্লাহ বলুন। উমার ইবনু আবি সালামাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

'বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করো, ডান হাত দিয়ে খাও। আর তোমার নিকটাংশ থেকে খাও।'[৭]

এমনকি স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিসমিল্লাহ্ বলতে শিখিয়েছেন :

بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমাদের শয়তান হতে বাঁচান এবং আমাদের যে সন্তান দেবেন তাকেও শয়তান হতে বাঁচান।[৮]

ঘরের বাতি নেভানো এবং পাত্র ঢেকে রাখার সময়ও বিসমিল্লাহ বলুন। বুখারি ও মুসলিমে আছে, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ ﷻ-এর

৭ সহিহুল বুখারি : ৫৩৭৬; সহিহ মুসলিম : ৫৩৮৮
৮ সহিহুল বুখারি : ১৪১; সহিহ মুসলিম : ৩৬০৬

www.banglakitab.weebly.com

নামে পাত্র ঢেকে রাখবে এবং আল্লাহ ﷻ-এর নামে বাতি নিভিয়ে দেবে।'[১]

জীবনকে বারাকাহ্‌পূর্ণ করে তুলতে প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলার অভ্যাস করুন। বর্তমানে আমাদের জীবন থেকে বারাকাহ্ চলে যাবার একটি কারণ হলো দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না বলা। অন্যরা যখন দুনিয়াবি উপকরণের মাঝে বারাকাহ্ খুঁজে বেড়ায়, আমরা মুসলিমরা তখন আল্লাহ ﷻ-এর কাছে বারাকাহ্ চাই। বিসমিল্লাহ্ হলো প্রতিটি কাজে বারাকাহ্ পাবার উপায়। যদি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে বারাকাহ্ আপনার সাথে থাকে, তবে অন্য কিছুর কি আর প্রয়োজন আছে?

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'যদি নগরবাসী ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।' (সূরা আল-আরাফ, ৯৬)

বিসমিল্লাহ্ বলুন, আল্লাহ ﷻ আপনার জন্য আসমান ও জমিনের কল্যাণের দরজা খুলে দেবেন। বারাকাহ্ আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে কল্যাণ। আমরা অনেক সময় চিন্তা করি, কেন আজ আমাদের সময়, খাবার, ঘুম কিংবা কুরআন তিলাওয়াত - কিছুতেই কোনো বারাকাহ্ নেই। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি এতদিন কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলেছেন? অন্তরের গভীর থেকে এর প্রকৃত অর্থ বুঝে বলেছেন? ইন শা আল্লাহ্ এই আলোচনার পর আপনি বিসমিল্লাহ্‌র তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখবেন।

১ সহিহুল বুখারি : ৩৩০৪; সহিহ্ মুসলিম : ৫৩৬৮

www.banglakitab.weebly.com

দারস ২

বিসমিল্লাহ নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম? :

কোনো কাজের শুরুতে আমরা কি শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলব, নাকি 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম'? এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যেসব কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার সুনির্দিষ্ট দলিল আছে সেগুলো ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' বলা যাবে। যেমন : বই লেখা, দৈনন্দিন ডাইরি লেখা এসব ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলতে পারেন। এটা মুস্তাহাব। অবশ্য লেখালেখির বিষয়, যেমন বই লেখার ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলার স্বপক্ষে দলিলও পাওয়া যায়। যেমন : হুদাইবিয়া সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিপত্রে সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যে বিষয়ে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দলিল নেই, সে ক্ষেত্রে আপনি বিসমিল্লাহ কিংবা বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম, যেকোনো একটা বলতে পারবেন।

তবে কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু বিসমিল্লাহ বলেছেন, এমন দলিল আছে। যেমন : খাওয়ার আগে কি আপনি বিসমিল্লাহ বলবেন, নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম? এ ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। *সুনান আত-তিরমিযি*তে আ'ইশা ﵂ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খাবার সময় বিসমিল্লাহ বলো। আর যদি খাবার শুরুতে বলতে ভুলে যাও তাহলে বলো,

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

আল্লাহর নামেই শুরু এবং শেষ।[১০]

---

১০ *সুনানুত তিরমিযি* : ১৭৮১

www.banglakitab.weebly.com

লক্ষ করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিন্তু বলেননি, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ বল। এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে বলেছেন এবং তিনি এ কথাটি দুবার বলেছেন। প্রথমবার বলেছেন, খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলো। দ্বিতীয়বার খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে কী বলতে হবে, সেটা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। যদি কেউ শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহলে যখনই মনে পড়বে তখন সে বলবে,

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

দুবারই রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু বিসমিল্লাহ বলতে বলেছেন।

ইবনু মাসউদ رضي الله عنه থেকেও এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হাজার আসকালানি رحمه الله বলেছেন, এটি উক্ত বিষয়ের (অর্থাৎ খাবার আগে বিসমিল্লাহ বলার) ওপর বর্ণিত সবচেয়ে স্পষ্ট হাদিস।

সমস্যা হলো, ইমাম নাওয়াউয়ী رحمه الله তার *আল-আযকার* গ্রন্থে বলেছেন, খাবার আগে বিসমিল্লাহ বলার চেয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলা ভালো।[১১] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله-ও বলেছেন, এ ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলা উত্তম।[১২] তবে ইমাম নাওয়াউয়ী رحمه الله-এর এই উদ্ধৃতির ব্যাপারে ইবনু হাজার আসকালানি رحمه الله মন্তব্য করেছেন, 'বিসমিল্লাহর চেয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলা উত্তম, এ কথার পক্ষে কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নেই।'[১৩]

সামুরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيْهِ

'তোমরা হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার কথার সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ কোরো না।'[১৪]

'আমার কথার সাথে বাড়তি কিছু যোগ কোরো না' এই কথাটির দুটো অর্থ আছে। সাধারণভাবে এর অর্থ হলো কোনো হাদিস শেখার পর তা বর্ণনা করার সময় বাড়তি কিছু যোগ করা যাবে না। তবে প্রায়োগিক দিক থেকে, আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও এর একটি অর্থ আছে। আর এ অর্থটি হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রেও হাদিসে যা এসেছে তার সাথে বাড়তি যোগ করা যাবে না। যদি হাদিসে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার কথা এসে থাকে, তাহলে শুধু বিসমিল্লাহ বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কোনো ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহর সাথে আর-রাহমান, আর-রাহীম যুক্ত না করে থাকেন, তাহলে আমাদের আগ বাড়িয়ে সেটা করার দরকার নেই।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বালককে শেখাচ্ছিলেন—মাথায় রাখুন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

১১ নাওয়াউয়ী, *আল-আযকার* : ১/২৩১
১২ ইবনু তাইমিয়্যাহ, *ফাতাওয়া আল-কুবরা* : ৫/৪৮০
১৩ আসকালানি, *ফাতহুল বারি* : ৯/৪৩১
১৪ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বর্ণনা নং : ২০১৩৮

www.banglakitab.weebly.com

কখনোই দ্বীনের কোনো ইলম গোপন করতেন না, বিশেষ করে কিছু শেখানোর সময়। তিনি ছিলেন আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে একজন ফায়সালা প্রদানকারী, যখন তিনি কিছু দেখতেন সে বিষয়ে ফায়সালা দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার ইবনু আবি সালামাহ رضي الله عنه-কে বলেছিলেন :

قُلْ بِسْمِ اللهِ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

'বিসমিল্লাহ্ বলে খাও, ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছ থেকে খাও।'[১৫]

এ হাদিসে খাবার শুরুতে শুধু বিসমিল্লাহ্ বলার কথা এসেছে। অনেকেই বলবেন যে, এ বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দেয়ার কী আছে? বিসমিল্লাহ্ নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম, এটাকে এত বড় করে দেখার কী হলো? গুরুত্ব দেয়ার কারণ হলো, বিষয়টি ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। ইবাদতের বেলায়, আমরা কেবল দলিল ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই আমল করব। কেননা, ইবাদত কিংবা ইসলামের অন্য কোনো বিষয়ে নিজ থেকে বাড়তি কিছু সংযোজন করার অর্থ হলো আমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে বলছি, 'এ ব্যাপারে আপনারা পুরোপুরি জানেন না, তাই আমি নিজের পক্ষ থেকে সামান্য কিছু যোগ করতে চাই!' ইসলামে নতুন বিষয় সংযোজন করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলার মতোই।

সহিহ্ মুসলিমে এসেছে, এক জুমুআর দিনে উমারাহ ইবনু রুয়া'ইবাহ رضي الله عنه দেখলেন বিশর ইবনু মারওয়ান মিম্বারে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলেছেন। তখন উমারাহ বললেন, قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ আল্লাহ ﷻ এ দুহাতকে লাঞ্ছিত করুন। আমি নবি ﷺ-কে মিম্বারে দাঁড়ানো দেখেছি, তিনি কখনোই তর্জনী ওঠানোর বেশি আর কিছু করেননি। নবি ﷺ কেবল এতটুকুই করেছিলেন, তুমি কোথা থেকে এই নতুন বিষয় (দুহাত তোলা) আমদানি করলে?[১৬]

ইমাম নাওয়াউয়ী رحمه الله এ হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'খুতবাহ্ দেয়ার সময় হাত না তোলা সুন্নাহ্।'[১৭]

কিছুদিন আগে এ বিষয়টি নিয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমি এলাকার একটি মাসজিদে জুমুআ পড়তে গিয়েছিলাম। খতিব ছিলেন একজন যুবক। তিনি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে বললেন খুতবার সময় দুহাত তোলা উচিত না। তারপর তো মাসজিদে গন্ডগোল বেধে গেল। 'হ্যাঁ! হাত তোলা যাবে না মানে?! কোন সাহসে আপনি এ কথা বলছেন?' এ ধরনের উত্তেজিত কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমি প্রবন্ধটি লিখেছিলাম। বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনারা প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।[১৮]

---

১৫ বাগাবি, *মু'জামুস সাহাবাহ*, বর্ণনা নং : ১৭৭২

১৬ *সহিহ্ মুসলিম* : ২০৫৩, *সুনানু আবি দাউদ* : ১১০৬

১৭ নাওয়াউয়ী, *শারহু মুসলিম* : ১৫/১৬২

১৮ Raising the Hands During Jummah Khutbah for Duaa'
http://www.ahmadjibril.com/articles/jummahhands.html

www.banglakitab.weebly.com

মুস্তাদারাক আল-হাকিমের বর্ণনায় এসেছে, ইবনু উমার ﷺ একবার এক লোককে হাঁচি দিতে দেখার পর বললেন, 'হাঁচি দেওয়ার পর তুমি কী বলো? তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলবে।'

আসলে ওই লোকটি হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ' বলেছিলেন। তিনি 'ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ', এই অংশটুকু বাড়িয়ে বলেছিলেন। লক্ষ করুন, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ এর অর্থ অত্যন্ত চমৎকার। 'দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর।' কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 'হাঁচি দেয়ার পর আলহামদুলিল্লাহর পাশাপাশি এই চমৎকার কথাটা বললে অসুবিধাটা কোথায়? এটা তো সুন্দর কথা!' কিন্তু ইবনু উমার ﷺ তাকে বাড়তি এ কথাটুকু বলতে মানা করলেন। তিনি লোকটিকে শুধু 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে বললেন, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু আলহামদুলিল্লাহ-ই বলেছেন, বাড়তি কিছু বলেননি।

ইবনু আবিদিন ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, আর এর সাথে 'ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ' যুক্ত করা অপছন্দনীয়। আস-সুয়ুতি ﷺ বলেছেন, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কিছু খুতবাহর শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ বলেছেন, তারপরও এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, হাঁচির পর 'আলহামদুলিল্লাহ'-এর সাথে এমনটা বলা জঘন্য বিদআহ। তাই হাঁচির পর শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলবেন, কারণ নবিজি ﷺ আলহামদুলিল্লাহ-ই বলেছেন, আর কিছু বলেননি। আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলার পর কেউ সেটার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে, সেটার জবাব দিন। তারপর ইচ্ছে হলে আলাদাভাবে 'ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ' বলুন। যতবার ইচ্ছা বলুন। কোনো সমস্যা নেই।

আমরা খাবার ব্যাপারটাতে ফিরে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার ইবনু আবি সালামাহ ﷺ-কে বলেছেন :

إِذَا أَكَلْتَ، فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ

যখন তুমি খাবার খাবে, তখন বিসমিল্লাহ বলবে এবং ডান হাতে খাবে।[১৯]

আমরা এ হাদিসেও দেখছি, তিনি ﷺ সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলতে বলেননি। এ ছাড়া এ ব্যাপারে আ'ইশা ﷺ এবং ইবনু মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত হাদিসগুলোও আছে, যেগুলোকে ইবনু হাজার ﷺ এই বিষয়ের সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল বলেছেন। কাজেই হাদিসের বক্তব্যের অনুসরণ করাই উত্তম।

আরও কিছু ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার কথা বলেছেন।

---

১৯ তাবারানি, *আল-মু'জামুল কাবির* : ৮৩০৪; আবু আওয়ানাহ, *আল-মুসতাখরাজ* : ৬৬৬১

www.banglakitab.weebly.com

যেমন : স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার সময়। বুখারি ও মুসলিমে[২০] আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ, আমাদের তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদের তুমি যা দান করবে তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো।

আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদিসে[২১] এসেছে, টয়লেটে যাবার সময় বলতে হবে,

بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ জিন ও দুষ্ট নারী জিনের অনিষ্ট থেকে।

লক্ষ করুন, সবগুলো ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্টভাবে শুধু বিসমিল্লাহ বলার কথা এসেছে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার বিষয়টি এভাবে সুনির্দিষ্ট হাদিস বা দলিল দ্বারা প্রমাণিত না, সেসব ব্যাপারে আপনি চাইলে সম্পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম', বলতে পারেন। কিন্তু যেসব বিষয়ে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এর ওপরেই আমল করতে হবে।

আল্লাহ :

আল্লাহ হলো ওই রবের স্বতন্ত্র নাম যিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছেন। 'আল্লাহ' হলো ওই নাম যা শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারিত।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

তিনি আকাশ, জমিন আর এ দুয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক, কাজেই তুমি তাঁর ইবাদত করো এবং এর ওপর দৃঢ় থাকো। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন আর কাউকে জানো? (সূরা মারইয়াম, ৬৫)

'তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন আর কাউকে জানো?' আয়াতের শেষাংশের এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী? এখানে মূলত উত্তর জানার জন্য প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়নি; বরং এটা একটা রেটোরিকাল প্রশ্ন, যা করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট উত্তরের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য। আমাদের সামনে একটি নির্দিষ্ট উত্তর তুলে ধরার জন্য। কিছু আলিম বলেছেন, 'আপনি কি আপনার রবের সমগুণসম্পন্ন আর কাউকে জানেন?' এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া এমন আর কোনো সত্তা নেই যার নাম 'আল্লাহ'।

---

২০ *সহিহুল বুখারি* : ১৪১; *সহিহ মুসলিম* : ৩৬০৬
২১ নাওয়াউয়ী, *আল-আযকার*, ৩৮ পৃ.

www.banglakitab.weebly.com

এর মানে কী? আসুন একটু বিস্তারিতভাবে দেখা যাক।

আল্লাহ শব্দটি এসেছে আরবি ইলাহ (إله) থেকে। ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ এবং আরও অনেকের মতে আল্লাহ শব্দের মূল শব্দ হলো ইলাহ। ইলাহ এসেছে উলুহিয়্যাহ (একত্ব) থেকে। ইলাহ অর্থ একত্ব। এই মূল ইলাহ শব্দ থেকেই আল্লাহ নামের উৎপত্তি। সিবাওয়াইহ বলেন, ইলাহর সাথে যথাক্রমে আলিফ ও লাম যুক্ত হয়েছে তাযিম বা সম্মানার্থে। ইলাহর সাথে আলিফ ও লাম যোগ করে যদি আপনি শাদ্দাহ যোগ করেন এবং একটি হামযা বের করে দেন, তাহলে 'আল্লাহ' নামটি পাবেন।

কুরআনে 'আল্লাহ' এবং 'রব', কোনটি কখন ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষ করুন :

মুসা ﷺ তাঁর পরিবারকে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচাতে আগুনের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। উষ্ণতার জন্য আগুন ও পথচলার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল আলোর। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

হে মুসা, নিশ্চয় আমিই তোমার রব। সুতরাং তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো, কেননা তুমি এখন পবিত্র তুয়া উপত্যকায় রয়েছ। (সূরা আত-ত্বহা, ১২)

আল্লাহ বলছেন, হে মুসা, নিশ্চয় আমিই তোমার রব। তিনি এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি পালনকর্তা হিসেবে তাঁর পরিচয় বেছে নিয়েছেন, কেননা এ সময় এটাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত। আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-কে এর মাধ্যমে বলছেন, আমিই তোমার দেখাশোনা করি এবং তোমাকে বাঁচিয়ে রাখি। আমিই তোমাকে রক্ষা করি, নিরাপত্তা দিই এবং আমিই তোমাকে রিযক দিই। বলুন তো, এগুলো তাওহিদের কোন দিক? এটা হলো তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ। অর্থাৎ রব হিসেবে আল্লাহ ﷻ-এর একত্ব।

তারপর একই কথোপকথনে আল্লাহ ﷻ তাঁর 'আল্লাহ' নামটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাকো। আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো। (সূরা আত-ত্বহা, ১৩-১৪)

এবার আল্লাহ ﷻ বলছেন 'আনাল্লাহ' (أَنَا الله)—আমিই আল্লাহ। এখানে তিনি 'রাব্বুকা (رَبُّكَ)—তোমার রব' ব্যবহার করেননি। কিছুক্ষণ আগেই তিনি নিজেকে 'রব' নামে অভিহিত করেছেন, আবার এখন 'আল্লাহ' বলছেন, কেন?

www.banglakitab.weebly.com

প্রথমে মুসা ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই আল্লাহ ﷻ তাকে আশ্বস্ত করলেন, নিজেকে রব অভিহিত করে মুসা ﷺ-কে বোঝালেন—আমি তোমার খেয়াল রাখি, তোমাকে রক্ষা করি, নিরাপত্তা দান করি এবং সাহায্য করি। আর পরেরবার আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-কে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করলেন। অর্থাৎ মুসা ﷺ-কে জানালেন, হে মুসা, তোমাকে এই এই কাজগুলো করতে হবে।

তাওহিদের এই শাখাকে কী বলা হয়? যখন আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যের ব্যাপার আসে, তখন সেটা তাওহিদের কোন শাখায় পড়ে? তাওহিদ আল-উলুহিয়্যাহ। অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্যের মালিক হিসেবে, ইলাহ হিসেবে আল্লাহ ﷻ-এর একত্ব।

আর এ কারণেই আল্লাহ ﷻ এ ক্ষেত্রে 'রব'-এর পরিবর্তে 'আল্লাহ' নামটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলছেন :

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

আমার ইবাদত করো, সালাত কায়েম করো।

এগুলো কী? আনুগত্য ও ইবাদতের নির্দেশ। আর এসবই হচ্ছে তাওহিদ আল-উলুহিয়াহর অন্তর্ভুক্ত।

তাই প্রথমে আল্লাহ ﷻ বললেন :

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

নিশ্চয়ই আমি তোমার রব।

পরেরবার বললেন :

إِنَّنِي أَنَا اللهُ

নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ।

চাইলে তিনি যেকোনো একটি নাম ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কখনো 'আল্লাহ', কখনো 'রব' ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটা কুরআনের ভাষাগত গভীরতা ও সূক্ষ্মতার প্রমাণ।

আল্লাহ এক অনন্য নাম

আল্লাহ ﷻ-কে ডাকার সময় আমরা বলি, 'ইয়া আল্লাহ' বা 'হে আল্লাহ'। আরবি ভাষাতত্ত্ববিদ ও সালাফদের অন্তর্ভুক্ত আলিমগণ, সবাই বলেছেন যে, ইয়া আল্লাহ বলতে হবে (ইয়া ইলাহ

www.banglakitab.weebly.com

না)। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-এর অন্য নামগুলোর দিকে তাকান। আমরা কি বলি 'ইয়া আল-জাব্বার', 'ইয়া আল-কারিম' কিংবা 'ইয়া আর-রাহীম'? না, বরং আমরা শুরুতে 'আল' যুক্ত না করেই, ইয়া কারিম, ইয়া রাহীম, ইয়া গাফুর ইত্যাদি বলি। আল্লাহ নামের শুরুতে আলিফ এবং লাম থাকার কারণে, তা 'নির্দিষ্ট' অর্থ বোঝায়।[২২] এটাই হচ্ছে অন্য সব নামের তুলনায় আল্লাহ নামের স্বাতন্ত্র্য। এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম ত্বহাবি, ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ-সহ অনেকে বলেছেন, কেউ যদি এই মহান, বরকতময় নাম উল্লেখ করে দুআ করে, ভিক্ষা চায়, তবে আল্লাহ ﷻ তার উত্তর দিয়ে থাকেন। আসমা ওয়াস সিফাত নিয়ে আলোচনা করার সময় ইন শা আল্লাহ এ বিষয়ে আমরা আরও আলোকপাত করব।

শুধু 'আল্লাহ' শব্দে কোনো যিকির নেই

দুআ, প্রশংসা, সম্মান ও শাহাদাহ সবকিছুতে আমরা আল্লাহ ﷻ-এর নাম নিই। কিন্তু শুধু 'আল্লাহ' শব্দে কোনো যিকির হয় না। এটাই আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষা। সুতরাং এক শ বার 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ' বলায় আপনার কোনো লাভ নেই। তাসবীহ হাতে নিয়ে এক শ বার আল্লাহ বলতে হবে না; বরং আপনি বলুন আলহামদুলিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আপনি এভাবে বলুন যে, 'ইয়া আল্লাহ আমার অমুক জিনিসটির খুব প্রয়োজন!' শুধু 'আল্লাহ, আল্লাহ' যিকির করার শিক্ষা নবি ﷺ আমাদের দেননি।

যে পবিত্র নামের অনুগামী অন্য সব নাম

অন্য সমস্ত গুণবাচক নাম 'আল্লাহ' নামের অনুসরণ করে। আল্লাহ নামটি অন্য কোনো নামের অনুসরণ করে না। এর অর্থ কী? একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই, তাহলে ইন শা আল্লাহ ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। দেখুন : আল-কুদ্দুস, আল-আযিয, আল-জাব্বার, আল-খালিক—এ সবগুলোই আল্লাহ ﷻ-এর নাম। কিন্তু আমরা কখনো বলি না যে, আল-আযিযের আরেকটি নাম হলো 'আল্লাহ'। আমরা বলি না যে, আর-রাহমানের আরেকটি নাম হলো আল্লাহ। এভাবে বলা অনুচিত। বরং আমরা এটাকে একটু ঘুরিয়ে বলি, আল-কুদ্দুস হলো আল্লাহ ﷻ-এর আরেক নাম। আল-আযিয হলো আল্লাহ ﷻ-এর আরেক নাম। আর-রাহমান হলো আল্লাহ ﷻ-এর আরেক নাম। অর্থাৎ অন্যান্য গুণবাচক নামগুলো 'আল্লাহ' নামের অনুসরণ করে।

---

২২ যেমন ইংলিশে আমরা the ব্যবহার করি। a door মানে একটি দরজা। এটা যেকোনো দরজা হতে পারে। কিন্তু the door মানে 'দরজাটি', অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দরজা। আরবি 'আল' 'the'-এর মতো নির্দিষ্টতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ্ নামের মাঝে নিহিত তাওহিদ

আমরা এরই মধ্যে দেখেছি যে বাসমালাহর মধ্যে তাওহিদের তিনটি শাখার শিক্ষা অন্তর্নিহিত আছে। যখন আমরা বিসমিল্লাহ বলি, আমরা তাওহিদের তিনটি শাখার স্বীকৃতি দিই। একইভাবে আল্লাহ নামটির মধ্যেও তাওহিদের তিনটি শাখাতে বিশ্বাস নিহিত আছে। বরং আল্লাহ নামটির যে মূল শব্দ ইলাহ, তাতেই তাওহিদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে এবং এই বিশ্বাসের ওপর ঈমান আনার আবশ্যকতা প্রকাশ পেয়েছে।

توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية

তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ হলো তাওহিদ আল-উলুহিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ। কিন্তু উল্টোটা না। তাওহিদ আল-উলুহিয়াহ কিন্তু তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহর অংশ না। লক্ষ করুন, 'আল্লাহ' শব্দটি মূলত এসেছে উলুহিয়্যাহ (একত্ববাদ) থেকে, আবার তাওহিদ আল-উলুহিয়্যাহর মধ্যে তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ অন্তর্ভুক্ত। কাজেই 'আল্লাহ' শব্দের মাধ্যমে উলুহিয়্যাহ এবং রুবুবিয়্যাহ দুটোই প্রকাশ পায়। কাজেই এখানে তাওহিদের তিনটি প্রকারের মধ্যে দুটি পাওয়া গেল। আর 'আল্লাহ' শব্দটি স্বয়ং একটি 'ইসম' বা নাম। তাই এর মাধ্যমে তাওহিদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতও প্রকাশ পায়। এভাবেই আল্লাহ শব্দের মাঝে তাওহিদের তিনটি শাখার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু আল্লাহ-ই না, বরং এর মূল শব্দ ইলাহর ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

আল্লাহ্ এক পরাক্রান্ত নাম

আল মু'জামুল মুফাহরাস অনুযায়ী কুরআনে মোট ২৬০২ বার 'আল্লাহ' নামটি এসেছে। এটি আল্লাহ ﷻ-এর সর্বাধিক প্রচলিত নাম। আল্লাহ ﷻ-এর সব নামের মধ্য থেকে তাওহিদের সাক্ষ্য তথা শাহাদাহর জন্য বাছাই করা হয়েছে এই নামটিকেই। শাহাদাহ পড়ার সময় আমরা বলি, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'আল্লাহ' এই মহিমান্বিত নামের ওপরেই আমরা ঈমানের সাক্ষ্য দিই।

আল্লাহ–নিছক একটি নাম না। আপনি যখন বলছেন 'আল্লাহ', তখন মহিমান্বিত, পরাক্রমশালী ও পরম সম্মানিত এক সত্তার নাম উচ্চারণ করছেন। চরম আতঙ্কের মুহূর্তে নিরাপত্তার জন্য আমরা এ নাম ধরেই ডাকি। অভাবের সময় সামান্য জিনিসের ওপর বারাকাহ্র প্রয়োজনে আমরা এই পবিত্র নামটিই স্মরণ করি, আর অপ্রতুলতা প্রাচুর্যে পরিণত হয়। আশঙ্কায় পতিত ব্যক্তি নিরাপত্তার আশায় এই নাম উচ্চারণ করে। চরম দুর্দশা, দুঃখ, কষ্ট ও নিদারুণ যন্ত্রণায় আমরা এই নামটিই স্মরণ করি–আল্লাহ! যখন মানুষ বিপদ ও চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ ﷻ-কে ডাকে, আল্লাহ ﷻ তার বিপদ ও চিন্তা দূর করে দেন। যখন কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি

www.banglakitab.weebly.com

'আল্লাহ' নামকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ ﷻ তাকে সচ্ছলতা দান করেন। পীড়িত ব্যক্তি যখন আল্লাহ ﷻ-কে এ নামে ডাকে, আল্লাহ ﷻ তাকে সুস্থতা দান করেন। এ নাম যখন চরম দুর্দশাপন্ন ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয়, সে নিরাপত্তা লাভ করে। যখন অসহায় ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয়, আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমতা ও মর্যাদা দান করেন। যখন কোনো মাযলুম এ নামকে আঁকড়ে ধরে, এই নামে মালিককে ডাকে, আল্লাহ ﷻ তাকে বিজয় দান করেন।

যদি অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হন, তবে আপনার রবকে 'আল্লাহ' নামে ডাকুন। প্রাচুর্য ও বারাকাহ্ চাইলে 'আল্লাহ' বলে ডাকুন। আপনার গুনাহ্ খাতা মাফ করাতে চাইলে আল্লাহ্ নামে ডাকুন।

আল্লাহ! এ কোনো সাধারণ নাম না! আমরা কি আদৌ এ নামের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারি? যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর নামগুলোর অর্থ অনুধাবন করবে, এ নামগুলোর মাহাত্ম্য অন্তরের গভীর থেকে উপলব্ধি করবে, সে লাভ করবে পরমানন্দ।

আল্লাহ্ নামটি যে হৃদয়ে রাজত্ব করে তা পরিণত হয় এক দৃঢ়, শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও একইসাথে রাহমাহপূর্ণ হৃদয়ে। এ হৃদয় যে আল্লাহ্ নামকে ধারণ করেছে! আল্লাহ্ তো যেনতেন কোনো নাম না! যে হৃদয় সত্যিকারভাবে 'আল্লাহ' নামের মর্মার্থ অনুধাবন করেছে তা কখনো, কোনো গুনাহকে তুচ্ছ ভাবতে পারে না। আমরা প্রতিদিন ১৭ বার ফরয আদায় করার জন্য আল্লাহকে ডাকি। প্রতিদিন ফরয সালাতে সূরা ফাতিহার সাথে ১৭ বার আমাদের বিসমিল্লাহ্ বলতে হয়। সেই সাথে সুন্নাহ সালাতের জন্য আরও ১০ বার আমাদের বিসমিল্লাহ্ বলতে হয়। আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত ফরয আদায়ের জন্য বিসমিল্লাহ্ বলার সময় একে অন্যান্য কোনো সাধারণ শব্দের মতো মনে করবেন না। আল্লাহ্–এ কোনো মামুলি শব্দ না। স্বামী-স্ত্রী, বস, রাজা, প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রীর নাম নেয়ার সময় অনেকের মধ্যে এত বেশি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখা যায়, যা আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধাকেও ছাপিয়ে যায়। কাজেই আল্লাহ ﷻ-এর নাম শোনার পর হৃদয়ে কী অনুভব করেন, তার মাধ্যমে নিজের ঈমানের গভীরতা যাচাই করুন।

وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

> যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। (সূরা আয-যুমার, ৪৫)

যখন আপনি 'আল্লাহ' বলছেন, আপনি সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার নাম নিচ্ছেন যিনি সাত আসমানকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন কোনোরকম স্তম্ভ ছাড়াই। আপনি উচ্চারণ করছেন সেই একচ্ছত্র অধিপতির নাম, যিনি 'কুন' (كُنْ) আদেশ দিয়ে সাত জমিনকে আপনার নিচে সুবিন্যস্ত করেছেন, আর নিঃসৃত বীর্য থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম আকৃতিতে। যখনই আপনি কোনো বাক্যে 'আল্লাহ' শুনতে পাবেন, মনের গভীর থেকে এ কথাগুলো স্মরণ করবেন। যখন এ মহিমান্বিত ও পবিত্র নাম উচ্চারণ করবেন, স্মরণে

www.banglakitab.weebly.com

করবেন :

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। এবং শেষ বিচারের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে। আর আসমানসমূহ থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়। তিনি পবিত্র, আর এরা তাঁকে যার সাথে শরীক করে, সেসব থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে। (সূরা আয-যুমার, ৬৭)

যারা আল্লাহ ﷻ-কে অবমূল্যায়ন করে, আল্লাহ ﷻ-এর নাম উচ্চারিত হলে যারা যথাযথ সম্মান দেয় না, তাদের মতো হবেন না। এই নামের অর্থ, এই নামের মাহাত্ম্য অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক।

আর রাহমান আর-রাহীম :

রাহমান বলতে সেই সত্তাকে বোঝানো হয় যিনি পরিপূর্ণ দয়ার অধিকারী। যাঁর দয়া সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে রেখেছে। 'আর-রাহমান' আল্লাহ ﷻ-এর স্বতন্ত্র নামগুলোর একটি। এ নামটি শুধু মহান আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারিত। এটি একটি ওয়াসফ বা বর্ণনামূলক নাম, যা আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ বা দয়ার বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করে। তিনিই হলেন আর-রাহমান যিনি মহান, সুবিশাল, ব্যাপক ও পরম করুণার অধিকারী। আর এ পরিপূর্ণ, পরম দয়া শুধু আল্লাহ ﷻ-এর, আর কারও নয়।

আরবি ভাষার নিয়ম অনুযায়ী ফা'লান (فعلان)-এর ওযনে (form or scale) থাকা শব্দগুলো দ্বারা মূলত বিশালতা, আধিক্য ও ব্যাপকতা বোঝানো হয়। ফা'লানের ওযনের কিছু শব্দ হলো রাহমান, গাদ্বান, সারকান ইত্যাদি। লক্ষ করুন, এ প্রতিটি শব্দ ছন্দের দিক দিয়ে ফা'লানের সাথে মেলে। আর আরবিতে এ রকম শব্দগুলোর দ্বারা বিশালতা, আধিক্য ও ব্যাপকতা বোঝানো হয়। কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের শব্দগুলো প্রয়োগ করা হলে কেমন অর্থ প্রকাশ পায় দেখুন :

গাদ্বান, এ শব্দটির অর্থ রাগ। কিন্তু কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এটা শুধু রাগ বোঝায় না, বরং প্রচণ্ড ও চরমমাত্রার রাগ বোঝায়। একইভাবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্বশান শব্দটি ব্যবহার করা হলে সেটা প্রচণ্ড, মারাত্মক ও তীব্র পিপাসাকে বোঝায়। অর্থাৎ ফা'লানের সাথে একই ছন্দে থাকা এ শব্দগুলো দ্বারা ব্যাপকতা ও আধিক্য বোঝানো হয়। আর-রাহমান এর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম, আর তাই শুধু আল্লাহ ﷻ-এর জন্যই এ শব্দটি প্রযোজ্য। আর-রাহমান দ্বারা এমন পর্যায়ের দয়া বা করুণা বোঝানো হয় যা একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর এখতিয়ারভুক্ত। মু'জামুল মুফাহরাস অনুযায়ী কুরআনে ৫৭ বার আর-রাহমান এসেছে।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ হলেন আর-রাহমান, পরম দয়াময়, পরম করুণাময়।

এবার আসা যাক আর-রাহীমের আলোচনায়। আর-রাহীম হলো এমন একটি নাম যা ক্রিয়া বা কর্ম নির্দেশ করে। এ নামটির অর্থ কাজের সাথে যুক্ত। আর রাহীম দ্বারা বোঝানো হয় সেই একক সত্তাকে যার করুণা সকলের কাছে পৌঁছায়। এটি আল্লাহ ﷻ-এর নাম, তবে শর্তসাপেক্ষে মানুষের ক্ষেত্রে এ নাম ব্যবহার করা যায়। মু'জামুল মুফাহরাস অনুযায়ী কুরআনে ১১৪ বার আর-রাহীম নামটি এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর দয়াকে বোঝানো হয় যা পরিব্যাপ্ত করে আছে সব সৃষ্টিকে।

রাহীম শব্দটি ফায়ীল (فعيل)-এর মাত্রাভুক্ত। আরবিতে ফায়ীলের অনুরূপ শব্দ, অর্থাৎ যেগুলো ফায়ীলের সাথে ছন্দে মেলে, সেগুলোর দ্বারা কোনো কাজের প্রগাঢ়, তীব্র রূপকে বোঝায় যার প্রভাব অন্যদের ওপর পড়ে। সুতরাং আল্লাহ ﷻ হলেন আর-রাহীম—এই মহাবিশ্ব ও সকল সৃষ্টির প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়াশীল।

শর্তসাপেক্ষে এই নামটি অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। যেমন : মানুষ তার সন্তান, ভাই ও পরিবারের প্রতি দয়াশীল হতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে, আল্লাহ ﷻ-এর দয়ার সাথে সৃষ্টির দয়ার তুলনা অসম্ভব। এমনকি শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি এসেছে ও আসবে, তাদের সবার দয়া একত্র করলেও মহান আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও করুণার সাথে তুলনা সম্ভব না। আল্লাহ ﷻ আর-রাহীমের দয়ার তুলনায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের দয়া পাখির পালক কিংবা একটি পরমাণুর সমান ওজনও রাখে না। বরং আর-রাহীমের তুলনায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের দয়া এর চেয়েও তুচ্ছ। আপনার মধ্যে দয়া থাকতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির দয়া কোনোভাবেই আল্লাহ ﷻ-এর দয়ার সাথে তুলনা করার যোগ্যও না। কাজেই রাহীম নামটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে, তবে শর্তসাপেক্ষে।

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

তিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পশুদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন পশুদের জোড়া; এভাবে তিনি ওতে তোমাদের বংশবিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আশ-শুরা, ১১)

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্তে আছে এবং তিনিই

www.banglakitab.weebly.com

সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আল-আনআম, ১০৩)

আর-রাহমান ও আর-রাহীম

আর-রাহমান হলেন মহান ও পরম করুণার অধিকারী। আর-রাহীম হলেন তিনি, যাঁর করুণা ও দয়া বর্ষিত হচ্ছে তাঁর সকল বান্দা ও সৃষ্টির ওপর। । যখন একসাথে ব্যবহৃত হয় তখন 'আর-রাহমান, আর-রাহীম' শব্দগুচ্ছ দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর মহান, অপরিসীম ও পরম দয়াকে বোঝানো হয়।

আর-রাহমান ও আর-রাহীমের মাঝে একটি পার্থক্য আছে। যেটি আমাদের একটু আগের আলোচনায় এসেছে। পার্থক্যটি হলো, শুধু আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে আর-রাহমান নামটি ব্যবহার করা যাবে না। এটি আল্লাহ ﷻ-এর একটি স্বতন্ত্র নাম। তবে আল্লাহ ﷻ-এর বান্দাদের মধ্যে কারও কারও ক্ষেত্রে আর-রাহীম নামটি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর-রাহমান নামটি শুধু আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্দিষ্ট। যেসব নাম শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্দিষ্ট, সেই স্বতন্ত্র নামগুলো আর কারও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। পরিপূর্ণ, সামগ্রিক ও পরম দয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ﷻ। আর কারও পক্ষে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব না। যেহেতু আর-রাহমান নামের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মধ্যে অনুপস্থিত, তাই আমরা এই নাম ব্যবহার করতে পারি না। আমরা যেমন 'আল্লাহ' নাম ধারণ করতে পারি না, কারণ এ মহিমান্বিত নামের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মাঝে অনুপস্থিত, ঠিক একই কথা আর-রাহমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটি আল্লাহ ﷻ-এর স্বতন্ত্র ও বিশেষ নামগুলোর একটি, যেগুলো শুধু তাঁরই জন্য নির্ধারিত।

একইভাবে আপনি চাইলেই আল-খালিক (সৃষ্টিকর্তা), আর-রাযযাক (পালনকর্তা), আল-আহাদ, আস-সামাদ, আল-বারি, আল-কাইয়্যুম–এ নামগুলো রাখতে পারবেন না। আল-খালিক হলেন সেই সত্তা যিনি কোনো ধরনের সাদৃশ্য (কোনো তুলনা, তুলনাযোগ্য ও এর সদৃশ বস্তু) ছাড়া সৃষ্টি করেন। আপনি কি তেমন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন? পারবেন না। সুতরাং আপনাকে আল-খালিক নামে সম্বোধন করা যাবে না, কারণ আপনার মাঝে আল-খালিকের গুণাবলি নেই। আল-বারি হলেন নির্মাতা, যিনি একেবারে নির্ভুল ও নিখুঁত জিনিস তৈরি করেন। আপনি কি সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত ও নির্ভুল কিছু নির্মাণ করতে পারবেন? অবশ্যই আপনি সেটা পারবেন না, তাই আপনাকে আল-বারি সম্বোধন করা যাবে না।

আবার কিছু নাম আছে যেগুলো শর্তসাপেক্ষে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। যেমন : গনি, মালিক, আযিয, জাব্বার ইত্যাদি।

আল-কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইউসুফ ﷺ-এর বিপক্ষে অভিযোগ আরোপকারী নারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

www.banglakitab.weebly.com

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযিযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্তা হয়ে গেছে। (সূরা ইউসুফ, ৩০)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ ওই নারীকে আযিযের স্ত্রী বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং বোঝা গেল, যদিও 'আযিয' আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নামসমূহের একটি, তবুও সৃষ্টির ক্ষেত্রে আযিয নামটি ব্যবহার করা যাবে। একইভাবে আল্লাহ ﷻ-এর নামসমূহের একটি নাম হলো হাকিম। এ নামটিও সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবি ছিলেন, যার নাম ছিল আল-হাকিম। হাকিম ইবনু হিজাম رضي الله عنه।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। (সূরা গাফির, ৩৫)

এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে জাব্বার নামটি ব্যবহার করেছেন। জাব্বার আল্লাহ ﷻ-এর নাম, আবার আল্লাহ ﷻ সৃষ্টির বেলায়ও এ নাম ব্যবহার করেছেন। কুরআনে এই নামটি মোট ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৯ বার জাব্বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শক্তিশালী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী মানুষ কিংবা কোনো ধরনের যুলুমকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সর্বশেষ বার আল-জাব্বার ব্যবহৃত হয়েছে সূরা হাশরে এবং এ দ্বারা আল্লাহ ﷻ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এসব নাম দ্বারা কোনো না কোনোভাবে খারাপ বা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ পায়। যখন ইতিবাচকভাবে উল্লেখ করা হয় তখনো কিছুটা হলেও নেতিবাচকতা প্রকাশ পায়। কারণ, আমরা মানুষ, আমরা ত্রুটি মুক্ত নই। আমরা অসম্পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তো অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। যা মানুষের ক্ষেত্রে নেতিবাচকতা প্রকাশ করে, তা-ই আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষেত্রে স্পষ্ট, নিশ্চিত ও পরিপূর্ণ উদাহরণ। যখন আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষেত্রে কোনো নাম প্রয়োগ করা হয় তখন সে নামের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ পায়। লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলছেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আন-নিসা, ৫৮)

সূরা আল-ইনসানে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলছেন :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

www.banglakitab.weebly.com

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, যাতে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। অতঃপর আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি। (সূরা আল-ইনসান, ২)

এবং আল্লাহ ﷻ কুরআনে অসংখ্যবার তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আশ-শুরা, ১১)

অর্থাৎ শোনা ও দেখা বিষয়টি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে আবার স্রষ্টার ক্ষেত্রেও হয়েছে, তবে কোনোভাবেই এ দুটো তুলনীয় না।

তাই রাহীম নামটি মানুষের ক্ষেত্রে রাখা যেতে পারে। আপনি সন্তানের জন্য এই নাম রাখতে পারেন।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আল-আহযাব, ৪৩)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাহীম সম্বোধন করেছেন।

যদিও আল্লাহ ﷻ-এর নামগুলোর মধ্য থেকে কিছু নাম মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সব সময় মনে রাখবেন, কোনোভাবেই আল্লাহ ﷻ-এর গুণাবলির সাথে সৃষ্টির গুণাবলির তুলনা করার কোনো অবকাশ নেই। অভিশপ্ত মিথ্যাবাদী মুসাইলামাহ নিজেকে রাহমান দাবি করেছিল। যে নাম শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারিত তা সে নিজের সাথে যুক্ত করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল। এ স্পর্ধার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ ﷻ তার মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন এবং তাকে কিয়ামত পর্যন্ত মিথ্যাবাদী হিসেবে সুপরিচিত করলেন। সে নিজেকে রাহমান দাবি করেছিল, নিজের নাম রেখেছিল রাহমান আল-ইয়ামামাহ। আল্লাহ ﷻ তার পরিচিতি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন 'মুসাইলামাহ আল-কাযযাব' অর্থাৎ মিথ্যাবাদী মুসাইলামাহ নামে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তাকে সবাই এভাবেই চিনবে। আজ যদি আপনি কাউকে প্রশ্ন করেন 'রাহমান আল-ইয়ামামাহকে চেনো?' কেউ কি চিনতে পারবে? কেউ এ নামে তাকে চিনতে পারবে না। মানুষের স্মৃতি এবং ইতিহাসের পাতায় সে মুসাইলামাহ আল-কাযযাব বা মিথ্যাবাদী মুসাইলামাহ নামেই পরিচিত। শহর, বন্দর, গ্রাম, মরুভূমির বেদুইন ও ইতিহাসের পাতা—সব মানুষের জন্য মুসাইলামাহ পরিণত হয়েছে চূড়ান্ত মিথ্যাচারের এক দৃষ্টান্তে। এই হলো আল্লাহ ﷻ-এর স্বতন্ত্র নাম ব্যবহারের চেষ্টার শাস্তি।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, আর-রাহমান এবং আর-রাহীমের প্রথম পার্থক্য হলো—আপনি চাইলে রাহীম নাম রাখতে পারেন কিন্তু আর-রাহমান নাম রাখতে পারবেন না। আর-

www.banglakitab.weebly.com

রাহমান কেবল আল্লাহ ﷻ-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত এবং অন্য কারও বেলায় এই নাম ব্যবহার করা যাবে না। আর যে নামটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, অর্থাৎ আর-রাহীম, সেটার ক্ষেত্রেও স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার বিভিন্ন গুণাবলির ভিন্নতা থেকেই যাবে।

ইবনু জারির আত-তাবারি ﵀, আল-ফারিসি এবং অন্যান্যদের মতে, আর-রাহমান নামটি মানুষ, জিন, পশু-পাখি, ভালো-মন্দ, মুমিন ও কাফির—সমগ্র সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও করুণা বোঝায়। অন্যদিকে, আর-রাহীম শুধু মুমিনদের প্রতি তাঁর দয়াশীলতা বোঝায়। আল্লাহ ﷻ-এর দয়ার ক্ষেত্রে 'আর-রাহমান' আরও ব্যাপকতর অর্থ প্রকাশ করে। আল-ফারিসি, ইবনু জারির ও অন্যান্যরা তাঁদের এ মতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে নিচের দলিল পেশ করেছেন :

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আল-আহযাব, ৪৩)

সুতরাং আলিমদের একটি মত অনুযায়ী 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম' এ পবিত্র নাম দুটির একটির দ্বারা ব্যাপকার্থে, সর্বজনীনভাবে দয়া বোঝায় এবং অপরটির মাধ্যমে শুধু মুমিনদের জন্য দয়া বোঝানো হয়। তবে কিছু আলিম এ মতের বিরোধিতাও করেছেন। এখানে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা এটা জেনে রাখি যে, এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, আর-রাহমান ও আর রাহীম দুটোই কোমল, স্নেহময়তায় পরিপূর্ণ এবং রাকিক। তবে এদের একটি অপরটি থেকে অধিকতর কোমল :

اِسْمانِ رقِيقانِ أحدُهُما أرقُّ مِن الآخرِ

অর্থাৎ একটির অর্থের গভীরতা ও আধিক্য অপরটির চেয়ে ব্যাপক। একটি অপরটির চাইতে অধিক করুণা ও দয়াশীলতা প্রকাশ করে। ইবনুল মুবারাক ﵀ বলেছেন, আর-রাহমানের কাছে চাইলে তিনি দান করেন। আর-রাহীমের কাছে না চাইলে তিনি ক্রোধান্বিত হন।

আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আশ-সূরা, ১১)

www.banglakitab.weebly.com

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্তে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আল-আনআম, ১০৩)

আর-রাহমান এবং আর-রাহীম দ্বারা মহান আল্লাহ ﷻ-এর দয়া নির্দেশ করা হয়। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী আল্লাহর রাসূল ﷺ যা সত্যায়ন করেছেন—যা বলেছেন, যতটুকু বলেছেন, যেভাবে বলেছেন—আমরা ঠিক ততটুকুই স্বীকার করি, সত্য বলে সাক্ষ্য দিই (affirm)। আমরা এই সাক্ষ্য দিই কোনো ধরনের 'তাশবিহ', তামসিল, তা'তিল এবং তাহরিফ ছাড়াই। আমরা মহান আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নাম ও বৈশিষ্ট্যেরসমূহের ব্যাপারে তাশবিহ করি না। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ ﷻ-এর বৈশিষ্ট্যকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করি না, সমতুল্য মনে করি না। আমরা তামসিল করি না, অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর বৈশিষ্ট্যকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করি না। আমরা তাহরিফ করি না, অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর নাম ও সিফাতগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন ও বিকৃতি করা ছাড়াই আমরা সেগুলো স্বীকার করে নিই। এবং আমরা তা'তিল করি না, অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর কোনো বৈশিষ্ট্যকে বা এগুলোর কোনো একটি দিককেও আমরা অস্বীকার করি না। ইন শা আল্লাহ যখন আমরা আকিদাহ নিয়ে আলোচনায় যাব, তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা আবার এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।

আল্লাহ ﷻ এক, অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। এ আয়াত শুনলে আমরা সবাই মোটামুটি এটুকু বুঝি। তবে এই আয়াত আরও বোঝায় যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর নাম, বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলিতেও এক ও অদ্বিতীয়। এ আয়াত দ্বারা বোঝায়, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, তিনি আহাদুন ফিস-সিফাত। কর্মের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। একইভাবে তাঁর কোনো অংশীদারও নেই।

যখন বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বা কোনো আয়াত পড়া হয়, যখন আল্লাহ ﷻ-এর প্রশংসা করা হয় অথবা আল্লাহ ﷻ-এর মহত্ত্ব ঘোষণা করা হয়—তখন যদি আপনি সে কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারেন, তাহলে সেটা আপনার ঈমানকে তাজা করবে। মুখস্থ বুলির মতো আওড়ে না গিয়ে, জেনে-বুঝে, উপলব্ধির সাথে এ কথাগুলো বললে দিনের মধ্যে অনেকবার আপনি আপনার ঈমানকে তাজা করতে পারবেন। এ জন্যই আমরা এ বিষয়গুলো ও এগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

www.banglakitab.weebly.com

'আর-রাহমান, আর-রাহীম' এ শব্দগুলো আল্লাহ ﷻ-এর বিশাল, ব্যাপক ও পরম ক্ষমাশীলতার কথা প্রকাশ ধরে। তাই আসুন আল্লাহ ﷻ-এর দয়া নিয়ে কিছু হাদিস এবং কুরআনের আয়াত দেখা যাক।

আল্লাহ বলেন :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বলো, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রাহমাহ থেকে নিরাশ হোয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা আয-যুমার, ৫৩)

এই আয়াতের ব্যাপারে আলী ইবনু আবি তালিব ﵁ বলেছেন, 'এ হলো পুরো কুরআনের সবচেয়ে ব্যাপক আয়াত।' ইবনু মাসউদ ﵁ বলেছেন, 'এ হলো কুরআনের সবচেয়ে স্বস্তিদানকারী আয়াত।' আশ-শাওকানি বলেছেন, 'এটি সর্বাধিক আশা দানকারী আয়াত।'

কেন?

কারণ, এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ-এর করুণার কথা বলা হচ্ছে। তিনি আমাদের আশা দিচ্ছেন। কিন্তু কাদের উদ্দেশ্য করে তিনি এ কথাগুলো বলছেন? আল্লাহ কি ফিরিশতাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, যারা আল্লাহ ﷻ-এর অনুগত এবং কখনো ভুল করতে পারেন না? না, তিনি কথাগুলো বলছেন পাপীদের উদ্দেশ্য করে। তবে সাধারণ পাপীদের না, তিনি বলছেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের পাপীদের উদ্দেশ্য করে।

সহিহ মুসলিম এবং *সহিহ বুখারি*তে আবু হুরায়রাহ ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ ﷻ যখন সৃষ্টিসমূহ তৈরি করেন তখন তিনি তাঁর আরশের ওপর লিখে দেন,

رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي

'আমার রাহমাহ আমার গযবের ওপর বিজয়ী।'[২৩]

সহিহ বুখারিতে উমার ﵁ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন একজন মহিলা তার সন্তানকে খুঁজে পাচ্ছে না। ব্যাকুল হয়ে সে তাকে খুঁজছে। কিছুক্ষণ পর ছেলেকে খুঁজে পাবার পর সে শক্তভাবে তাকে আঁকড়ে ধরল, তাকে পরম মমতায় খাওয়াতে শুরু করল। সাহাবি ﵃-গণও এই আবেগপূর্ণ দৃশ্যটি দেখছিলেন। দরদি এ মায়ের ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবি ﵃-দের মনে নাড়া দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের আল্লাহ ﷻ-এর করুণা সম্পর্কে ধারণা দিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমরা

২৩ *সহিহুল বুখারি* : ৭৪২২

www.banglakitab.weebly.com

কি মনে করো এমন মা তার সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারে? তোমাদের কি মনে হয়, এমন মা তার ছেলেকে আগুনে ফেলে দিতে পারে? তাঁরা বললেন, না। এমনকি তারা আল্লাহ ﷻ-এর নামে শপথ করে বললেন, ওয়াল্লাহি, আল্লাহর কসম! এই মা বেঁচে থাকা অবস্থায় এটা কখনোই সম্ভব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন,

اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا

> এই মা তার ছেলের প্রতি যতটা না দয়াশীল আল্লাহ তার বান্দার প্রতি তার চেয়ে বেশি দয়াশীল।[২৪]

সালাফদের অনেকে দুআ করতেন, হে আল্লাহ, এই পৃথিবীতে আমার মা হলো আমার প্রতি সবচেয়ে দয়াশীল। আমি জানি আপনি আমার মায়ের চেয়েও বেশি দয়াশীল। আমার মা কখনো আমার ওপর কোনো শাস্তি বা ক্ষতি আসতে দেবেন না। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সব শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

আবু হুরায়রাহ ﷺ থেকে বর্ণিত *সহিহ মুসলিমের*[২৫] একটি হাদিসে এসেছে, রাহমাতের এক শ অংশ। আল্লাহ তার রাহমাতের মাত্র একটি অংশ পৃথিবীতে দিয়েছেন। এই এক অংশই তিনি ভাগ করে দিয়েছেন জিন, মানুষ, জীব-জন্তু, কীটপতঙ্গ—সকল সৃষ্টির মধ্যে। এই এক অংশের কারণেই তারা একে অপরকে ভালোবাসে। এই এক ভাগ দয়ার কারণে তারা অন্যের প্রতি দয়াশীল হয়। হিংস্র পশুও তার সন্তানকে ভালোবাসে এই এক ভাগের কারণেই। আর বাকি নিরানব্বই ভাগ রাহমাহ-ই আল্লাহ তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন।

আর-রাহমান, আর-রাহীম এর অর্থ কি এখন বুঝতে পারছেন? উপলব্ধি করতে পারছেন এই দয়া, এই ক্ষমাশীলতার ব্যাপকতা? 'আর-রাহমান, আর-রাহীম' উচ্চারিত হতে শোনার সময় আমাদের হৃদয়ে কি এই উপলব্ধি কাজ করে?

আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ অর্জন

আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ইস্তিগফার করা। সূরা আন-নামলের এই আয়াতটি দেখুন। সালিহ ﷺ তার সম্প্রদায়কে বলছেন :

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

> 'তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবত তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।' (সূরা আন-নামল, ৪৬)

আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ পাবার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চান। নিয়মিত ইস্তিগফারের মাধ্যমে

---

২৪ *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৯৯; *সহিহ মুসলিম* : ৭১৫৪
২৫ *সহিহ মুসলিম* : ৭১৫০

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া যায়।

আল্লাহ ﷻ তাঁর নেককার বান্দাদের রাহমাহ দান করেন :

إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহর রাহমাহ সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।' (সূরা আল-আরাফ, ৫৬)

মুসা ﷺ দুই বোনকে পানি তুলে দিয়ে সাহায্য করার পর বলেছিলেন :

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী। (সূরা আল-ক্বাসাস, ২৪)

মুসা ﷺ ওই দুই বোনের প্রতি দয়া করেছিলেন, তাদের সাহায্য করেছিলেন আর তারপর সেটা তাঁর কাছে ফেরত এসেছিল।

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন তাঁর কাছে সলজ্জ পদে আসল। সে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন, আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে। অতঃপর যখন মুসা তার নিকট এল এবং সকল ঘটনা তার কাছে খুলে বলল, তখন সে বলল, 'তুমি ভয় কোরো না। তুমি যালিম কওম থেকে রেহাই পেয়ে গেছ।' (সূরা আল-ক্বাসাস, ২৫)

অর্থাৎ যখন আপনি কারও প্রতি দয়া করবেন, সেটা আপনার কাছে ফেরত আসবে। এটা হলো আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ অর্জনের দ্বিতীয় উপায়।

সুনানুত তিরমিযিতে বর্ণিত হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা দুনিয়ার মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হও, তাহলে যিনি আসমানের ওপরে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন। তাই ক্ষমাশীল হোন আপনার স্ত্রী, সন্তান, ছাত্র, আপনার অধীনস্থ—যাদের ওপর আপনি দায়িত্বশীল এমনকি অন্যান্য প্রাণীদের প্রতিও। তাদের প্রতি দয়াশীল হোন, তাদের সাহায্য করুন, যেমনটা মুসা ﷺ করেছিলেন। তাহলে আপনিও সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। এটা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদিসের বক্তব্য।

আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

www.banglakitab.weebly.com

'নিশ্চয় আল্লাহর রাহমাহ সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।' (সূরা আল-আরাফ, ৫৬)

আনাস ﵁ দশ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই তাঁর প্রতি কঠোর হননি, একটি বারও তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করেননি। আপনার কি মনে হয় এই লম্বা সময়জুড়ে আনাস ﵁ কোনোদিন একটি ভুলও করেননি? অন্যের সাথে আচরণের সময় বিষয়টা মাথায় রাখবেন। নিজের স্বার্থেই, আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ পাওয়ার জন্য।

www.banglakitab.weebly.com

দারস ৩

বাসমালাহর পর উসূল আস-সালাসার প্রথম বাক্য হলো,

اِعْلَمْ رحمك الله

অবগত হোন, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রহম করুন।

ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ :

ইলমের গুরুত্ব

ইলম শব্দটি বিভিন্নভাবে কুরআনে মোট ৭৭৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা বাকারাহতে বর্ণিত আদম ﷺ-এর ঘটনার দিকে তাকালে, আদম ﷺ-এর সৃষ্টির বর্ণনায় একটা বিষয় লক্ষ করবেন :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন, 'নিশ্চয় আমি জমিনে একজন

www.banglakitab.weebly.com

> খলীফা সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জানো না। এবং তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফিরিশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' তিনি নির্দেশ করলেন, 'হে আদম, এ জিনিসগুলোর নাম তাদের জানিয়ে দাও।' যখন সে এ সকল নাম তাদের বলে দিলো, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ করো ও গোপন করো, আমি তাও অবগত'? (সূরা বাকারাহ, ৩০-৩৩)

এই চারটি আয়াতে আদম ﷺ-এর সৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনায় জ্ঞান তথা ইলম শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে মোট ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো আ'লাম, কখনো তা'লামুন, কখনো আল্লামা, কিংবা আল্লামতানা—এভাবে আদম ﷺ-এর সৃষ্টি নিয়ে আলোচনায় ৮ বার বিভিন্নভাবে 'ইলম' শব্দটি এসেছে। আর সমগ্র কুরআন জুড়ে এটা এসেছে মোট ৭৭৯ বার। তবে এ আয়াতগুলো ইলমের পাশাপাশি আরও সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। এ আয়াতগুলো থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, আদম ﷺ-কে এমন কিছু গুণাবলি ও বিশেষত্ব প্রদান করা হয়েছিল যার কারণে ফিরিশতারা আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশে তাঁর জন্য সিজদাহ করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ-এর প্রশংসা করা, তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ফিরিশতাগণ আদম ﷺ-এর চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও, ইলম এবং ইলমের প্রায়োগিক দিক থেকে আদম ﷺ-কে ফিরিশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ-কে দুনিয়াতে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

> আর (স্মরণ করো), যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন : 'আমি অবশ্যই পৃথিবীতে (আমার) একজন খলিফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি'। (সূরা বাকারাহ, ৩০)

ইলম হলো একটি মৌলিক বিষয়। যে উম্মাহ অন্য সব জাতিকে নেতৃত্ব দিতে চায় তাদের অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে। তাদের মাঝে ইলম থাকতে হবে। ইলমের অভাবের কারণেই কোনো জাতির মাঝে শিরক প্রবেশ করে। কোনো ব্যক্তির ভেতর শিরক ঢুকে গেলে সে যেমন ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি শিরক একটি জাতিকেও ক্ষয় করে ফেলে। ধ্বংস করে ফেলে। যা কিছুর ভেতর শিরক প্রবেশ করবে, শিরক সেটাকে ধ্বংস করে ফেলবে।

শুধু তাওহিদের জন্য না, ইলম সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন। তবে তাওহিদের জ্ঞান হলো জ্ঞানের মূল ভিত্তি, মূল নির্যাস। তবে অন্যান্য সবকিছুর জন্যও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সঠিক আদব-আখলাকের জন্য জ্ঞানের দরকার। এ জ্ঞান না থাকলে সেটা দাগ ফেলে মানুষের

www.banglakitab.weebly.com

আচরণ ও ব্যক্তিত্বের ওপর। নীতি-নৈতিকতা এবং এর সঠিক মাপকাঠি নির্ধারণের জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। ইলম না থাকায় মানুষ আজ ওইসব লোককে হিরো মনে করছে, আদর্শ মনে করছে, যারা বাস্তবে কাপুরুষ।

জ্ঞান না থাকার কারণে আজ ফ্রি-মিক্সিংকে—নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা—বলা হচ্ছে মুক্তি ও স্বাধীনতা। জ্ঞান না থাকার কারণে ইসলাম, আল্লাহ ﷻ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আক্রমণ ও অবমাননাকে বলা হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা ও বাক্‌স্বাধীনতা। ইলম এতটাই দরকারি যে, আপনি ইলম যত কমতে দেখবেন—বুঝবেন যে আমরা কিয়ামতের তত কাছাকাছি যাচ্ছি। কারণ, এটি কিয়ামতের একটি লক্ষণ।[২৬]

যারা বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন আনতে চান, তাদের অবশ্যই ইলম প্রয়োজন। আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দুআ করি যেন তিনি আপনাদের মধ্যে থেকে দ্বীনের মুজাদ্দিদ[২৭] তৈরি করেন। এমন মুজাদ্দিদ, যিনি উম্মাহর মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চারণ ঘটাবেন, উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। আর এ পুনর্জাগরণের মূল চাবিকাঠি হলো ইলম। নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ, যারা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, তাদের দিকে লক্ষ করলেও আমরা এই ব্যাপারটি দেখতে পাব। আমরা ইতিমধ্যে আদম ﷺ-এর কথা উল্লেখ করেছি। সূরা বাকারাহর ৩০ থেকে ৩৩ এই চার আয়াতে আদম ﷺ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ৮ বার ইলমের কথা এসেছে। এবার দেখুন লূত ﷺ-এর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে :

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

আর (স্মরণ করো), লূতকে আমরা (নুবুওয়্যাত ও সঠিক ন্যায়বিচারের) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। (সূরা আল-আম্বিয়া, ৭৪)

আল্লাহ ﷻ এখানে লূত ﷺ সম্পর্কে বলছেন যে, আমরা তাঁকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। মুসা ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

---

২৬ এ ব্যাপারে অনেক হাদিস এসেছে। সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলমে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

'কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে, ইলম কমে যাওয়া, মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া, নারীদের সংখ্যাধিক্য, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া—এমনকি পরিস্থিতি এমন হবে যে, ৫০ জন মহিলার কর্তা হবে মাত্র একজন পুরুষ।'

২৭ মুজাদ্দিদ আরবি শব্দ, বাংলায় পুনঃনবায়নকারি বা সংস্কারক। প্রতি হিজরি শতাব্দীতে মুসলিম সমাজ সংস্কার, মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত অনৈসলামিক রীতির মূলোৎপাটন এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হন একেকজন মুজাদ্দিদ।

www.banglakitab.weebly.com

যখন সে (শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে) পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে (নুবুওয়্যাত ও সঠিক ন্যায়বিচারের জ্ঞান) হিকমাহ ও (তার পূর্বসূরিদের দ্বীন—একত্ববাদের) ধর্মীয় জ্ঞান দান করলাম। (সূরা আল-কাসাস, ১৪)

ইউসুফ ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমরা তাকে হিকমত ও (নুবুওয়্যাতের) জ্ঞান দান করলাম। (সূরা ইউসুফ, ২২)

ইয়াকুব ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ

আর নিঃসন্দেহে, সে ছিল জ্ঞানী। কারণ, আমরা তাকে শিক্ষাদান করেছিলাম। (সূরা ইউসুফ, ৬৮)

দাউদ এবং সুলাইমান আলাইহিমুস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

এবং আমরা সুলাইমানকে (মীমাংসা) বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের উভয়কে হুকমান ও জ্ঞান দান করেছিলাম। (সূরা আল-আম্বিয়া, ৭৯)

ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ

আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাহ (সঠিক বুঝ), তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। (সূরা আল- মায়িদা, ১১০)

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ (শারীয়াহ, হালাল-হারামবিষয়ক জ্ঞান) অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আন-নিসা, ১১৩)

www.banglakitab.weebly.com

ইলম ছাড়া কোনো নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয়েছিল সেটাও ছিল ইলম-সম্পর্কিত :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আল-আলাক্ব, ১-৪)

ইকরা, আল্লামা, কালাম এই সবগুলো শব্দ জ্ঞান বা ইলমের সাথে সম্পর্কিত। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইলম শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ৭৭৯ বার এসেছে। 'আল্লাহ' শব্দের পর এটি কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ।

আল্লাহ ﷻ তালূতকে বনী ইসরাইলের জন্য নেতা মনোনীত করেছিলেন। তালুতের কোন গুণাবলির কারণে আল্লাহ ﷻ তাকে মনোনীত করেছিলেন সেটা লক্ষ করুন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.....

আর তাদের নবি তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সে কীরূপে আমাদের ওপর রাজা হতে পারে। অথচ রাজা হওয়ার জন্য আমরা তার চেয়ে বেশি হকদার। তা ছাড়া তাকে আর্থিক সচ্ছলতাও দেওয়া হয়নি! নবি বললেন, আল্লাহ তাকে তোমাদের ওপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও দৈহিকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২৪৭)

আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে বলছেন, ওদের বলো, তালূত তোমাদের রাজা। তালূত ছিলেন বনী ইসরাইলের এমন এক গোত্রের সদস্য যাদের মধ্যে থেকে এর আগে বনী ইসরাইলের কোনো রাজা আসেনি। আগের রাজারা এসেছিল অন্যান্য গোত্রগুলো থেকে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ ভিন্ন কিছু চাইলেন। বনী ইসরাইল তালূতকে মেনে নিতে পারল না। তারা আপত্তি করল তারা বলল, তালূত রাজা হবার যোগ্য না। কারণ, প্রথমত তার বাপ-দাদারা রাজা ছিল না। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা ছিল না। সে রাজাদের বংশধর না। আর আমরা হয়তো এ পয়েন্টে কিছুটা ছাড় দিতাম কিন্তু দ্বিতীয় পয়েন্ট আরও গুরুতর, আর সেটা হলো–তালূতের কোনো সম্পদ নেই।

www.banglakitab.weebly.com

তারা তাদের রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে তর্ক জুড়ে দিলো: এমন লোককে কিছুতেই তারা রাজা হিসেবে মেনে নেবে না। আমরা তালূতকে মানি না। সে দরিদ্র এবং নীচু গোত্রের লোক। যখন এ তর্ক চলছে, আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলের প্রতি ওয়াহি নাযিল করলেন,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ তাঁকে তোমাদের ওপর মনোনীত করেছেন। ব্যস। এখানেই সব তর্ক, সব বাগ্‌বিতণ্ডা শেষ। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু কেন আল্লাহ ﷻ তালূতকে বাছাই করলেন? চলুন, দেখা যাক, কুরআনে তাঁর কী কী গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে :

وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

অর্থাৎ, জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে আল্লাহ ﷻ তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। শক্তি এবং জ্ঞান, এই দুটি হলো সফল ও শক্তিশালী জাতির বৈশিষ্ট্য। এমনকি জিনদের মধ্যেও ইলম প্রশংসিত এবং ইলমের স্তরের ভিত্তিতে জিনদের সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়। সুলাইমান ﷺ যখন রানি বিলকিসের সিংহাসন চাইলেন :

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

এক শক্তিশালী জিন (ইফরিত) বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেবো। আর এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত। (সূরা আন-নামল, ৩৯)

ইফরিত বলেছিল, আপনি এই স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেবো। অপর জিন, যার কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলেছিল চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা এনে দেবো। সুলাইমান ﷺ এই জিনকেই কাজের দায়িত্ব দিলেন।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেবো! (সূরা আন-নামল, ৪০)

বিলকিসের পুরো ব্যাপারটা সমাপ্ত হবার পর সুলাইমান ﷺ বলেছিলেন :

وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

আমাদেরকে ইতোপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। (সূরা আন-নামল, ৪২)

www.banglakitab.weebly.com

ইলমের সংজ্ঞা

এবার তাকানো যাক ইলম শব্দটির দিকে। ইলমের সংজ্ঞা কী?

জ্ঞান বা ইলম হলো কোনো কিছুর প্রকৃত বাস্তবতাকে নিশ্চয়তার সাথে অনুধাবন করা। ই'লাম–অবগত হোন, বলার মাধ্যমে উসুল আস-সালাসার লেখক শিক্ষণীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করছেন এবং এর জন্য আপনাকে প্রস্তুত করছেন। কোনো জরুরি বিষয়ে জানানোর জন্য ই'লাম (اعلم-জেনে রাখুন, অবগত হোন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর এখানে লেখক কথা বলছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে জরুরি বিষয়–তাওহিদের জ্ঞান নিয়ে। তিনি ইসলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছেন, আর যেহেতু এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই এখানে ই'লাম শব্দের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

মানুষ ছাড়া অন্য কিছুকে কি শেখানো সম্ভব?

ই'লাম শব্দটি কি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? নাকি মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহার করা যাবে? আসলে এটি মূলত একটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন। ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের মতো বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিরাই কেবল এ আলোচনা উপভোগ করবে। তারপরও আমি এ ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই, কারণ এ ব্যাপারে কিছু সহিহ হাদিস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।

ভাষাবিদগণ বলেন, সাধারণত ই'লাম শব্দটি এমন কিছুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যা অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখে। এ কারণে একটি দেয়ালকে লক্ষ্য করে ই'লাম বলা যায় না। তবে কিছু আলিম বিষয়টির আরও গভীরে গিয়ে বলেছেন যে, হ্যাঁ, কখনো কখনো হয়তো দেয়াল, পাথর কিংবা গাছও অনুধাবন করতে পারে, শিখতে পারে। এমন হলে আপনি তাদেরও জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানাতে পারেন এবং শিক্ষাদান করতে পারেন। অর্থাৎ অনুধাবন করতে সক্ষম এমন লক্ষণবিশিষ্ট যেকোনো বস্তুকে বা জীবকে ই'লাম বলা যায় এবং শিক্ষা দেওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে মুসা ﷺ-এর কাছ থেকে পাথরের দৌড়ে পালানোর হাদিসটি উল্লেখযোগ্য। অনেকে হাদিসটিকে যইফ মনে করেন, কিন্তু আসলে হাদিসটি সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে।

মুসা ﷺ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, লজ্জাশীল ও শালীন। তিনি সব সময় নিজের শরীর ঢেকে রাখতেন। তাকে কেউ কখনো অনাবৃত অবস্থায় দেখেনি। কিন্তু বনী ইসরাইলের অন্যান্য সবাই একসাথে গোসল করত! এদের মধ্যে কিছু লোক বলতে শুরু করল, নিশ্চয় মুসার কোনো শারীরিক ত্রুটি বা অসুখ আছে, তাই সে নিজেকে ঢেকে রাখে। হয়তো তাঁর কুষ্ঠ আছে, অথবা হার্নিয়া–আরবিতে একে বলা হয় উদ্বরা (أدر)–আছে, বা অন্য কোনো শারীরিক ত্রুটি

www.banglakitab.weebly.com

আছে, তাই মুসা নিজেকে ঢেকে রাখে।

আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-এর বিরুদ্ধে এ অপবাদের খণ্ডন করতে চাইলেন। একদিন মুসা ﷺ নির্জনে তাঁর কাপড় খুলে পাথরের ওপর রেখে গোসল করতে গেলেন। গোসল শেষে যখন কাপড় নিতে ফেরত আসলেন, যে পাথরের ওপর তাঁর কাপড় রাখা ছিল সেটা ছুটতে শুরু করল। মুসা ﷺ তাঁর লাঠি নিয়ে পাথরের পেছনে পেছনে ছুটতে শুরু করলেন এবং বলতে থাকলেন,

ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ

হে পাথর, আমার জামা; হে পাথর, আমার জামা।

অর্থাৎ তিনি বলছিলেন, আমার পোশাক ফিরিয়ে দাও। আমার পোশাক ফিরিয়ে দাও।

পাথরকে তাড়া করতে গিয়ে এক সময় মুসা ﷺ বনী ইসরাইলের একদল লোকের সামনে চলে আসলেন। তারা মুসা ﷺ-কে অনাবৃত অবস্থায় দেখতে পেল এবং দেখল তাঁর কোনো শারীরিক ত্রুটি নেই। কোনো ব্যাধি নেই। তারা যে ভুল ছিল এবং মুসা ﷺ-এর ব্যাপারে তাদের কথা যে মিথ্যে অপবাদ ছিল, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। মিথ্যা অপবাদ থেকে মুসা ﷺ অব্যাহতি পেলেন। এবার পাথরটি থামল। মুসা ﷺ তার কাপড় নিলেন। তারপর লাঠি দিয়ে পাথরটিকে মারতে শুরু করলেন।[২৮]

এই বিষয়টিই আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক। তিনি পাথরটিকে মারছিলেন, পাথরের সাথে কথা বলছিলেন। কেন?

তিনি এটা করেছিলেন কেননা পাথরটির মাঝে জ্ঞান ও বোধশক্তির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তাই তিনি সেই দৃশ্যমান লক্ষণ অনুযায়ী পাথরের সাথে আচরণ করছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ এ ঘটনাটির বর্ণনা দেন এভাবে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا

> হে মুমিনগণ, মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মতো হোয়ো না; ওরা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। আর আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আল-আহযাব, ৬৯)

ঘটনাটির মূল পয়েন্ট হচ্ছে–মুসা ﷺ পাথরটিকে মেরেছিলেন, মারার মাধ্যমে পাথরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শেখানোর জন্য মারার ব্যাপারটা হয়তো আমাদের কাছে সেকেলে মনে হতে পারে, কিন্তু শিক্ষা দেয়া ও শাসন করার সাথে মারা বা শাস্তির ব্যাপারটা জড়িত। মুসা ﷺ শেখানোর জন্য পাথরকে শুধু মারেনই-নি, বরং পাথরের সাথে কথাও বলেছিলেন।

---

২৮ *সহিহুল বুখারি* : ৩৪০৪; *সহিহ মুসলিম* : ৭৯৬

www.banglakitab.weebly.com

তিনি বলছিলেন,

ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ

হে পাথর, আমার পোশাক দাও।

যখন পাথরটির মাঝে স্বাভাবিক প্রকৃতি-বিরোধী আচরণ প্রকাশ পেল, যখন পাথরটির মধ্যে বোধশক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেল, তখন তিনি সেটাকে তার মতো করে শিক্ষা দিলেন। এ কারণে ভাষাবিদ্যায় পারদর্শী আলিমগণের মতে, ই'লাম (জেনে রাখো) কথাটি মানবজাতি ছাড়া অন্যান্যদের ওপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর তাদের বক্তব্যের দলিল হিসেবে তারা এই হাদিসটিকে ব্যবহার করেন।

বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আরেকটি হাদিসের কথা বলা যেতে পারে। মুসতাদরাক আল-হাকিম, সুনান আদ-দারিমি ও বায়হাকিতে হাদিসটি আছে। ইবনু কাসির এবং আলবানি ﷺ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। এই হাদিসে এক বেদুইনের ঘটনা উঠে এসেছে। একবার এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শাহাদাহ দেয়ার জন্য এল। বেদুইনটি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলাম সম্পর্কে জানান। এই বেদুইন লোকটি তখন ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল? কিন্তু বেদুইন এত সহজে সাক্ষ্য দিতে রাজি ছিল না। সে বলল, আপনি আমাকে সাক্ষ্য দিতে বলছেন, কিন্তু আপনার কথার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? আপনি এমন কাউকে নিয়ে আসুন যে সাক্ষ্য দেবে যে আপনি সত্য বলছেন।

আসলে এই বেদুইন কোনো মুজিযা দেখতে চাচ্ছিলেন, এমন কোনো কিছু দেখতে চাচ্ছিলেন যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ দূরের এক গাছকে লক্ষ্য করে ডাকলেন। গাছটি মাটির ওপর শিকড় হ্যাঁচড়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল,

أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلَّا اللهُ وَأَشْهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَسُولُه

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে গাছের সাথে কথোপকথন করেছেন। যা হোক, সেই বেদুইনের কী হলো? বেদুইন ইসলাম কবুল করে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে আমি তাদের সাথে সেখানে থেকে যাব এবং তাদের ইসলাম সম্পর্কে শেখাব, অন্যথায় আমি আপনার কাছে ফিরে আসব।

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং সাধারণত গাছকে শেখানো যায় না। কিন্তু এই হাদিসে বর্ণিত গাছটির মধ্যে জ্ঞান বা বোধশক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটিকে শাহাদাহ শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং গাছটি তিনবার তা উচ্চারণ করেছিল।[২৯]

মাঝে মাঝে মানুষের চেয়ে পাথরকে শেখানো সহজ হয়। কিছু মানুষের হৃদয় তালাবদ্ধ থাকে। এদের অবস্থা উপুড় করে রাখা গ্লাসের মতো। উপুড় করে রাখা গ্লাসের ওপর যতই পানি ঢালুন না কেন, পানি এর ভেতরে ঢুকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসা ﷺ-এর ঘটনায় আমরা দেখেছি যে, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের তুলনায় গাছ এবং পাথর অধিকমাত্রায় সংবেদনশীল।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মক্কাতে থাকাকালীন প্রথম ওয়াহি নাযিলের আগে থেকেই তিনি মক্কার একটি পাথরকে চিনতেন যেটা প্রতিদিন তাঁকে সালাম দিত। পাথরটি বলত, 'আসসালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর নবি।' পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবি ﷺ-দের সেই পাথরের জায়গাটি দেখাতেন। একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করতে যেতেন তখন গাছেরা তাঁকে আড়াল করে দিত, যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।

তাই ভাষাবিদ আলিমদের মতে, মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু থেকে যদি বোঝার কিংবা অনুধাবন করার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহলে তাদের উদ্দেশ্য করে ই'লাম (জেনে রাখো) বলা যেতে পারে এবং শেখানো যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে, ই'লাম এবং জ্ঞান, এই শব্দগুলো কোনো পাথর কিংবা জড়বস্তুর জন্য না; বরং বোধশক্তিসম্পন্ন এবং অনুধাবন করতে সক্ষম মানবজাতির বেলাতে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু শেখার ক্ষমতা কিংবা বোধশক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হলে, সেটা প্রাণী কিংবা জড় যা-ই হোক না কেন, তাদের শিক্ষাদান করা যেতে পারে এবং তাদের ক্ষেত্রে ই'লাম শব্দেরও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কি ই'লাম বলা যাবে?

আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে, নিজের চেয়ে অধিক ইলমসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে ই'লাম বলা যাবে কি না? আপনি কি কোনো আলিমকে ই'লাম বলতে পারবেন? অবশ্যই পারবেন। মনে করুন একজন আলিম আসরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানেন, কিন্তু কোনো কারণে তিনি হয়তো খেয়াল করেননি যে আসরের সময় হয়ে গেছে। আপনি তাকে জানিয়ে দিতে পারেন যে, আসরের সালাতের সময় হয়েছে। সুতরাং এটা হতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত অল্প ইলমসম্পন্ন ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে কিছু শেখালেন কিংবা তার উদ্দেশে ই'লাম বললেন। প্রায়শই দেখা যায় যে, একটা সহজ বিষয় কোনো জ্ঞানীর চোখ এড়িয়ে গেছে, অথচ তার চেয়ে কম জ্ঞানসম্পন্ন এক ব্যক্তি তা ধরতে পেরেছে।

---

২৯ *মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ*: ২/৫৪০; কাযি ইয়ায ﷺ বর্ণনা করেছেন, আশ শিফা : ১/২৯৯

www.banglakitab.weebly.com

ইলমের স্তর

এবার আমরা আলোচনা করব জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর নিয়ে। ইবনুল কাইয়্যিম ﷬ মিফতাহু দারিস সায়াদাহ গ্রন্থে বলেছেন ইলমের ধাপ ছয়টি। আর এগুলো হচ্ছে জ্ঞানার্জনের সিঁড়ি। ইবনুল কাইয়্যিম ﷬ বলেছেন,

وللعلم ست مراتب اولها حسن السؤال الثانية حسن الانصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهى ثمرته وهى العمل به

ইলম অর্জনের ছয়টি ধাপ আছে :

১. উপযুক্ত প্রশ্ন করা (حسن السؤال)

২. মনযোগ-সহকারে শোনা ও চুপ থাকা (حسن الإنصات والاستماع)

৩. উত্তমভাবে অনুধাবন (حسن الفهم)

৪. মুখস্থ করা (الحفظ)

৫. অপরকে শিক্ষা দেয়া (التعليم)

৬. অর্জিত ইলমের ওপর আমল করা (العمل به)[৩০]

ইলম অর্জনের প্রথম ধাপ হলো, উপযুক্ত প্রশ্ন করা এবং সঠিক উপায়ে জ্ঞান অন্বেষণ করা। কিছু লোক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় কারণ তারা সঠিক প্রশ্ন করা এবং ইলমের অনুসন্ধানের বিষয়টি আয়ত্ত করে না। কেউ কেউ কোনো প্রশ্নই করে না। কিছু লোকের মনে প্রশ্ন এলেও তারা প্রশ্ন করেন না। আবার অনেকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেন যেগুলোর চেয়ে প্রশ্ন করা কিংবা জানতে চাওয়ার মতো আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক বিষয় আছে। দ্বীনের জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো বাদ দিয়ে কিছু মানুষ পড়ে থাকেন কেবল অহেতুক বিষয়গুলোর পেছনে। যাদের ইলম নেই, কীভাবে জ্ঞানার্জন করতে হবে এই ন্যূনতম মৌলিক জ্ঞানটুকু যারা রাখেন না এবং নিজে নিজেই দ্বীন শিখতে যান, তাদের অনেকের মধ্যে এ ধরনের সমস্যাগুলো দেখা যায়। তাই সালাফদের কেউ কেউ বলতেন, 'প্রশ্ন করার ধরন এবং জ্ঞান অন্বেষণের পদ্ধতিই হচ্ছে জ্ঞানের অর্ধেক।'[৩১] অর্থাৎ সঠিকভাবে প্রশ্ন করা এবং ইলম অন্বেষণ করা হলো জ্ঞানের অর্ধেক। তারা যথার্থই বলেছেন। ধরুন কেউ সবেমাত্র দ্বীন সম্পর্কে ইলম অর্জন শুরু করেছে–শুরুতেই যদি সে উত্তরাধিকার আইন (আল-ফারাইদ) বা এ-জাতীয় কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অথচ সে ফিকহুত ত্বহারাহ–পবিত্র হওয়ার–নিয়মটুকু পর্যন্ত জানে না, তবে কি

৩০ *মিফতাহু দারিস সায়াদাহ* : ১/১৬৯

৩১ এ মর্মে উমার ﷠-এর সূত্রে একটি হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। রাসুল ﷺ বলেছেন, وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ অর্থাৎ 'সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা হলো ইলমের অর্ধেক।' (মুসনাদুশ শিহাব : ৩৩, মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ৭২৭, শুয়াবুল ঈমান : ৬৫৬৮)

www.banglakitab.weebly.com

সেটা গ্রহণযোগ্য হবে? আরও বাস্তব উদাহরণও আছে। অনেকে শুরুতেই *আকিদাতুত ত্বহাবি* পড়া শুরু করেন, বোঝার চেষ্টা করেন। অথচ এটা এতটাই কঠিন একটি কিতাব, যা বুঝতে গিয়ে আলিমরাও হিমশিম খান।

জ্ঞান অর্জনের দ্বিতীয় ধাপ হলো, শোনা এবং চুপ থাকা। বলা হয় যে, আলী ইবনু আবি তালিব ﷺ বলেছেন,

إِذَا جَالَسْتَ الْعُلَمَاءَ فَكُنْ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ

'তোমরা যখন কোনো আলিমের কাছে বসবে তখন বলার চেয়ে শোনার জন্য বেশি আগ্রহী হবে। কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে।'[৩২]

জ্ঞান অর্জনের তৃতীয় ধাপ হলো, অনুধাবন। এটা স্পষ্ট বিষয়।

চতুর্থ ধাপ হলো, হিফয অর্থাৎ মুখস্থ করা। দ্বীনি ইলম অর্জনে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আপনাকে মুখস্থ করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ হলো, তালিম। শিক্ষা দেয়া। জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনাকে শেখাতে হবে।

ষষ্ঠ ধাপ হলো, জ্ঞানার্জনের ফলাফল। আর ইলমের ফলাফল হলো অর্জিত ইলমের ওপর আমল করা, অর্জিত ইলমের সীমারেখা মেনে চলা ও এর হক আদায় করা। আলী ﷺ বলতেন, ইলম আমলকে ডাকে, যদি আমলের জবাব আসে তবে ইলম স্থায়ী হয়, না হলে মুছে যায়। ইমাম শাবি ﷺ বলেছেন,

كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ

'ইলমের ওপর আমল করার দ্বারা আমাদের জন্য ইলম মুখস্থ করা সহজ হতো।'[৩৩]

ফুদাইল ইবনু আয়াদ্ব, মুহাম্মাদ ইবনু নাদর, সুফিয়ান ইবনু উইয়াইনাহ, উমার ইবনু আলা ﷺ এবং অন্যান্যদের থেকেও এ ধরনের উক্তি আছে।

আল খাল্লাল ﷺ তাঁর ব্যাকরণ শেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেছেন, আমি ব্যাকরণ শিখতে যাবার পর প্রথম বছর চুপ ছিলাম (انصت)। পরের বছর মনোযোগ দিয়ে ব্যাকরণ নিরীক্ষণ করলাম (نظرت)। তৃতীয় বছর আমি তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলাম (تدبرت)। আর চতুর্থ বছরে গিয়ে আমি আমার শাইখকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম (سألت)। অর্থাৎ প্রশ্ন করতেই তাঁর চার বছর লেগে গিয়েছিল।

আমাদের এমন করার দরকার নেই। কিন্তু এ কথাগুলোর উদ্দেশ্য হলো, সালাফ ও

৩২ ইবনু আবদিল বার ﷺ, জামিউ বায়ানিল ইলম : ২/১৪৮
৩৩ ইবনু আবদিল বার ﷺ, জামিয়ু বায়ানিল ইলম : ২/৩৬৮

www.banglakitab.weebly.com

আলিমগণের এ ঘটনাগুলো থেকে আমরা যেন বুঝতে পারি যে, জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে তারা কতটা ধৈর্যশীল ছিলেন। জ্ঞানার্জন মূলত একটি নিয়মতান্ত্রিক, কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া। কোনো বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো ব্যাপার না।

ইলমের মর্যাদা

ইলম অর্জনের সম্মান সম্পর্কে জানুন, অনুধাবন করুন। ইলম অর্জনের সম্মান সম্পর্কে জানা, আপনাকে উৎসাহিত করবে ইলম অর্জন অব্যাহত রাখতে। আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ইলম অর্জন করা আবশ্যক।[৩৪]

সনদ-সংক্রান্ত কিছু কারণে অনেক মুহাদ্দিস এ হাদিসটিকে যইফ বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ–যেমন : আল মিয্যি, আস-সুয়ুতি এবং আলবানি ﵏–একে সহিহ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ তাদের সকলের ওপর রহম করুন।

ইমাম আহমাদ ﵀ বলতেন, দ্বীন পালনের জন্য যা কিছু অপরিহার্য তা সম্পর্কে জানা ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। যেমন : সালাত ও সিয়াম সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। যেহেতু সালাত ও সিয়াম আপনার ওপর ফরয, তাই সালাত ও সিয়াম সম্পর্কে জানাও আপনার জন্য ফরয। কিন্তু ইলম ও ইলম অর্জনের মর্যাদা আরও ব্যাপক। আর ঠিক এই মুহূর্তে আপনি এ মর্যাদাপূর্ণ কাজটি করছেন। নিচের আয়াতটির দিকে লক্ষ করুন। এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন যে, আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাস্য হবার অধিকার নেই। মালাইকারাও অর্থাৎ ফিরিশতারাও এই সাক্ষ্য দেন। তারপর আল্লাহ ﷻ তৃতীয় আরেকটি শ্রেণির কথা জানিয়েছেন যারা এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। আর এই শ্রেণি হলো তাঁরা, যাদের ইলম আছে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফিরিশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলি ইমরান, ১৮)

এ আয়াতের ব্যাপারে ইমাম আল-কুরতুবি ﵀ বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে যদি আলিমদের চেয়ে সম্মানিত কেউ থাকত, তাহলে আল্লাহ ﷻ তাঁর নাম এবং তাঁর মালাইকাদের নামের

---

৩৪ *সুনান ইবনু মাজাহ* : ২২৪

www.banglakitab.weebly.com

সাথে সাথে তাদের কথাও বলতেন।'[৩৫]

আল্লাহ ﷻ কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন :

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

বলুন, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (সূরা আত-ত্বহা, ১১৪)

এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে আরও বেশি ইলম প্রার্থনা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি ইলমের চেয়ে অধিক সম্মানিত কিছু চাওয়ার মতো থাকত, তাহলে আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে সেটার জন্যই দুআ করতে শেখাতেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে সম্পদ, সম্মান, খ্যাতি কিংবা অন্য কিছু চাইতে বলেননি; বরং আল্লাহ ﷻ ইলম বৃদ্ধির জন্য দুআ শিখিয়েছেন।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাকারী। (সূরা আল-ফাতির, ২৮)

মুয়াউইয়া ইবনু আবি সুফিয়ান رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন,

مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ তাআলা যার ভালো চান, তাকে দ্বীনের গভীর বুঝ দান করেন।[৩৬]

ইলম অর্জনের ব্যাপারে নিজের ভেতরে গাফলতি অনুভব করলে, অলসতা বোধ করলে, এই হাদিসটি স্মরণ করবেন। এই মুহূর্তে আপনি যে এই বইটি পড়ছেন ইন শা আল্লাহ এটি আপনার প্রতি আল্লাহ ﷻ-এর ভালোবাসা ও আল্লাহ ﷻ যে আপনার জন্য ভালো কিছু চান তার লক্ষণ।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিতে একটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি দ্বীনের ইলম অর্জনের জন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথকে সহজ করে দেন।'[৩৭]

---

৩৫ *তাফসিরুল কুরতুবি*তে ওপরোক্ত আয়াতের আলোচনা।
৩৬ *সহিহুল বুখারি* : ৭১; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৩৬
৩৭ *সহিহ মুসলিম* : ৭০২৮

www.banglakitab.weebly.com

মনে রাখবেন এখানে ইলম বলতে দ্বীন ইসলামের জ্ঞানকে বোঝানো হচ্ছে। আমরা যখন 'ইলম' বলছি আমরা তখন ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বোঝাচ্ছি।

তালিবুল ইলমদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এসেছে *ইবনু মাজাহ, আবু দাউদ* এবং *তিরমিযিতে*। আবু দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত এই হাদিস থেকে বোঝা যায় ইলম কতটা মূল্যবান। একজন ইলম অন্বেষণকারী হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝার চেষ্টা করুন। এই হাদিসে আবু দারদা ﵁ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

> যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্যে কোনো একটি পথে পৌঁছে দেন।

হাদিসের এ অংশটি *সহিহ মুসলিমে* এসেছে এবং একটু আগে আমরা এটা উল্লেখ করেছি। এবার বাকি অংশটুকু খেয়াল করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন,

وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

> 'ইলম অন্বেষণকারীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ফিরিশতাগণ তাদের প্রতি নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।'

যখন আপনি ইলম অর্জনে মনোযোগী হবেন ফিরিশতারা আপনার প্রতি তাদের ডানা বিছিয়ে দেবেন। তারা আপনাকে ভালোবাসবেন, সম্মান ও শ্রদ্ধা করবেন। তারা আপনার জন্য নিচে নেমে আসবেন, তাদের ডানা আপনার ওপর ছড়িয়ে দেবেন। নিজেদের বিনম্র করবেন আপনার জন্য। আপনাকে সুরক্ষিত রাখবেন ও আপনাকে পাহারা দেবেন। কেন? কারণ, আপনি ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন, ইলম অর্জনের চেষ্টা করছেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ

অর্থাৎ, আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীরা একজন তালিবুল ইলম, একজন ইলম অন্বেষণকারী, একজন আলিমের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর নিকট ইস্তিগফার ও দুআ প্রার্থনা

www.banglakitab.weebly.com

করে। সুতরাং এমন মনে করা উচিত হবে না যে, এখানে কেবল মানুষ ও জিনদের ইস্তিগফার করার কথা বলা হচ্ছে। বরং এখানে আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের কথা বলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ

অর্থাৎ সমুদ্রের মাছও তালিবুল ইলমের জন্য ইস্তিগফার করে। আপনি কি চান না সবাই আপনার জন্য দুআ করুক? তাহলে যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় অবিচল থাকুন।

হাদিসের পরবর্তী অংশে বলা হচ্ছে,

فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

অর্থাৎ, একজন নফল ইবাদতগুযারের ওপর একজন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হলো রাতের আকাশে তারকারাজির ওপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতন।

রাতের আকাশে অন্যান্য সব তারার তুলনায় চাঁদ যে কতটা উজ্জ্বল সেটা আমরা সবাই জানি। রাতের আকাশজুড়ে থাকে চাঁদের আলোকিত আভা ও উজ্জ্বলতা। পুরো আকাশজুড়ে তার আধিপত্য। চাঁদের পাশে তারাগুলোকে মনে হয় ছোট ছোট বিন্দুর মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদিসে এভাবেই একজন আবিদ ও আলিম ব্যক্তির তুলনা করেছেন। আবিদ হলেন রাতের আকাশে এক বিন্দু তারার মতো, অন্যদিকে তার তুলনায় একজন আলিম হলেন চাঁদের মতো।

সুনানুত তিরমিযির আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামাহ আল বাহিলী رضي الله عنه বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

> একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবিদের ওপর তেমন, যেমন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম মর্যাদাবান ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদা।[৩৮]

আমরা জানি যেকোনো আলিম বা অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা অনেক, অনেক বেশি। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলিমদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে নিজের সাথে সংযুক্ত করে উদাহরণ দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীনের পথের একজন শিক্ষার্থী, একজন জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য এরচেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? ইলম অর্জনের রাস্তায় দৃঢ় থাকতে এর চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আর কী হতে পারে?

---

৩৮ *সুনানুত তিরমিযি* : ২৬৮৫

www.banglakitab.weebly.com

আর তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

আর নিশ্চয় আলিমরা হলেন নবিদের ওয়ারিশ।

আপনি কি নবিদের উত্তরসূরি হতে চান? তাহলে দ্বীন সম্পর্কে জানুন, পড়ুন। এ পথ সম্মানের ওপর সম্মানের, মর্যাদার ওপর মর্যাদার পথ। চিন্তা করে দেখুন নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উত্তরসূরি বলে অভিহিত হওয়া কতটা সম্মানের!

হাদিসের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে :

وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

নবিগণ উত্তরাধিকারস্বরূপ দিনার-দিরহাম রেখে যান না। তারা টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ রেখে যান না। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরা রেখে যান ইলম। সুতরাং যে এই ইলম অর্জন করেছে নিঃসন্দেহে সে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছে, বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছে। মানুষের মধ্যে অনেকে প্রচুর টাকার মালিক হতে চায়–তারা বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেট কিংবা ওয়ালিদ বিন তালালদের মতো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক হতে চায়। অনেকে পদমর্যাদা আর ক্ষমতা চায়। রাজা-বাদশাহ, প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট অথবা এমন কোনো বড় পদমর্যাদার অধিকারী তারা হতে চায়, যাতে লোকেরা তাদের বাহবা দেয়, সম্মান করে। অনেকে অন্য কারও পোশাক আর স্টাইল ফলো করে। এভাবে সবাই কিছু না কিছুকে নিজেদের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়। সেগুলোর পেছনে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু যা আসলেই মূল্যবান তা হলো, নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালামের রেখে যাওয়া সম্পদ, আর এ সম্পদ থেকে খানিকটা নিজের করে নেয়া। কিন্তু আজ এটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে মূল্যহীন। যা সবচেয়ে মূল্যবান সেটার দিকে মানুষের মনোযোগ সবচেয়ে কম। মানুষের সব চিন্তা, প্রচেষ্টা, শ্রম হলো রাজা আর নেতাদের মতো হবার দিকে। সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি আর সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষ উদয়াস্ত ছুটে চলে, কত কিছুই না করে! কিন্তু তাদের কাছে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রেখে যাওয়া সম্পদ উপেক্ষিত! কয়জন মানুষ আজ এ সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে? কয়জন তাদের সন্তানকে এ সম্পদ অর্জনের শিক্ষা দেয়?

আবুল ওয়াফা' ইবনু আকিল বলেছেন, তারুণ্যে আল্লাহ ﷻ আমাকে হেফাযত করেছেন। অল্প বয়সে আমার সমস্ত ভালোবাসা কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্যই বরাদ্দ ছিল। যারা খেলাধুলা করে বেড়াত আমি তাদের সাথে মিশতাম না। নির্বোধ প্রকৃতির কারও সাথে কখনো আমি মিশিনি। আমি কেবল ইলম অন্বেষণকারী, তালিবুল ইলমদের সাথে সময় কাটাতাম। এখন আমার বয়স আশি পেরিয়েছে, কিন্তু বিশ বছর বয়সে ইলম অর্জনের প্রতি আমার যে পিপাসা ও ভালোবাসা ছিল, আজ তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

কথাগুলো একটু চিন্তা করে দেখুন।

মুতারিফ বলেছেন,

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ

আমি ইবাদতের চাইতে ইলম অর্জন করতে বেশি ভালোবাসি, আর মনে করি এ দুয়ের মধ্যে এটাই উত্তম। ইবাদত করার চেয়ে জ্ঞান অর্জন করা আমার অধিক পছন্দনীয়।[৩৯]

শুধু তিনি নন, আরও অনেক আলিম একই ধরনের কথা বলেছেন।

ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির বলেছেন,

لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ

'আরামের সাথে সত্যিকারের ইলম আসে না।'[৪০]

আপনি যদি আসলেই ইলম অর্জন করতে চান, আপনাকে আরাম ছাড়তে হবে। নিজের অবসর ও ঘুম থেকে কিছু সময় বের করে ইলম অর্জনের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। পাশাপাশি মনে রাখবেন, ফেইসবুক আর টুইটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে আপনি কোনোদিন সত্যিকারের জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবেন না। ফেসবুক, টুইটারের পেছনে অনেক ভাইয়েরা প্রচুর সময় ব্যয় করেন বলে আমি শুনেছি। বেশি থেকে বেশি হলে দৈনিক পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় এগুলোর পেছনে ব্যয় করতে পারেন।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, কখনো কখনো রাতের বেলার ইবাদতের চেয়েও আমার কাছে ইলম অর্জন করাই বেশি পছন্দনীয় হয়।

আয যুহরি ﷺ বলেছেন :

ما عُبِدَ اللهُ بِمِثْلِ الْعِلْمِ

'ইলম অর্জনের সমতুল্য আর কোনো ইবাদত নেই।'[৪১]

এখানে ইলম অর্জন বলতে বোঝানো হচ্ছে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা, মুখস্থ করা, পড়া। শুধু তাওহিদ না, দ্বীনের সব বিষয়ের ইলমই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা বিশেষ করে তাওহিদের কথা বলেছি। কারণ, তাওহিদ হলো সব নীতির মূলনীতি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জ্ঞান। তাওহিদের জ্ঞান হলো ওই জ্ঞান যা আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবে, ইন শা আল্লাহ।

---

৩৯ *আল-আদাব লিল বাইহাকি*, বর্ণনা নং : ৮৩০

৪০ *সহিহ মুসলিম* : ১৪২১

৪১ বাইহাকি, *শুয়াবুল ইমান* : ৪৬৯৭

www.banglakitab.weebly.com

ইমাম শাফে'ঈ ﷺ বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ

'ইলম অর্জন করা নফল নামায পড়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'[৪২]

এ কথার সঠিক অর্থ বুঝতে হলে আগে আপনাকে বুঝতে হবে তাদের জীবনযাপন-পদ্ধতি, রুটিন কেমন ছিল। তাদের লাইফস্টাইল ছিল পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ। তাদের পুরো সময়টাই ছিল আল্লাহ ﷻ-এর জন্য বরাদ্দ। সুতরাং প্রায়ই তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হতো যে, আজ কি আমি রাত জেগে নামাজ পড়ব? নাকি ছাত্রদের পড়াব? নাকি এই বইটা লেখার কাজে হাত দেবো, নাকি পরদিন সকালের ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নেব?

একটা করতে গেলে আরেকটা ছাড়তে হচ্ছে। সুতরাং আশ- শাফে'ঈ ﷺ-এর কথার অর্থ হলো, এ রকম অবস্থায় ইলম অর্জন নফল সালাতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। আমরা প্রতিদিন প্রচুর সময় নষ্ট করি। আর বিশ্বাস করুন, আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি, তাতে আমরা ইবাদত আর ইলম অর্জন দুটোই করতে পারি। কারণ, আমাদের অনেক বাড়তি সময় থাকে। তাঁরা যেভাবে সময়ের মূল্য দিয়েছেন আমরা তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারিনি। কীভাবে তারা ইলমকে গুরুত্ব দিয়েছেন, ইলম শেখার জন্য দূরদূরান্তে সফর করেছেন, এর পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন–তার কিছু দৃষ্টান্ত নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

সালাফদের সময়ের আলিম :

জাবির এবং আবু আইয়্যুব ﷺ

আহমাদ এবং আবু ইয়ালা ﷺ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি জাবির ﷺ একটি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য মদীনা থেকে আশ-শামে (অর্থাৎ সিরিয়াতে) আবদুল্লাহ্ ইবনু উনাইসের কাছে গিয়েছিলেন। মানচিত্র খুলে দেখুন কোথায় মদীনা আর কোথায় সিরিয়া। একটি হাদিসের জন্য তিনি মদীনা থেকে সিরিয়া গিয়েছিলেন। ইলম সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত চমৎকার বই হলো ইবনু আব্দিল বার ﷺ-এর জামিয়ু বায়ানিল ইলম। এ বইতে ইবনু আব্দিল বার ﷺ ইলমের মর্যাদা নিয়ে আলোচনায় সাহাবি আবু আইয়্যুব ﷺ-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আবু আইয়্যুব ﷺ তখন মদীনাতে বসবাস করছিলেন। একদিন তিনি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে মিসরের দিকে রওনা দিলেন উকবাহ ইবনু নাফি ﷺ-এর সাথে দেখা করার জন্য। মিসরে পৌঁছানোর পর তিনি মিসরের আমির, মুসলিমা ইবনু মাখলাদ আল আনসারির সাথে দেখা করলেন। মুসলিমা তাকে অভ্যর্থনা জানালেন, আলিঙ্গন করলেন,

৪২ *আল-মাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা* : ৩৬১

www.banglakitab.weebly.com

তারপর মিসরে আসার কারণ জানতে চাইলেন। আবু আইয়্যুব ﵁ বললেন, 'আমি এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদিসের জন্য এসেছি, যেটা আমি আর উকবাহ ইবনু নাফি ছাড়া আর কেউ সরাসরি শোনেনি। আমার সাথে এমন কোনো লোককে দিন যে আমাকে উকবাহর ঘর চিনিয়ে দিতে পারবে। তারপর আবু আইয়্যুব ﵁ উকবাহ ﵁-এর বাড়ি গেলেন। দরজা খুলে উকবাহ ﵁ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আবু আইয়্যুব ﵁-এর কাছে জানতে চাইলেন মদীনা থেকে মিসর আসার কারণ। আবু আইয়্যুব ﵁ বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আমি এমন একটি হাদিস শুনেছিলাম, যেটা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ সরাসরি শোনেনি। হাদিসটি ছিল কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করার ব্যাপারে। হাদিসটি কী ছিল উকবাহ? তুমি কি হাদিসটি আমাকে একটু শোনাবে?'

উকবাহ ﵁ বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে হাদিসটি শুনেছি। তিনি ﷺ বলেছেন,

مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى خِزْيِهِ ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলিমের দোষ বা লজ্জাকর বিষয় লুকিয়ে রাখবে, মহান আল্লাহ শেষ বিচারের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'[৪৩]

আবু আইয়্যুব ﵁ শুনে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ।

তারপর কী হলো? তিনি কি উকবাহ ﵁-এর বাড়িতে চা বা কফি খাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ বসলেন? নিঃসন্দেহে উকবাহ ﵁ তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইবনু আব্দিল বার বর্ণনা করেছেন,

ما حل رحله وما جلس

আবু আইয়্যুব ﵁ তার মালপত্র খুললেন না। বসলেনও না। কথা শেষ করে উটের পিঠে চড়ে মদীনার দিকে রওনা দিলেন। তিনি মদীনা থেকে মিসর গিয়েছিলেন কেবল একটি হাদিস শোনার জন্য। তাও এটি তার অজানা কোনো হাদিস ছিল না; বরং এটি ছিল এমন একটা হাদিস যেটা তিনি আর উকবাহ ﵁ ছাড়া, আর কেউ সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শোনেননি। আবু আইয়্যুব ﵁ এই হাদিসটি আরেকবার উকবাহ ﵁-এর মুখ থেকে শোনার সম্মানটুকু ছাড়তে চাননি। মুহাম্মাদ ﷺ-এর উচ্চারিত যে শব্দগুলো শুধু তারা দুজন সরাসরি শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন সেটা আবার উকবাহ ﵁-এর মুখে উচ্চারিত হতে দেখার সুযোগ তিনি ছাড়তে চাননি। আর আজ আমরা মানুষকে বলি, যান কিছু খাবার গরম করে নিন, হাতে কফির মগ নিয়ে আয়েশ করে বিছানায় হেলান দিয়ে ইউটিউবে ক্লিক করে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বিষয় জেনে নিন। আপনাকে বাসার আরাম-আয়েশ কিছুই ছাড়তে

৪৩ *মুসনাদু আহমাদ*: ১৬৬১৭

www.banglakitab.weebly.com

হবে না। অথচ মানুষ আজ এতটুকুও করতে চায় না। মানুষ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ও আসাদ ইবনুল ফুরাত ﵏

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﵀ ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি বলতে গেলে ঘুমাতেন-ই না। ছিলেন ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর সেরা ছাত্রদের একজন। তিনি খুব অল্প ঘুমাতেন যাতে ইলম অর্জনের জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়। ঘুমানোর সময়টুকু তিনি ইলমের পেছনে ব্যয় করতেন। তারাও কিন্তু আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন, আমাদের মতো তারাও ক্লান্তি অনুভব করতেন। কিন্তু তারা আন্তরিক ছিলেন। তাঁরা জীবনের একটি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন, আর সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতি নিবেদিত ছিলেন। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁরা সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। এ কারণেই তারা এত বড় মাপের মানুষ হতে পেরেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানি ﵀ রাতের বেলায় একটি বালতিতে বরফ-ঠান্ডা পানি রাখতেন। যখন ঘুম আসত, সেই পানি দিয়ে চোখ-মুখ মুছতেন আর বলতেন, উষ্ণতা তন্দ্রা আনে আর ঠান্ডা পানি ঘুমকে দূর করে দেয়।

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। আসাদ ইবনুল ফুরাত ﵀ ছিলেন স্পেনের একজন বিখ্যাত আলিম। তিনি স্পেনে বসবাস করতেন এবং কিছুদিন উত্তর আফ্রিকার দিকেও ছিলেন। আসাদ ইবনুল ফুরাত ﵀ স্পেন থেকে মদীনাতে গিয়েছিলেন ইমাম মালিক ﵀-এর কাছ থেকে শেখার জন্য। তিনি সরাসরি ইমাম মালিক ﵀-এর কাছ থেকে তাঁর মাযহাব নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। ইমাম মালিক ﵀-এর কাছে পড়া শেষ হলে তিনি গেলেন ইরাকে। দেখুন প্রথমে স্পেন থেকে মদীনা, তারপর মদীনা থেকে ইরাক। ইরাকে তিনি ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর কাছে শিখতে গেলেন, তারপর গেলেন মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﵀-এর কাছে। মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানি ﵀, যার কথা আমরা মাত্র আলোচনা করেছি, যিনি রাতে ঘুম তাড়ানোর জন্য বরফ-ঠান্ডা পানি দিয়ে চোখ মুছতেন।

যখন আসাদ ইবনুল ফুরাত ﵀ ইরাকে মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﵀-এর কাছে শেখার জন্য আসলেন, তিনি সাধারণত যে মাসজিদে দারস দিতেন তাকে সেটা দেখিয়ে দেয়া হলো। মাসজিদে গিয়ে দেখলেন অনেক ভিড়। ভিড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﵀ ছিলেন তাঁর সময়ের একজন ইমাম। আসাদ ইবনুল ফুরাত ﵀ ভিড় কমার অপেক্ষা করলেন। আস্তে আস্তে ভিড় কিছুটা কমল। তবে ইমাম মুহাম্মাদ ﵀-এর আশেপাশে তখনো বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ ছাত্র। তাদের ভিড় ঠেলে আসাদ ইবনুল ফুরাত ﵀ মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﵀-এর কাছে গিয়ে বললেন,

'ইমাম, আমি একজন বিদেশি, আমার কাছে খুব বেশি টাকাও নেই। ইরাকে বেশিদিন আমি থাকতে পারব না। আমাকে স্পেনে ফিরে যেতে হবে। এই অল্প সময়ে কিভাবে আমি আপনার কাছ থেকে আপনার সব জ্ঞান আহরণ করতে পারি?'

www.banglakitab.weebly.com

মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানি ﷫ বললেন, সকালে অন্য সবার সাথে হালাকায় বসবেন। আর রাতে আমার বাসায় আসবেন। আমি আপনাকে শেখাব। আসাদ ইবনুল ফুরাত ﷫ তার কথামতো কাজ শুরু করে দিলেন। সকালে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মাসজিদে হালাকায় বসেন, আর রাতে ইমাম মুহাম্মাদ ﷫-এর ঘরে গিয়ে তার কাছ থেকে শেখেন। রাতে পড়ানোর সময় ঘুম এলে মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ﷫ নিজের মুখে পানি দেন, কিন্তু আসাদ তো আর নিজের মুখে পানি দেন না। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে যায়, ঝিমুনি আসে। তখন ইমাম মুহাম্মাদ ﷫ ছাত্রের মুখেও পানি ছিটিয়ে দেন। গভীর রাত, সবাই ঘুমিয়ে গেছে, ইমাম মুহাম্মাদ বরফ-ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিচ্ছেন আসাদ ইবনুল ফুরাতের মুখে, আর তারা দুজনে বলে যাচ্ছেন 'কলাল্লাহ... আল্লাহ বলেছেন, 'কলার রাসূল... রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন'—এভাবে চলত ফজরের আগ পর্যন্ত।

একজন মানুষের আয়ু যদি হয় ৬০ বছর আর সে যদি দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ঘুমোয়, তাহলে হিসাব করে দেখুন তার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটবে ঘুমে। অর্থাৎ জীবনের প্রায় ২০ বছর সে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। আর অধিকাংশ মানুষ তো দৈনিক ৮ ঘণ্টার চেয়েও বেশি ঘুমাতে অভ্যস্ত। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় আপনি ইমাম মুহাম্মাদ ﷫-এর মতো করে পড়তে পারেন, কিন্তু আমরা মানুষকে এভাবে পড়তে বলছি না। যে সময়গুলো আমরা অলস বসে থাকি, কিংবা গুনাহর পেছনে নষ্ট করি—কেবল দিনের সেই সময়টুকু যদি আমরা আন্তরিকভাবে ইলম অর্জনের জন্য ব্যয় করি, তাহলেও সেটা যথেষ্ট।

যাই হোক, আসাদ ইবনুল ফুরাত ﷫ এক সময় স্পেনে ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে তিনি কী করলেন? তিনি কি পায়ের ওপর পা তুলে বলেন, আমি ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ ﷫ এবং আরও অনেকের কাছে পড়েছি? তিনি কি একটু বিশ্রামের কিংবা অবসর জীবনযাপন শুরু করলেন? না। তিনি স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকাজুড়ে ইমাম মালিকের *মুয়াত্তা* কিতাব শেখাতে শুরু করলেন। তারপর তিনি সুকলিয়্যাহ বা সিসিলি জয়ের জিহাদে শামিল হলেন এবং যুদ্ধে নিহত হলেন। এই ছিল তাঁর জীবন। আসাদ ইবনুল ফুরাত, একজন ইমাম, আল্লাহ ﷻ তার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন।

আসাদ ইবনুল ফুরাত, মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানি কিংবা আবু হানিফা ﷫ সময়ের মূল্য বুঝতেন। সময়ের মূল্য বোঝার কারণেই তারা মহিরুহে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে সময় ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাদের কাছে ইলমচর্চা ছিল পবিত্র ও মূল্যবান। আর এ কারণেই তারা এত বড়মাপের আলিম হতে পেরেছিলেন।

সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব, আর-রাযি ও আল-বুখারি ﷫

সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব ﷫ বলতেন, দিন-রাত সফর করে আমি একটি হাদিস সংগ্রহ করতাম। একটি হাদিস খুঁজে বের করার জন্য সাইদ ইবনু মুসাইয়্যিব ﷫ দিন-রাত পথ চলতেন। অথচ

www.banglakitab.weebly.com

আজ কয়েক ক্লিকের মধ্যে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমরা সেটা খুঁজে পাচ্ছি। আর-রাযি ﷺ বলেছেন, 'ইলম অর্জনের জন্য আমি এক হাজার ফারসাখেরও (فرسخ) বেশি দূরত্ব ভ্রমণ করেছি। তারপর হিসাব করা বন্ধ করে দিয়েছি।' এক হাজার ফারসাখ হচ্ছে ৫,০০০ কিলোমিটার অথবা ৩,১০৬ মাইল। এক হাজার ফারসাখ পর্যন্ত তিনি হিসাব রেখেছিলেন, তারপর গোনা বন্ধ করে দিয়েছেন। ইলমের জন্য তিনি আরও কত পথ ভ্রমণ করেছেন তার হিসাব নেই।

ঘুমানোর সময় বই বা হাদিস সংকলনের জন্য কোনো কিছু যদি মাথায় আসত ইমাম বুখারি ﷺ তৎক্ষণাৎ উঠে সেটা লিখে রাখতেন। এভাবে যখনই তার কিছু মনে পড়ত তিনি ঘুম থেকে উঠে সেটা লিখে রাখতেন। ইবনু কাসির ﷺ তার বিখ্যাত বই আত-তারীখে উল্লেখ করেছেন, আল-বুখারি এভাবে গড়ে প্রতি রাতে বিশবার ঘুম থেকে উঠতেন।

এই মানুষগুলো ইলমের প্রকৃত মূল্য বুঝতেন এবং এটাই 'ই'লাম'। এভাবেই ই'লাম অর্থাৎ ইলম অর্জন করতে হয়। আমাদের মতো নরম গদির ওপর আধশোয়া অবস্থায় তাঁরা এই জ্ঞান অর্জন করেননি। ছয় লক্ষের চেয়েও বেশি হাদিস থেকে বাছাই করে ইমাম বুখারি একটি হাদিসের কিতাব সংকলন করেছিলেন। যেটাকে আমরা আজ *সহিহ বুখারি* নামে চিনি। যেসব হাদিস পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেগুলো না ধরলে *সহিহ বুখারি*তে হাদিস আছে মোট ২,৬০২টি। আর যেসব হাদিস পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেগুলোসহ হিসাব করলে *বুখারি*তে মোট ৭,৫৯৩টি হাদিস আছে। ইবনু হাজার ﷺ-এর মতে সংখ্যাটা ৭,৩৯৭। যদি এগুলোর সাথে তালিকাত আল-মুতাআবা'আত (تعليقات المتابعات) হাদিসগুলোর সংখ্যা যোগ করা হয় তাহলে, ইমাম বুখারি সব মিলিয়ে তার সংকলনে মোট ৯,০৮২টি হাদিস এনেছেন। আর এই প্রতিটি হাদিস তাঁর সংকলনে লেখার আগে তিনি দুই রাকাআত করে ইস্তিখারার সালাত আদায় করতেন।

কষ্ট ছাড়া, কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া জ্ঞানার্জন সম্ভব না। আপন যদি ইলম অর্জন করতে চান, তাহলে আপনার ঘুম, বিশ্রাম আর সোশাল মিডিয়াতে কাটানো সময় থেকে কিছুটা করে সময় বের করে নিয়ে সেটাকে ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করতে হবে।

এ ঘটনাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো *উসুল আস-সালাসা* বইটির লেখক 'ই'লাম' দ্বারা কী বুঝিয়েছেন, সেটা অনুধাবন করা। যখন তিনি 'ই'লাম' বলছেন, তখন চাচ্ছেন যেন আপনি ইলম অর্জন করেন। তিনি চাচ্ছেন আপনি এই ইলমকে সম্মান করুন। তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন, আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আমি আপনাদের শেখাতে যাচ্ছি। তাই প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হোন। আর ইলম অর্জনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের অর্থ কী হতে পারে, সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ওপরের দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি জানি, ইলমের জন্য এই মহান ব্যক্তিরা যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমরা কখনোই সেভাবে আত্মত্যাগ করতে পারব না। তবুও কেন আমরা এই

www.banglakitab.weebly.com

উদাহরণগুলো, এই দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরছি? আমরা এ উদাহরণগুলো তুলে ধরছি কারণ তাঁরা যতটুকু করেছেন, আপনি যদি সেটার শুধু পাঁচ পার্সেন্ট অথবা দশ পার্সেন্ট করেন, তাহলেও ইন শা আল্লাহ আপনি ভালো একটি অবস্থানে পৌঁছে যাবেন। অন্যদিকে আমাদের চারপাশে যারা গুনাহর পেছনে অথবা অযথা কাজে সময় নষ্ট করছে, তাদের দিকে তাকালে আমরা আর এগোতেই পারব না। এ ধরনের মানুষেরা কখনো ইলমের কোনো পর্যায়েই পৌঁছাতে পারবে না। তাই আমরা এ মহান দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরছি যাতে করে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে আপনি তাদের সামনে রাখতে পারেন। তারা যা করেছেন তার পাঁচ পার্সেন্ট অথবা পঞ্চাশ পার্সেন্ট করার লক্ষ্য সামনে রাখতে পারেন। যদি এতটুকুও করেন ইন শা আল্লাহ আপনি উত্তম অবস্থানে থাকবেন।

ইমাম নাওয়াউয়ী, লিসানুদ দ্বীন, ইবনুল খাতীব ﷫ ও মুয়ায ইবনু জাবাল ﷛

ইমাম নাওয়াউয়ী ﷫-এর দিকে তাকান। বইয়ের পর বই লিখে গেছেন। তার ব্যাপারে যে বিষয়টা আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয় সেটা হলো, তিনি মারা যান মাত্র ৪৪ বছর বয়সে। এখন আমার যা বয়স তাঁর চেয়ে কয়েক বছর বেশি। উনি কখন বই লেখা শুরু করেছেন জানেন? তার বয়স ত্রিশ পার হবার পর। আজকাল লোকে লাফ দিয়ে লেকচার দিতে দাঁড়িয়ে যায়, খুতবাহ দিতে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ ইমাম নাওয়াউয়ী ﷫ তার বয়স ত্রিশ হবার আগে লেখাই শুরু করেননি। আর তিনি মারা গেছেন ৪৪ বছর বয়সে।

এই অল্প সময়ে তিনি *শারহু মুসলিম* (شرح مسلم), *রিয়াদুস সালেহিন* (رياض الصالحين), *আল-আযকার* (الأذكار), *আল-মাজমু* (المجموع), *মিনহাজ ফিল ফিকহ* (منهج فى الفقه), *আত-তিবইয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন* (التبيان في آداب حملة القرآن) *আল-ইদাহ* (الايضاح), *বুস্তানুল আরিফীন* (بستان العارفين), *মিনহাজুত তালিবিন* (منهج الطالبين), *রাওদাতুত তালিবিন* (روضة الطالبين), *তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত* (تهذيب الأسماء واللغات) এবং *আত-তাকরিব* (التقريب) নামে ইবনু সালাহ ﷫-এর হাদিসশাস্ত্র সম্পর্কে কিতাবের সারসংক্ষেপ লিখেছেন। তিনি চল্লিশটি হাদিসের সংকলন করেছেন, যা আল-আরবাউন (চল্লিশ হাদিস) নামে প্রসিদ্ধ। এমন কোনো তালিবুল ইলম পাওয়া যাবে না যার কাছে ইমাম নাওয়াউয়ী ﷫-এর চল্লিশ হাদিস বইটি নেই। এমন কোনো তালিবুল ইলম পাওয়া যাবে না, যে পড়াশুনার সময় দিনে অন্তত দশবার 'ইমাম নাওয়াউয়ী ﷫' উচ্চারণ করছে না। তিনি উসুলুল ফিকহের ওপর যাওয়ায়িদুর রাওদাহ (زوائد الروضة) নামে একটি বই লিখেছিলেন। তিনি সহিহ আল-বুখারির শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এটি শেষ হলে সহিহ বুখারির ওপর ইবনু হাজার ﷫-এর বইয়ের মতোই অনবদ্য একটি বই হতো।

ইমাম নাওয়াউয়ী ﷫ বলেছেন, 'জীবনের এমন দুটি বছর কাটিয়েছি যখন এক মুহূর্তের জন্যও

www.banglakitab.weebly.com

আমার পিঠ মাটি কিংবা বিছানা স্পর্শ করেনি।' টানা দু-বছরে এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিছানা কিংবা মাটিতে শোননি। তাকে প্রশ্ন করা হলো, তাহলে আপনি ঘুমাতেন কীভাবে? ইমাম আন-নাওয়াউয়ী ﷺ বললেন, 'যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আমার বইগুলোর ওপর ঝুঁকে, ওগুলোর ওপর ভর দিয়ে অল্প একটু ঘুমিয়ে নিতাম।' একটু চিন্তা করুন ব্যাপারটা।

মানুষের জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য থাকে। আজকালকার কিছু বাচ্চা ছেলে-ছোকরাকে দেখবেন ইমাম নাওয়াউয়ী ﷺ-এর সমালোচনা করতে। কিন্তু এ লোকগুলোর লক্ষ্য আর ইমাম নাওয়াউয়ী ﷺ-এর লক্ষ্য আলাদা। কারও লক্ষ্য থাকে ফিরদাউস, কারও লক্ষ্য থাকে আল-আরাফ, আবার কেউ হয়তো জান্নাতের দরজার সামনের জায়গাটুকু পেলেই সন্তুষ্ট। ৪৪ বছর বয়সে ইমাম নাওয়াউয়ী ﷺ যা করেছেন, অনেক সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ মিলেও তা করতে পারে না।

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। লিসানুদ দ্বীন ইবনুল খাতীব ছিলেন স্পেনের একজন আলিম। ১৩৪০ হিজরির দিকে একজন আলিম ও নেতা হিসেবে তিনি স্পেনে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার ডাকা হতো যুল-উমরাইন অর্থাৎ দুই জীবনের অধিকারী ব্যক্তি। তাকে এমন উপাধি দেয়ার কারণ কী ছিল? কারণ, দিনের বেলায় তিনি ব্যস্ত থাকতেন রাষ্ট্রের কাজ, মোকদ্দমা-সালিশ এগুলোর সমাধান নিয়ে। আর তাঁর রাত কাটত বই নিয়ে। তিনি আসলেই দুটি পৃথক জীবনযাপন করতেন। তিনি ঘুমের থেকে সময় বের করে নিয়েছিলেন যাতে করে তিনি দুটি জীবনের অধিকারী হতে পারেন।

আমি আবারও বলছি, আমরা এই মহান ব্যক্তিদের উদাহরণ দিচ্ছি যাতে আমরা যেন কিছুটা হলেও উনাদের মতো হতে পারি, হবার চেষ্টা করতে পারি। ইলমের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থার উন্নতি করতে পারি। এ উদাহরণগুলো দেয়ার এটাই উদ্দেশ্য। আমি বলব, আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান, দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুমান। বইয়ের ওপর ঝুঁকে, হেলান দিয়ে ঘুমানোর দরকার নেই। নরম মোলায়েম, পাখির পালক ভর্তি ম্যাট্রেসের ওপরেই ঘুমান। কিন্তু গল্প-গুজব করে কিংবা ফেইসবুকে, ইউটিউবে স্ক্রল করে যে সময়টা নষ্ট করছেন, সে সময়টাকে ইলম অর্জনের জন্য ব্যবহার করুন।

মুয়ায ইবনু জাবাল ﷺ বেঁচে ছিলেন মাত্র ৩৫ বছর। তিনি ছিলেন ইয়েমেনবাসীর কাছে পিতৃতুল্য, কারণ তাঁর মাধ্যমেই ইয়ামেনের অধিবাসীরা ইসলামের শিক্ষা পেয়েছিলেন। আজ মুয়ায ﷺ কবরে থেকেও ইয়েমেনের সব মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিদান পাচ্ছেন। আন-নাওয়াউয়ী ﷺ আর মুয়ায ﷺ যে ক্লান্তি-কষ্ট অতিক্রম করেছিলেন, তা শেষ হয়ে গেছে। আজ তাঁরা কবরে শায়িত। নির্ঘুম, ক্লান্ত রাতগুলো চলে গেছে, কিন্তু তাঁদের কাজ এবং কাজের পুরস্কার রয়ে গেছে। তা এখনো চলছে।

ইমাম আহমাদ ﷺ কী পরিমাণ পরিশ্রম আর কষ্ট করতেন, সেটা দেখে তাঁর আশেপাশের মানুষরা প্রশ্ন করত, আপনি বিশ্রাম নেবেন কখন? ইমাম আহমাদ ﷺ বলতেন, 'কবরে'।

www.banglakitab.weebly.com

আমি তো কল্পনা করি যে ইমাম নাওয়াউয়ী ﵀ কবরে হাসিমুখে শুয়ে আছেন। আমরা যতবার তার নামের সাথে ﵀ বলছি তিনি পুরস্কার পাচ্ছেন। যতদিন তার বইগুলো পড়া হবে, তিনি পুরস্কৃত হতে থাকবেন। তার রেখে যাওয়া ইলম হলো সাদাকা জারিয়াহ–এমন দান যা চলতেই থাকে। তিনি কবরে শুয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর পুরস্কার বেড়ে চলছে।

আল বদর ইবনু জামাআহ বলেছেন, 'আমি যখন ইমাম নাওয়াউয়ী ﵀-কে দেখতে গেলাম, বসার কোনো জায়গা পেলাম না। তারপর তিনি চারপাশের কিছু বই সরিয়ে আমার জন্য বসার জায়গা করে দিলেন। আর যখন আমি বসলাম তখনো তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে ছিলেন, ইলমের সন্ধানে। তিনি বইগুলো থেকে এমনভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করে চলছিলেন যেভাবে একজন মা তার হারানো সন্তানকে খুঁজে বেড়ায়।'

হাসান আল বাসরি ﵀ বলেছেন, 'দুই ব্যক্তি কখনোই তৃপ্ত হয় না। প্রথম ব্যক্তি হলো ইলম অন্বেষণকারী আর দ্বিতীয় হলো সম্পদ অন্বেষণকারী । এ দু-ধরনের ব্যক্তি কখনোই পরিতৃপ্ত হয় না। বরং সময়ের সাথে তাদের চাহিদা বাড়তেই থাকে।

এভাবেই পূর্ববর্তীরা ইলম নামক গুপ্তধনের অন্বেষণে ধৈর্য ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইলম হলো এমন এক সম্পদ, যা সাধনা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব না।

ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ–অবগত হোন, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রহম করুন।

সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক এবং আতা ইবনু আবি রাবাহ ﵀

বনু উমাইয়্যার বিখ্যাত খলিফাহ, সুলাইমান ইবনু আব্দিল মালিক হজ করতে গেলেন। সাথে দুই ছেলে। হজের বিভিন্ন আহকাম সম্পর্কে তার কিছু প্রশ্ন ছিল, তাই সবাই তাকে বলল আতা ইবনু আবি রাবাহের কাছে যান। আতা ইবনু আবি রাবাহ ﵀ ছিলেন একজন তাবিয়ি, যিনি ১১৪ হিজরিতে মারা যান। তিনি ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। তাঁর চোখে সমস্যা ছিল, এক চোখে দেখতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন, গায়ের রং ছিল কালো। মূর্খ লোকেরা যেসব বিষয় নিয়ে মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তাঁর মধ্যে সবগুলোই ছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর খলিফাহর যখন হজ নিয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার হলো, তখন সবাই তাকে এই ব্যক্তির কাছে যেতে বলল।

খলিফাহ তাকে কাবার কাছে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। দুই ছেলেকে নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে খলিফাহ তাঁর নামায শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন তার নামায শেষ হলো, খলিফাহ বললেন, হে আতা, আমার একটি প্রশ্ন আছে। দৃশ্যটি কল্পনা করুন–একজন সাবেক দাস, খলিফাহর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন তারা অধস্তন এবং তিনিই সম্মানিত। এ অবস্থায় খলিফাহ তাকে প্রশ্ন করছেন। তিনি পেছনে ফিরেও তাকালেন না। খলিফাহর কাছে তাঁর চাইবার কিছু নেই, কিন্তু খলিফাহ নিজ প্রয়োজনে তার

www.banglakitab.weebly.com

কাছে এসেছেন। খলিফাহর এমন এক ব্যক্তিকে প্রয়োজন, অজ্ঞ লোকেরা যাকে সবদিক দিয়ে তুচ্ছ মনে করে। যখন খলিফাহ সুলাইমান বুঝতে পারলেন আতা কতটা সম্মানিত এবং খলিফাহ হওয়ার পরও, ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আতার তুলনায় তিনি কতটা ক্ষুদ্র–তখন তিনি তার দুই ছেলেকে বললেন,

يا أولادى لا تنيا فى طلب العلم

ইলম অর্জনে কখনো অলসতা কোরো না, কারণ আতার সামনে আমাদের কতটা ক্ষুদ্র হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, আমি কখনোই তা ভুলতে পারব না।

কোনো ব্যক্তির কাছে এসে খলিফাহ প্রশ্ন করছেন–এটাই একটা বিরাটা ব্যাপার। তার ওপর চিন্তা করুন যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি হলেন একজন কালো, খোঁড়া, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস–যে এক চোখে দেখে না। যাকে সবাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। অথচ এ ব্যক্তির কারণে খলিফাহ তার ছেলেদের বলতে বাধ্য হলেন, তারা যেন কখনো ইলমের অন্বেষণ ছেড়ে না দেয়।

রিযক সব সময়ই নিশ্চিত। কিন্তু ইলম না। একজন খলিফাহর অনেক রিযক আছে, কিন্তু ইলম নেই। তাই আমরা ইলমের অন্বেষণ করি, আর আল্লাহ ﷻ সব সময় আমাদের রিযকের নিশ্চয়তা দেন।

আল-কাসায়ি ও খলিফাহ হারুনুর রশিদের ছেলেরা

খলিফাহ হারুন আর-রশিদের ছিল দুই ছেলে। আল-আমিন ও আল-মামুন। এ দুজনকে পড়ানোর জন্য সে সময়ের প্রসিদ্ধ একজন আলিমকে তিনি এনেছিলেন। তার নাম ছিল আল-কাসায়ি। যখন আল-কাসায়ি দরজার কাছে আসতেন, খলিফাহর দু-ছেলে দরজা খুলে, তাঁর জুতো হাতে নিয়ে তাঁকে ভেতরে স্বাগত জানাত। হারুন আর-রশিদ হয় ব্যাপারটা দেখেছিলেন বা এটা সম্পর্কে শুনেছিলেন। একদিন তিনি আল-কাসায়িকে তার প্রাসাদকক্ষে ডেকে প্রশ্ন করলেন, লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত কে?

কাসায়ি জবাব দিলেন, আপনি, হারুন আর-রশিদ। আপনি খলিফাহ, আপনিই এখানে সবচেয়ে সম্মানিত।

তখন হারুন আর-রশিদ বললেন, 'না, বরং ওই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত যার জন্য দরজা খুলতে নেতৃত্বের উত্তরাধিকারীরা ছুটে যায় এবং তার জুতো হাতে তুলে নেয়।'

তাই আমাদের ইলম এবং ইলম অর্জনের মহান মিশনের গুরুত্ব বোঝা দরকার।

www.banglakitab.weebly.com

আশ- শাফে'ঈ ও ইবনুল জাওযী ﵏

ইমাম শাফে'ঈ ﵀-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, কীভাবে তিনি ইলম অর্জন করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, আমি ইল্‌মের পেছনে ছুটেছি যেভাবে একজন মা তার হারানো ছেলেকে খোঁজে। সন্তান হারিয়ে গেলে একজন মায়ের কী অবস্থা হয়? সেই মা তখন পাগলের মতো, খ্যাপার মতো তার হারানো ছেলেকে খুঁজে ফেরে। ইমাম শাফে'ঈ ﵀ বলেছিলেন, তিনি এই মায়ের মতোই ইলমের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন।

ইবনুল জাওযী ﵀ বলেছেন, অনেক বছর আমি 'হারিসাহ' খাবার ইচ্ছে চেপে রেখেছিলাম। হারিসাহ হলো এক ধরনের মিষ্টি, এটা আজও আরবে খুবই বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। ইবনুল জাওযী হারিসাহ খাবার ইচ্ছে অনেক দিন মনের ভেতরে চেপে রেখেছিলেন, কারণ মাসজিদের পাশের হারিসাহ বিক্রেতা প্রতিদিন ঠিক ওই সময়ে আসত, যখন তার ক্লাস চলত। ইচ্ছা থাকলেও তিনি হারিসাহ খেতে যেতে পারতেন না, কারণ তিনি মিষ্টির জন্য ক্লাস মিস করতে চাইতেন না। তাঁর মনে হারিসাহ খাবার লোভ ছিল, কিন্তু তিনি ইলমের–জ্ঞানার্জনের–সম্মান ও পুরস্কার আরও বেশি করে চাইতেন। প্রকৃত জ্ঞানার্জন হলো সাধনার বিষয়। এটা এমন কিছু না যা আপনি দেখিয়ে বেড়াবেন। এটা এমন কিছু না যেটা আপনি কেবল হঠাৎ কখনো হাতে সময় পেয়ে গেলে করবেন। এটা এমন কিছু না যে আপনার আর কোনো কিছু করার না থাকলেই আপনি হালাকায় যাচ্ছেন বা জ্ঞানার্জনে সময় দিচ্ছেন।

রাহিমাকাল্লাহ :

রাহিমাকাল্লাহ–আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন। ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ বাক্যের দ্বিতীয় শব্দ–রাহিমাকাল্লাহ–দ্বারা লেখক বোঝাচ্ছেন, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন, যাতে করে আপনি অর্জন করতে পারেন যা আপনি খুঁজছেন। আল্লাহ ﷻ আপনাকে রাহমাহ দান করুন–যা কিছু আপনার জন্য ভালো তা অর্জন করার এবং যা কিছু ক্ষতিকর তা থেকে দূরে থাকার। এই হলো রাহিমাকাল্লাহর অর্থ। রাহিমাকাল্লাহ্ দ্বারা বোঝানো হয়–আল্লাহ ﷻ যেন আপনার অতীতকে ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতে আপনাকে হিদায়াত ও হেফাযত করেন। এ সবকিছু রাহিমাকাল্লাহর অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

যদি আপনি রাহিমাকাল্লাহ ও গাফারালাক একত্র করেন, তাহলে প্রতিটির আলাদা অর্থ হবে। মাগফিরাহ হলো ক্ষমা। আর রাহমাহ হলো দয়া। একত্রীভূত অবস্থায়, মাগফিরাহ দ্বারা আগের গুনাহর জন্য ক্ষমা এবং রাহমাহ দ্বারা পরবর্তী গুনাহ, সেগুলোর ফলাফল এবং শাস্তি থেকে নিরাপত্তাকে বোঝাবে। অর্থাৎ দুটোকে একত্র করা হলে শব্দ দুটো ভিন্ন অর্থকে নির্দেশ করবে। কিন্তু যদি মাগফিরাহ অথবা রাহমাহর কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়, তাহলে একটি উল্লেখ করলে অপরটির অর্থও প্রকাশ পাবে। সুতরাং যদি শুধু মাগফিরাহর কথা উল্লেখ করা

www.banglakitab.weebly.com

হয়, তাহলে সেটা মাগফিরাহর পাশাপাশি রাহমাহর অর্থও প্রকাশ করবে। একইভাবে যদি শুধু রাহমাহ উল্লেখ করা হয়, তবে তার মাধ্যমে মাগফিরাহর অর্থও প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ এ দুটোর যেকোনো একটি শব্দকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলে, উল্লেখিত শব্দটি অন্যটির অর্থকেও ধারণ করবে। কাজেই কোনো বাক্যে শুধু মাগফিরাহ বলা হলে তা দ্বারা রাহমাহকেও বোঝানো হচ্ছে। কোনো বাক্যে শুধু রাহমাহ বলা হলে তা দ্বারা মাগফিরাহকেও বোঝানো হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে নিয়মটি কোনো বাক্যে ইসলাম ও ঈমান একসাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মটির অনুরূপ। ইসলামের তিনটি পর্যায় আছে—ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.....

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম। (সূরা আলি ইমরান, ১৯)

এখানে ঈমানের উল্লেখ ছাড়াই শুধু ইসলামের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে ইসলাম শব্দটি দ্বারা ঈমান ও ইহসানের অর্থও প্রকাশ পাচ্ছে। যখন কোনো বাক্যে এভাবে শুধু 'ইসলাম' ব্যবহৃত হয় তখন তার মধ্যে ঈমান অর্থটিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্য একটি আয়াতে শুধু ঈমানের কথা বলা হয়েছে :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا

বেদুইনরা বলে, 'আমরা ঈমান আনলাম'...। (সূরা হুজুরাত, ১৪)

যেহেতু এখানে শুধু ঈমান শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তাই এখানে ঈমান শব্দটির মধ্যে ইসলাম ও ইহসান অর্থ দুটিও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যদি কোনো বাক্যে কেবল একটি ব্যবহার করা হয়, তাহলে উল্লেখিত শব্দটি অন্যটির অর্থকেও ধারণ করবে। আবার যখন কোনো বাক্যে ইসলাম ও ঈমান একসাথে ব্যবহৃত হয় তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

এই একই নিয়ম মাগফিরাহ ও রাহমাহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

একজন কাফিরকে উদ্দেশ্য করে কি রাহিমাকাল্লাহ বলা যাবে?

লেখক এখানে রাহিমাকাল্লাহ বলেছেন, কারণ তিনি শেখানোর চেষ্টা করছেন। যখন আপনি কোনো কাফিরকে—সেটা হতে পারে কোনো কাফির আত্মীয় অথবা যেকোনো কাফির—ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন, তখন আপনি কি তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে পারবেন—আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন?

আমি ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলছি—প্রথম পয়েন্ট হলো, এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে, কাফির অবস্থায় মারা যাওয়া ব্যক্তির জন্য দুআ করা যাবে না। আপনি এমন

www.banglakitab.weebly.com

ব্যক্তির জন্য দুআ করতে পারবেন না। আপনি বলতে পারবেন না যে–আল্লাহ ﷻ তার ওপর রহম করুন। *আল-মাজমুর* পঞ্চম খণ্ডে, ইমাম নাওয়াউয়ী ؓ বলেছেন, এ ব্যাপারে ইজমা আছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। আল-ফাতাওয়ার ১২তম খণ্ডে ইবনু তাইমিয়্যাহ ؓ বলেছেন, ইজমা আছে যে মৃত কাফিরের জন্য দুআ করা নিষিদ্ধ।

তবে জীবিত কাফিরের বেলায় ব্যাপারটা কেমন, তা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। আমি বিষয়টি পরিষ্কার করছি, কারণ কোনো কোনো মর্ডানিস্ট কিংবা জাহিল পূর্ববর্তীদের বইয়ে লেখা কিছু মন্তব্য দেখিয়ে বলা শুরু করে–'দেখো, অমুক অমুক আলিম বলেছেন যে, জীবিত কাফিরের জন্য রাহমাহর দুআ করা জায়েজ।' আর যে হারে এদের অবনতি হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই এরা হয়তো মৃত কোনো কাফিরের ক্ষেত্রেও একই কথা চালিয়ে দিতে পারে। আর এ জন্যই আলিমদের কাছ থেকে, শুয়ুখের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করা জরুরি। যেমন, অনেক সময় আপনি বইতে মাকরুহ শব্দটি দেখবেন। মাকরুহ অর্থ অপছন্দনীয়। কিন্তু অনেক শাইখ, যে বস্তু বা কাজকে হারাম গণ্য করতেন সেগুলোর ক্ষেত্রে মাকরুহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা মাকরুহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন হারাম অর্থে। যেসব আলিম এ নীতিটি গ্রহণ করেছেন তাঁদের বই পড়ার সময় যদি এ ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে আপনি নিজে থেকে কীভাবে বুঝবেন? আপনি বই পড়তে গিয়ে দেখলেন লেখা আছে, যিনা-ব্যভিচার অপছন্দীয় বা মাকরুহ। মদ হলো মাকরুহ। আপনার অবস্থা কী হবে? যদি আপনি শেকড় সম্বন্ধে অজ্ঞ হন, অর্থাৎ ওই শাইখ–মাকরুহ বা অপছন্দনীয় শব্দটি হারাম অর্থে ব্যবহার করেন–এই নীতি সম্পর্কে না জানেন, তাহলে ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন না।

একটা ব্যাপার নিশ্চিত, যখন আপনি একজন কাফিরের জন্য রাহমাহর দুআ করছেন তখন এটাকে এভাবে বুঝতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে রাহমাহ অর্থ হলো আল্লাহ ﷻ যেন তাকে হিদায়াত করেন। আল্লাহ ﷻ যেন তাকে পথ দেখান। *ফাতহুল বারির* ১১তম খণ্ডে হাফিয ইবনু হাজার ؓ এটা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমি ইবনু হাজার ؓ-এর উল্লেখ করা সারমর্মের কথা বলছি এবং এ ব্যাপারে এটাই শ্রেষ্ঠ সারমর্ম। তিনি তার সারমর্মে বলেছেন, 'আপনি একজন কাফিরের হিদায়াতের জন্য দুআ করতে পারেন। আর যদি আপনি তার জন্য রাহমাহর দুআ করেন তবে অবশ্যই আপনার দুআর পেছনে নিয়ত হতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে রাহমাহ অর্থ হিদায়াহ। কাজেই আপনি যদি কোনো জীবিত কাফিরকে উদ্দেশ্য করে রাহিমাকাল্লাহ বলেন, তাহলে তা শতভাগ এই নিয়্যাতেই হতে হবে যে–আল্লাহ ﷻ তার ওপর হিদায়াতের রাহমাহ করুন। এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে, অন্য কোনো নিয়্যাতে কোনো জীবিত কাফিরকে উদ্দেশ্য করে, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রাহমাহ করুন–এ কথা বলা যাবে না।

তবে উত্তম হলো সরাসরি ও স্পষ্টভাবে বলা যে, আল্লাহ ﷻ তাকে অথবা তাদের হিদায়াত করুন। তবুও যদি আপনি এ ক্ষেত্রে অনুত্তম অবস্থান গ্রহণ করে, দুআতে রাহমাহ শব্দটি

www.banglakitab.weebly.com

ব্যবহার করেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এ নিয়্যাতে দুআ করতে হবে যে এখানে রাহমাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিদায়াহ।

সহিহ আল-বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ *উমদাতুল কারিতে* বাদরুদ্দিন আল- আইনি اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (হে আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা করো, তারা তো অজ্ঞ।) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ দুআর ব্যাপারে বলেছেন, যখন তার কওম কাফির ছিল, তাঁর ক্ষতি করছিল ও তাঁর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল, তখন নবি ﷺ তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দুআ করেছিলেন, আল্লাহ ﷻ যেন তাদের ক্ষমা করে দেন। বাদরুদ্দিন আল-আইনি رحمه الله বলেছেন, এ ক্ষেত্রে এ দুআর অর্থ হলো, আল্লাহ ﷻ যেন তাদের ইসলামে প্রবেশের হিদায়াহ দেন, যাতে করে তাঁরা ক্ষমা পায়। তাই আলিমগণ ঠিক কী বোঝাচ্ছেন, সেটা সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

লেখক কেন শুরুতে ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ বললেন?

এবার আসা যাক, লেখক কেন শুরুতে ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ বললেন সে আলোচনায়। হিকমাহ ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিমগণ এ ধরনের কথা দিয়ে বক্তব্য শুরু করতেন। এ কথার মাধ্যমে লেখক ওই ব্যক্তির জন্য দুআ করছেন, যে তাঁর কথা শুনছে ও তাঁর কাছ থেকে শিখছে। যে ভবিষ্যতে বইটি পড়তে পারে তিনি তার জন্যও দুআ করছেন। এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিহিত আছে। মানুষের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছে দেয়ার সময় দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হওয়া আবশ্যক। যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, একজন দা'ঈর জন্য তাদের এটা বোঝানো অপরিহার্য যে তিনি তাদের জন্য হিদায়াহ কামনা করেন। দাওয়াহ করার সময় মানুষকে বোঝাতে হবে যে আপনি তাদের অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোর দিকে নিয়ে আসতে চান।

একজন দা'ঈ তার হাসির মাধ্যমে মন জয় করেন। এটা হলো অন্তরের চাবি। আপনার দাওয়াহর মধ্যে রাহমাহ থাকতে হবে। এটা হতে পারে হাসির মাধ্যমে অথবা প্রশংসা, কোনো শব্দে, অথবা কারও পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। আজ অনেককে দেখলে মনে হয় দাঁত যেন সতরের অংশ। অনেকের আচরণ এমন যে, দাঁত ঢেকে রাখা যেন পর্দার অংশ। কথাটা হাসির না, আসলেই কিছু মানুষ এমন। দাওয়াহ হয় হিকমাহ, ভদ্রতা ও নম্রতার মাধ্যমে। আপনি চাবি ছাড়া তো ঢুকতে পারবেন না। রাহমাহ হলো মানুষের মন জয় করার চাবি।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ ﷻ বলছেন :

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

> আর আপনি যদি রুক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়ত। (সূরা আলি ইমরান, ১৫৯)

www.banglakitab.weebly.com

যদি খোদ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য এ কথা প্রযোজ্য হয়, তাহলে চিন্তা করুন অন্য কারও ক্ষেত্রে কী হতে পারে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ যা বলেছেন একজন দা'ঈকে তা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এবং দাওয়াহর ক্ষেত্রে নবি ﷺ-এর মতো হতে হবে।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

> তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন–সে তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু। (সূরা আত-তাওবা, ১২৮)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন—মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকে, তোমরা তাঁকে ভালোমতো চেনো। তোমাদের যা কিছু কষ্ট দেয় তা তাঁর নিকট খুবই কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তিনি তোমাদের নিয়ে উৎকণ্ঠিত, তিনি চিন্তিত। তিনি চান তোমরা হিদায়াত পাও এবং তাওবাহ করো। তিনি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চান। মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।

আল্লাহ ﷻ তাঁর নবির ব্যাপারে বলছেন—তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যে তোমাদের প্রতি দয়ালু, সহানুভূতিশীল, যে তোমাদের ব্যাপারে চিন্তিত, যে তোমাদের পরিণতি নিয়ে দুশ্চিন্তা করে, যে তোমাদের দিতে চায় সর্বোত্তমটাই।

উসুল আস-সালাসার লেখক যখন রাহিমাকাল্লাহ বলছেন—তখন তিনি এমন এক সময়ের মানুষদের উদ্দেশ্য করে বলছেন যখন মানুষ ছিল অজ্ঞতা, বিদআহ ও শিরকে নিমজ্জিত। কবরপূজা ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কবরপূজা করাই ছিল নিয়ম, এর বিপরীতে সঠিক পথে থাকাটা ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম।

সে-ই ব্যক্তিই জ্ঞানী, যিনি হিকমাহসম্পন্ন এবং যিনি জানেন যে সত্য কিছুটা কঠিন। সত্য তেতো এবং অনেক সময় হজম করা কঠিন—বিশেষ করে যখন কারও দাদা, পরদাদারা যে বিষয়ের ওপর ছিল, সত্য সেটার বিরুদ্ধে যায়। যেহেতু সত্য শক্ত এবং গ্রহণ করা কঠিন, তাই একজন দা'ঈকে এগোতে হতে হয় হিকমাহর সাথে। তাই কঠিন আচরণের সাথে কঠিন দাওয়াহ করবেন না। আপনি কি দুটো কাঠিন্যকে এক করতে চান? দাওয়াহর কাঠিন্যের সাথে নিজের আচরণের কাঠিন্য মেলাবেন না। কিছু লোক আছে কয়েকটা হাদিস পড়েই মানুষকে কাফির-খারিজিসহ মাথায় যা কিছু আসে বলা শুরু করে দেয়।

হুসাইন আল-কারাবিসি ছিলেন গ্রিকদর্শন চর্চা করা একজন বিদয়াতি। ফালসাফা বা গ্রিকদর্শন চর্চাকারীদের বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সবকিছুর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত। *তারীখ বাগদাদে* বর্ণিত আছে, ইমাম শাফে'ঈ رحمه الله যখন বাগদাদে গেলেন আল-কারাবিসি সেটা জানতে পারলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আশ-শাফে'ঈ رحمه الله-কে দেখতে আসছিল।

www.banglakitab.weebly.com

আল-কারাবিসি তার বন্ধুদের বললেন, চলো আমরাও গিয়ে শাফে'ঈকে দেখে আসি। গ্রিকদর্শন চর্চাকারীরা খুব বাকপটু হতো। তাদের কথা হতো সুন্দর ও কৌশলী। কুরআন ও হাদিসের ইলম ছিল না, তাই তারা তাদের কথার জাদু ব্যবহার করত। তো আল-কারাবিসি বললেন, চলো শাফে'ঈর কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে কিছুটা মজা করা যাক। আল-কারাবিসি শাফে'ঈ ﷀ-এর কাছে গেলেন এবং স্বভাবসুলভ চাঁছাছোলা ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করলেন। আশ- শাফে'ঈ ﷀ কিন্তু জানেন তারা কেন এসেছে, কী করার চেষ্টা করছে। তিনি এটাও জানেন যে চারপাশে অনেক লোকজন আছে, তিনি চাইলেই এদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারেন। এ অবস্থায় ইমাম শাফে'ঈ ﷀ কয়েকজন ছাত্রকে তাদের বের করে দেয়ার জন্য বলতে পারতেন, তিনি লোকজনকে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি চুপচাপ তাদের প্রশ্ন শুনলেন। তারপর ধৈর্য ধরে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া শুরু করলেন। আয়াতের পর আয়াত, হাদিসের পর হাদিস, একটির পর একটি সালাফদের উদ্ধৃতি দিতে থাকলেন। যতক্ষণ না ইলম ও আদাবের দ্বারা তিনি তাদের অভিভূত করে ফেললেন।

জানেন সবশেষে এই দর্শনবিদ, এই বিদয়াতি, এই বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যাকারীরা কি বলল? তারা বলল, আমরা বিদআহ ত্যাগ করলাম এবং আশ-শাফে'ঈ ﷀ-কে অনুসরণ করলাম। তারা গিয়েছিল ইমাম শাফে'ঈ ﷀ-কে নিয়ে মজা করার জন্য। তিনি চাইলে তাদের নিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরলেন করলেন এবং আল্লাহ ﷻ তাঁর মাধ্যমে এমন কিছু মানুষকে হিদায়াত করলেন, যারা পরে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ ইমামদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এই হলো রাহমাহর ফলাফল। আশ-শাফে'ঈ ﷀ-এর কাছে অন্তরের চাবি ছিল এবং বার্তা পৌঁছে দেয়ার হিকমাহ ছিল। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا.....

> আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ওই জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (সূরা আল-আম্বিয়া, ৭৪)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا......

> যখন মুসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা আল-কাসাস, ১৪)

ইলমের মতোই হিকমাহ থাকাও অপরিহার্য, আর 'রাহিমাকাল্লাহ' এর মাধ্যমে সেটাই প্রকাশ পাচ্ছে। এই বাক্যে রাহিমাকাল্লাহ শব্দটির ব্যবহার ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব ﷀ-এর হিকমাহর অংশ। এভাবেই আয়ত্তে আনা যায় মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে। এ থেকে

www.banglakitab.weebly.com

শিক্ষা গ্রহণ করুন, নিজেকে বিনীত করুন। যদি কারও সাথে দ্বিমতও পোষণ করেন তবুও তো তারা মুসলিম—আল্লাহ ﷻ তাদের ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন। নিজের ডানা তাদের প্রতি অবনত করুন। জানেন এখানে কোন ব্যক্তি রাহিমাকাল্লাহ বলছেন? জানেন কোন ব্যক্তি রাহমাহর জন্য দুআ করছেন? ওই মানুষটি, যার ব্যাপারে দুই শ বছরের বেশি সময় ধরে অপবাদ দেয়া হয়েছে, কটু কথা বলা হয়েছে। আজও তা চলছে। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণকে পুনরুজ্জীবিত করার কারণে তাঁর জীবদ্দশায় শুরু হওয়া ঝড়ের ধুলো আজও মেটেনি। আজও মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলছে। এবার চিন্তা করুন, যে আক্রমণ আজও চলছে, তাঁর জীবদ্দশায় সেগুলোর মাত্রা কতটা তীব্র ছিল। অথচ এতকিছুর পর, বিরোধিতাকারীরা তাঁর লেখা চিঠি ও লিফলেটগুলো পড়বে এটা জানার পরও তিনি বলছেন—রাহিমাকাল্লাহ। আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন।

একজন দা'ঈর আচরণে সঠিক আদাব এবং মুখে হাসি থাকা প্রয়োজন। নিজ আচরণের মাধ্যমে তাকে মানুষের জন্য প্রশান্তির উৎসে পরিণত হতে হবে। যেন তার সাথে কথা বলা, মতবিনিময় করা মানুষের জন্য সহজ হয়। এমন ব্যক্তিই প্রকৃত দা'ঈ এবং এগুলোই প্রকৃত দা'ঈর বৈশিষ্ট্য। এক টুকরো হাসিই হয়তো কারও অন্তরকে আপনার বক্তব্যের প্রতি উন্মুক্ত করে দেবে। রাহিমাকাল্লাহ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে—আমি আপনার কল্যাণের ব্যাপারে চিন্তিত এবং আমি চাই আপনারা এ বিষয়গুলো জানুন। সহিহ মুসলিমে আছে,

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

কোনো ভালো কাজকেই তুচ্ছ মনে কোরো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎও হয়।[৪৪]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আছে, জারির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ বলেছেন,

ولا رآني إلاَّ تبسّم في وجْهِي

'আমি কখনোই তাঁকে মুচকি হাসিবিহীন অবস্থায় দেখিনি।'[৪৫]

এই ছিলেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ, যার অনুসরণ আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি হাসিমুখে বলুন, কিংবা ভ্রুকুটির সাথে কথা বলুন, তাঁর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা তিনি মিষ্টি ভাষায় প্রকাশ করুন কিংবা রুক্ষ ভাষায়—আমরা বাধ্য তার অনুসরণ করতে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু আমার বা আপনার অনুসরণ কারও জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তাই হিকমাহ, উত্তম আচরণ ও কোমলতার সাথে এমনভাবে এ দাওয়াহ পৌঁছে দিন যা অন্তরে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি আনে।

---

৪৪ *সহিহ মুসলিম* : ৬৮৫৭

৪৫ *সহিহুল বুখারি* : ৩০৩৫; *সহিহ মুসলিম* : ৬৫১৯

www.banglakitab.weebly.com

সুনানুত তিরমিযিতে আছে, আবদুল্লাহ ইবনু আল-হারিস ﵁ বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

'আমি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।'[৪৬]

চিন্তা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে একজন সাহাবি এ কথা বলছেন। হাসিমুখে অথবা সদয় ভাষায় একজন মুসলিম ভাইকে অভ্যর্থনা জানানো, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়া, একটি আলিঙ্গন–এসবই হলো অন্তর খোলার চাবি। সত্যিকারের মুচকি হাসি তাড়াতাড়ি আসে, আর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। আর যেগুলো নকল সেগুলো আসতে অনেক সময় নেয়, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যায়।

মুনাফিকের একটি নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিনদের প্রতি ধারালো জিহ্বা ও ভ্রুকুটি আর কাফিরদের প্রতি এর বিপরীত।

سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ.....

...অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাক্‌চাতুরিতে অবতীর্ণ হয়। (সূরা আল-আহযাব, ১৯)

তারা তাদের জিবে ধার দেয় আর তা মুমিনদের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ ﷻ মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বলেছেন :

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে আছে তাঁরা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, আর নিজেদের মধ্যে দয়ালু। (সূরা আল-ফাতাহ, ২৯)

আর মুনাফিকদের স্বভাব হলো এর বিপরীত।

একজন দা'ঈ হলেন একজন ডাক্তার। তাকে মোকাবেলা করতে হয় মন ও আত্মার সমস্যাগুলোর সাথে। আধ্যাত্মিকভাবে, শারীরিকভাবে না। একজন দা'ঈ বুক চিড়ে হৃৎপিণ্ড নিয়ে চাপাচাপি শুরু করে দেন না। তিনি মানুষের অন্তরের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন আধ্যাত্মিকভাবে। তাই দাওয়াহ করতে হলে আপনার জানতে হবে কীভাবে সঠিক উপায়ে মানুষের অন্তর খুলতে হয়। বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য আগে আপনাকে চাবি খুঁজে বের করতে হবে। যেমনটা আগে বলেছি, এ দাওয়াহ গ্রহণ করা মানুষের জন্য কঠিন, তাই এর সাথে নিজের রুক্ষতাকে মেশাবেন না। আপনার দাওয়াহ মানুষকে নিয়ে আর অনেক সময় মানুষের মনজয়ের জন্য তাদের প্রশংসা করতে হয়।

৪৬ *মুসনাদু আহমাদ*: ১৭৭১৩; *সুনানুত তিরমিযি*: ৩৬৪১

www.banglakitab.weebly.com

সালাতের শেষে, নামাযের শেষে আমরা যে দুআ পড়ি, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা মুয়ায ইবনু জাবাল ﵁-কে শিখিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি হঠাৎ মুয়াযের কাছে এসে বলেছিলেন, সালাতের পর এই দুআ পড়বে? তিনি মুয়াযের কাছে আসলেন এবং বললেন :

إِنِّي أُحِبُّكَ يا مُعاذ

আমি তোমাকে ভালোবাসি, মুয়ায!

আপনি কি চিন্তা করতে পারেন এ কথার পর মুয়ায ﵁-এর অন্তরের কী অবস্থা হয়েছিল? আর এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দুআ শিখিয়েছিলেন।

فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

মুয়ায, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এই দুআটি পড়তে ছেড়ো না– 'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার যিকির, কৃতজ্ঞতা এবং উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করার তাওফিক দাও।'[৪৭]

একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইবনু উমার ﵄-কে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে বললেন, তখন তিনি প্রথমে ইবনু উমার ﵄-এর প্রশংসা করলেন, তারপর তাকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের কথা বললেন। নবি ﷺ প্রথমে প্রশংসা করলেন আর তারপর আমলের জন্য উৎসাহিত করলেন। আর এটাই হলো হিকমাহসম্পন্ন, সৎকর্মশীল এবং সফল দা'ঈদের বৈশিষ্ট্য।

৪৭ *আল-আদাবুল মুফরাদ*: ৬৯০; *সুনানু আবি দাউদ*: ১৫২৪

www.banglakitab.weebly.com

দারস ৪

চারটি বুনিয়াদি বিষয় :

ই'লাম রাহিমাকাল্লাহর পর লেখক বলেছেন,

أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعُ مَسَايِلَ: اَلْأُوْلَى : اَلْعِلْمُ. وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّه، وَمَعْرِفَةُ دِيْنِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ.. اَلثَّانِيَةُ: اَلْعَمَلُ بِه . اَلثَّالِثَةُ : اَلدَّعْوَةُ إِلَيْهِ. اَلرَّابِعَةُ : اَلصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيْهِ.

'চারটি বিষয়ে জানা আমাদের জন্য আবশ্যক।

১. ইলম। আর তা হলো, দলিল-সহকারে আল্লাহ ﷻ -কে, তাঁর নবি ﷺ এবং দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

২. সেগুলোর ওপর আমল করা।

৩. দাওয়াহ, অর্থাৎ সেদিকে মানুষকে আহ্বান করা।

৪. এসব করতে গিয়ে যে দুঃখ-কষ্ট আসে, তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ বা সবর করা।'

লেখক বলছেন চারটি বিষয়ে জানা আবশ্যক। লেখক এখনে আরবি يَجِبُ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এ চারটি বিষয়ে জানা বাধ্যতামূলক।

ওয়াজিবের সংজ্ঞা কী?

কোনো কিছু ওয়াজিব হবার অর্থ হলো, ওই কাজটি করার ব্যাপারে শক্ত নির্দেশ থাকা। কাজটি করার কারণে পুরস্কার, আর উপযুক্ত ওযর ছাড়া ছেড়ে দেবার কারণে শাস্তির প্রতিশ্রুতি থাকা। এই হলো ওয়াজিবের সংজ্ঞা।

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াজিব আর ফরয কি আলাদা?

ওয়াজিব আর ফরয কি একই নাকি আলাদা? যেটা ওয়াজিব সেটা কি ফরয? যেটা ফরয সেটা কি ওয়াজিব? এ দুটো এক, নাকি দুটো আলাদা ক্যাটাগরি? উসূলুল ফিকহের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

কথাটি ভালোভাবে শুনুন এবং মনে রাখুন, আমি এ কথাটা বারবার আপনাদের মনে করিয়ে দেবো। আবু হানিফা ﵀ ওয়াজিব বলতে যা বুঝিয়েছেন লেখক এখানে 'ওয়াজিব' বলতে সেটা বোঝাননি। লেখক ওয়াজিব বলতে বুঝিয়েছেন–বাধ্যতামূলক। ফরয। এ চারটি বিষয়ে জানা আপনার জন্য ফরয। যদিও তিনি এখানে 'ওয়াজিব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু তিনি বুঝিয়েছেন ফরয। বাংলা বা ইংলিশে ব্যাপারটা হয়তো অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না, কারণ ইংলিশে ওয়াজিব ও ফরয দুটোর অনুবাদ করা হয় obligatory, বাংলায়ও দুটোকেই 'বাধ্যতামূলক' অনুবাদ করা যায়। কিন্তু যদি ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, যদি উসূলুল ফিকহের বইগুলোতে তাকান, তাহলে দেখবেন, ওয়াজিব আর ফরয কি একই, নাকি আলাদা–এ ব্যাপারে একটা মতপার্থক্য আছে।

ইমাম শাফে'ঈ, মালিক এবং ইমাম আহমাদ ﵏-এর একটি মত অনুযায়ী, ওয়াজিব এবং ফরয এক ও অভিন্ন–দুটোর মাধ্যমেই এমন কিছুকে বোঝানো হয় যা করা বাধ্যতামূলক। পার্থক্য কেবল শাব্দিক।

দ্বিতীয় মতটি হলো ইমাম আবু হানিফার ﵀-এর। তার মত হলো, ওয়াজিব হলো আবশ্যকতা বা বাধ্যবাধকতার দিক থেকে ফরযের চেয়ে একটু নিচের স্তরের। তার মতে যদিও ওয়াজিব এবং ফরয দুটোই পালন করা আবশ্যক, তবে গুরুত্ব বা আবশ্যকতার দিক দিয়ে ওয়াজিব হলো ফরযের চেয়ে কিছুটা নিচের স্তরের।

এই হলো দুটি মত। এবার আসুন দুপক্ষের দলিল ও প্রমাণগুলোর দিকে তাকানো যাক।

যারা ওয়াজিব ও ফরযকে সমার্থক মনে করেন, তাঁদের দলিল

যারা মনে করেন ওয়াজিব ও ফরয সমার্থক তারা প্রমাণ হিসাবে সহিহুল বুখারির নিচের হাদিসটি উপস্থাপন করেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ

নাজদের এক বেদুইন চিৎকার করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। আরেকটি বর্ণনায় আছে লোকটি অস্ফুটস্বরে কথা বলতে বলতে এসেছিল। এ সময় লোকটির মাথা ছিল অনাবৃত। বেদুইনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ

www.banglakitab.weebly.com

তার প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং দ্বীনের বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলো তাকে জানালেন। তারপর বেদুইনটি প্রশ্ন করল,

هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟

আপনি আমাকে যা জানিয়েছেন এ ছাড়া কি অন্য কোনো আবশ্যক কাজ আছে? যেসব কাজ আপনি ফরয বলেছেন এর বাইরে কি আর কিছু আছে যা আমাকে করতে হবে?

নবি ﷺ জবাবে বললেন,

لا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ

না, এগুলো ছাড়া আর কিছু তোমাকে করতে হবে না। তবে তুমি বাড়তি পুরস্কারের জন্য স্বেচ্ছায় বাড়তি আমল করতে পারো।[৪৮]

যারা ওয়াজিব ও ফরয সমার্থক হবার ব্যাপারে এ হাদিসটিতে পেশ করেন তাদের পয়েন্ট হলো :

لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ الْفَرْضِ والتَّطَوُّعِ واسِطَةً، بَلْ الخَارِجُ عَنْ الفَرْضِ داخِلٌ فِي التَّطَوُّعِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে ফরয ও সুন্নাহ আমল ছাড়া মধ্যবর্তী কোনো ক্যাটাগরির কথা বলেননি। কোনগুলো ফরয, তথা বাধ্যতামূলক তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। কোনগুলো ঐচ্ছিক আমল তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ দুটোর মধ্যবর্তী কোনো ক্যাটাগরির কথা তিনি বলেননি। যদি ওয়াজিব ফরয থেকে আলাদা একটি শ্রেণি হতো, তাহলে তিনি বলতেন, এগুলো হলো বাধ্যতামূলক আমল, এগুলো হলো ওয়াজিব আর তারপর আমি তোমাকে তাতাওয়্যা' বা সুন্নাহ আমল সম্পর্কে বলব। কিন্তু তিনি এমনটি বলেননি। নবি ﷺ প্রথমে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানিয়েছেন আর তারপর বলেছেন, এগুলো ছাড়া অন্যান্য যেসব আমল আছে সেগুলো হলো সুন্নাহ। ফরয ও সুন্নতের মাঝামাঝি কিছু বিষয় আছে যেগুলো হলো ওয়াজিব—এমন কিছু নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেননি।

ওয়াজিব ও ফরয একই হবার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন,

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ.....

এই মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ আরোপ করে নিল। (সূরা বাকারাহ, ১৯৭)

এই আয়াতে ফরয ব্যবহৃত হয়েছে ওয়াজিবের কনটেক্সটে, যে কারণে তাঁরা বলেছেন যে এ

৪৮ *সহিহুল বুখারি* : ৪৬; *সহিহ মুসলিম* : ১০৯

www.banglakitab.weebly.com

দুটো একই।[৪৯]

তৃতীয় প্রমাণ হলো এই সহিহ হাদিস :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন...'

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন 'আল্লাহ বলেছেন', যখনই কোনো হাদিস শুনবেন যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আল্লাহ বলেছেন' এ কথাটি বলেছেন—বুঝে নেবেন এটি একটি হাদিসে কুদসি। এরপর হাদিসে বলা হচ্ছে :

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

'আমি যা ফরয করেছি শুধু সেগুলো আদায় করার মাধ্যমে কোনো বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না...।'

যদি ওয়াজিব পৃথক কোনো ক্যাটাগরি হতো, তাহলে এখানে তিনি ওয়াজিবের কথাও উল্লেখ করতেন। প্রথমে ফরয এবং তারপর ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করা হতো। কিন্তু এখানে ফরযের পর ওয়াজিব হিসাবে অন্য কোনো শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রথমে ফরয উল্লেখ করা হয়েছে তারপর নফল বা ঐচ্ছিক আমলগুলোর ব্যাপারে বলা হয়েছে। মাঝখানে আর কোনো ক্যাটাগরির কথা বলা হয়নি। এ প্রমাণটি প্রথম প্রমাণটির অনুরূপ।

চতুর্থ প্রমাণ হলো, বলা হয় যে যদি কেউ ফরয বা ওয়াজিব ত্যাগ করে তবে সেটা নিন্দনীয়। ফরয ও ওয়াজিব, দুটোই ছেড়ে দেয়া নিন্দনীয়। সুতরাং দুটোর আলাদা অর্থ আছে বা এ দুটো পৃথক ক্যাটাগরি এমন বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, শেষ পর্যন্ত ফলাফল একই হচ্ছে। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে—এগুলো ছেড়ে দেয়া নিন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। তাহলে যা করা বাধ্যতামূলক এবং ছেড়ে দেয়া নিন্দনীয় ও গুনাহ, সেটাকে কেন আলাদা আরেকটি ক্যাটাগরিতে ফেলতে হবে?

তাই তাঁদের মত হলো, ওয়াজিব ফরয থেকে আলাদা বা ফরয ওয়াজিব থেকে আলাদা, এমন বাড়তি কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

সুতরাং যারা এ মতের পক্ষে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরযের কথা বলার পর সরাসরি তাতাওয়্যা' বা ঐচ্ছিক

---

৪৯ *তাফসির ইবনু কাসিরে* এসেছে : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ اى : أوجب باحرامه حَجًّا এই মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ আরোপ করে নিল' এর অর্থ হলো, 'হজের ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে যে নিজের ওপর হজকে আবশ্যক করে নিল।' ইবনু জারির ﷺ বলেন, أجمعوا على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام 'ফকিহগণের ঐকমত্যে এখানে 'ফরয' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'ওয়াজিব' বোঝানো এবং গুরুত্বারোপ করা।'

www.banglakitab.weebly.com

আমলের কথা বলেছেন, মাঝখানে ওয়াজিব হিসাবে আলাদা কোনো ক্যাটাগরির কথা বলেননি। অতএব ফরয আর ওয়াজিব আলাদা কিছু না।

যারা ওয়াজিব ও ফরযকে আলাদা মনে করেন, তাঁদের দলিল :

অন্যদিকে আহনাফ বা হানাফি মাযহাবের অনুসারীগণ এবং ইমাম আহমাদ ﷺ-এর একটি মত অনুযায়ী ওয়াজিব হলো ফরয থেকে আলাদা একটি ক্যাটাগরি। ফরয একটি শ্রেণি, আর ওয়াজিব একটি আলাদা শ্রেণি। তাদের মতে ফরয হলো ওইসব কাজ যেগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সাব্যস্ত এবং যেগুলো আদায়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। ওয়াজিব হলো ঠিক এর পরের শ্রেণিটি।

তাদের মতের পক্ষে উপস্থাপিত প্রমাণটি যতটা না নস-ভিত্তিক তার চেয়ে বেশি ভাষাতাত্ত্বিক। যারা আরবি ভাষা শেখেন তারা জানেন যে, অনেক সময় কোনো শব্দের শাব্দিক বা আক্ষরিক অর্থের সাথে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত অর্থের পার্থক্য হয়।

একটা উদাহরণ দিলে সহজে বুঝতে পারবেন। ইসলাম শব্দটি দেখুন। আরবি অভিধান অনুযায়ী ইসলাম শব্দের, এর মূলের অর্থ কী? ভাষাতাত্ত্বিক বা লিঙ্গুইস্টিক দিক থেকে ইসলাম শব্দটির সংজ্ঞা কী? দেখবেন এর অর্থ দেয়া আছে–সমর্পণ, আনুগত্য করা, বিনীত হওয়া। যে সমর্পণ করে শাব্দিকভাবে আপনি তাকে মুসলিম বলতে পারেন। যে বিনীত, যে নির্দেশের আনুগত্য করে–আপনি তাকে শাব্দিকভাবে মুসলিম বলতে পারেন। ইসলাম যে মূল থেকে এসেছে সেটা অনুযায়ী এই হলো ইসলামের শাব্দিক সংজ্ঞা। কিন্তু যখন দ্বীনের প্রেক্ষাপট থেকে দেখবেন, তখন সংজ্ঞাটি ভিন্ন হবে। যেমন : দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে,

الْاسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ، وَالْانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْخُلُوْصُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

তাওহিদের সাথে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করা, সম্পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর আনুগত্যে প্রবেশ করা, শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাই হলো ইসলাম।

হ্যাঁ, এই অর্থের মধ্যে মূল শব্দের কিছু অর্থ এসেছে, কিন্তু দ্বীনের বা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে বুঝতে হলে এই সম্পূর্ণ সংজ্ঞাকে গ্রহণ করতে হবে। তো ফরয ও ওয়াজিবের শাব্দিক অর্থের মধ্যে যে হালকা পার্থক্য আছে তার ওপর ভিত্তি করে হানাফি মাযহাবের অনুসারীরা এ দুটোকে দুটো আলাদা শ্রেণি মনে করেন।

আবু যাইদ আদ-দাব্বুসি বলেছেন, শাব্দিকভাবে ফরয অর্থ হলো কোনো কিছু পরিমাপ করা, অথবা এমন কিছু যা সুনির্দিষ্ট। যদি কোনো কিছু সুনির্দিষ্ট হয় তবে সেটা ফরয। ফরয হলো এমন কিছু যা পরিমাপ করা হয়, যা সুনির্দিষ্ট। অন্যদিকে ওয়াজিব দ্বারা বোঝানো হয় সুকুত (سقوط) বা পতিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ আক্ষরিক অর্থে এটা ব্যবহার করেছেন :

www.banglakitab.weebly.com

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا.....

এরপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়...। (সূরা আল-হজ, ৩৬)

আরবিতে বলা হয় :

وجبة الحائط

দেয়ালটা পড়ে গেল।

আবু যাইদ আদ-দাব্বুসি বলছেন, যা কিছু দৃঢ়, যা কিছুর পক্ষে দৃঢ়, অকাট্য প্রমাণ আছে, আমরা সেটাকে ফরয ধরে নেব। আর অন্যান্য দায়িত্ব বা কাজ, যেগুলো বাধ্যতামূলক, কিন্তু সেগুলোর বাধ্যতামূলক হবার প্রমাণ তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী, আমরা সেগুলোকে ওয়াজিব হিসাবে গ্রহণ করব। তাঁরা এ পার্থক্যটুকু করেছেন কারণ সুকুত অর্থ–ফেলে দেওয়া, পতিত হওয়া। এ কারণে তারা এটাকে আলাদা একটি ক্যাটাগরি ধরেছেন। তো এভাবে তারা ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

সুতরাং আমরা দেখলাম, হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের মতে ফরয ও ওয়াজিব দুটো আলাদা ক্যাটাগরি। তবে কোনগুলো ফরয আর কোনগুলো ওয়াজিব–এই শ্রেণিবিভাগ কীভাবে করা হবে–এই ব্যাপারে আবার তাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য আছে।

হানাফিদের মধ্যে এক দল বলেছেন কাত'ঈ (قطعي) দলিলের মাধ্যমে যা সাব্যস্ত বা প্রমাণিত সেটা ফরয। কাত'ঈ হলো এমন দলিল যা অত্যন্ত শক্ত, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট–যেমন কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো সহিহ্ মুতওয়াতির হাদিস যার অর্থ পরিষ্কার। যদি কোনো নির্দেশ এ ধরনের দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটা ফরয। কিন্তু যদি কোনো বাধ্যতামূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রমাণ কাত'ঈ না হয় বা এতটা শক্ত না হয়, তবে সেটাকে আবশ্যক মনে করা হবে তবে ফরয না, ওয়াজিব ধরা হবে। সুতরাং যেগুলো যন্নি দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত সেগুলো হলো ওয়াজিব। এখানে যন্নি অর্থ এমন হাদিস যা সহিহ্ কিন্তু একাধিক বর্ণনাসূত্র দ্বারা সাব্যস্ত বা মুতওয়াতির না।

সুস্পষ্ট বা কাত'ঈ দলিল দ্বারা সাব্যস্ত নির্দেশের একটি উদাহরণ হলো এই আয়াত :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

'তোমরা সালাত কায়েম করো।' (সূরা বাকারাহ, ৪৩)

এই আয়াতের ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। এটি একটি স্পষ্ট নির্দেশ যার অর্থ পরিষ্কার। একই সাথে এটি কুরআনের একটি আয়াত তাই এখানে সনদ নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। সুতরাং সালাত আদায় করা হলো ফরয। কিন্তু যারা ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে পার্থক্য

www.banglakitab.weebly.com

করেন তাদের মতে সালাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, ফরয না। কারণ, নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পরার দলিল হলো এই হাদিসটি :

لا ص لا ةَ إِلَّا بِ فاتِ حةِ الْكِت ابِ

ফাতিহা ছাড়া কোনো সালাত নেই।

তাদের মতে যদিও এ হাদিসটি সহিহ কিন্তু প্রমাণ হিসেবে এটি যন্নি। অর্থাৎ এটা সালাত ফরয হবার দলিলের মতো অতটা শক্ত দলিল না। তাই নামাযের প্রতি রাকাতে ফাতিহা পড়া হলো ওয়াজিব, ফরয না।

আবার হানাফিদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি দলের (আল-আস্কারি) মত হলো–যা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে তা হলো ফরয। আর ওয়াজিব হলো যা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে এবং নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে। এ ছাড়া যেসব বিষয়ের দলিল নিয়ে মতপার্থক্য আছে এবং যেসব বিষয় নিয়ে অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত অর্থ নিয়ে (কুরআনের আয়াতের অর্থ নিয়ে) মতপার্থক্য আছে–সেগুলো হলো ওয়াজিব। আর যদি দলিল শক্ত হয়, অর্থ সুস্পষ্ট হয়, তাহলে সেটা ফরয।

তৃতীয় আরেকটি মত হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে আসা যেকোনো সরাসরি নির্দেশ হলো ফরয, আর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে যেকোনো সরাসরি নির্দেশ হলো ওয়াজিব। দুটোই পালন করা বাধ্যতামূলক, তবে একটি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে আরেকটি রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে। আল-ইস্রা'ঈনি–যিনি হানাফি আলিমদের একজন–বলেছেন, ফরয হলো এমন কিছু যার ফরয হবার ব্যাপারে ইজমা আছে, কোনো মতপার্থক্য নেই। আর ওয়াজিব হলো এমন কিছু যার ফরয হবার ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে।

সুতরাং কোনটা ফরয আর কোনটা ওয়াজিব এ নিয়ে আহনাফের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে।

এ মতপার্থক্যের ফল কী?

এ মতপার্থক্যের ফল হলো, হানাফিদের মতে যে ব্যক্তি কোনো ফরযকে অস্বীকার করে সে কুফর করেছে। সে এমন কিছু অস্বীকার করেছে যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য হিসেবে প্রমাণিত। কিন্তু যে কোনো ওয়াজিব অস্বীকার করে সে কুফর করেনি, কারণ ওয়াজিবের দলিল ফরযের মতো অতটা শক্ত না। কাজেই যে হজের সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান অথবা মহিলাদের জন্য হিজাব করার বিধান অস্বীকার করবে সে কুফর করেছে। কারণ, এগুলো হলো ফরয। অন্যদিকে যেহেতু তাদের মতে বিতরের নামায বা হজের সময় সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ই করা বা দৌড়ানো হলো ওয়াজিব, তাই কেউ যদি এগুলোকে অস্বীকার করে তাহলে সেটা কুফর হিসেবে গণ্য হবে না। যেহেতু এগুলোর আবশ্যক হবার ব্যাপারে

www.banglakitab.weebly.com

প্রমাণ ফরযের মতো অতটা শক্ত না। অর্থাৎ তাদের মতানুযায়ী ওয়াজিব অস্বীকার করা কুফর না।[৫০] আর কেউ যদি ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয় কিন্তু সেটার ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করে, তবে সেটা হলো ফিসক।

সুতরাং হানাফিদের মত হলো ওয়াজিব অস্বীকার করা কুফর না, তবে ফরয অস্বীকার করা কুফর। কারণ, ফরয সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ওয়াজিব যদিও বাধ্যতামূলক কিন্তু ওয়াজিবের প্রমাণ ফরযের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে কম শক্তিশালী। এটা হলো ওয়াজিব ও ফরয বিষয়ে মতপার্থক্যের প্রথম ফলাফল।

দ্বিতীয় ফল হলো, হানাফিদের মতে ওয়াজিবের তুলনায় ফরয পালন করার পুরস্কার বেশি, যেহেতু ফরয ওয়াজিবের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের।

তৃতীয় ফলাফলটা উদাহরণ দিয়ে বোঝা সহজ হবে। অধিকাংশ আলিমের–অর্থাৎ যারা প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত–তাদের মত হলো সুজুদুত তিলাওয়াহ, অর্থাৎ তিলাওয়াতের সময় সিজদাহর কোনো আয়াত এলে সিজদাহ করা হলো সুন্নাহ। ওয়াজিব বা ফরয না। কারণ, এক জুমুআয় উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ মিম্বারে দাঁড়িয়ে সূরা আন-নাহল পড়ছিলেন। যখন সূরা আন-নাহলের সিজদাহর আয়াতে পৌঁছালেন তিনি মিম্বার থেকে নেমে সিজদাহ করলেন। পরের জুমুআয়, তিনি সূরা আস-সাজদাহ পড়লেন। সূরা আস-সাজদাহতেও একটি সিজদাহর আয়াত আছে। যখন সেই সিজদাহর আয়াতে পৌঁছালেন তিনি বললেন, হে লোকসকল, আমরা সিজদার আয়াতসমূহ অতিক্রম করি, এ সময় যে সিজদাহ করে সে ঠিক, আর যে সিজদাহ করে না সেও ঠিক। আর তারপর উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ সিজদাহ করলেন না। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ এ বর্ণনার পর একটি মন্তব্য যোগ করেছেন–আল্লাহ ﷻ তোমাদের ওপর তিলাওয়াতের সিজদাহ ফরয করেননি।

কোনো কিছু যদি ফরয না হয়, তাহলে সেটা কী? অধিকাংশ আলিমের মতে যদি কোনো কিছু ফরয না হয়, অর্থাৎ বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে সেটা সুন্নাহ। যেহেতু তাদের মতে ফরয আর ওয়াজিব একই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হানাফিদের মত হলো, যেহেতু সেটা ফরয না তাই সেটা ওয়াজিব গণ্য হবে। যেহেতু তাঁরা ফরয আর ওয়াজিবকে দুটো আলাদা শ্রেণি বিবেচনা করেন। ফরযের পরে আসে ওয়াজিব আর তারপর আসে সুন্নাহ। তারা এটাকে তাদের দ্বিতীয়

---

৫০ 'ওয়াজিব অস্বীকার কুফর না' – এটা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য না যে, ওয়াজিব বিধান অস্বীকার করা কুফর না। বরং এর দ্বারা আহনাফের উদ্দেশ্য হয়, ওয়াজিবের উজুবাত বা আবশ্যিকতা অস্বীকার করা কুফর না। যেমন কুরবানির বিধান আহনাফের নিকট ওয়াজিব, কিন্তু হানাবিলাদের নিকট সুন্নাহ। হানাবিলা এর উজুবাত তথা ওয়াজিব হবার বিষয়টি অস্বীকার করেন, কিন্তু বিধানটি অস্বীকার করেন না। তাঁরা একে সুন্নাহ গণ্য করেন। কিন্তু কেউ যদি সত্তাগতভাবে ওই বিধানটিকেই অস্বীকার করে, তাহলে অবশ্যই তা কুফর বলে গণ্য হবে। কারণ আহনাফসহ আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, যরুরিয়্যাতুম মিনাদ দীন তথা দীনের অত্যাবশ্যকীয় কোন বিধান অস্বীকার করা কুফর। সেটা হতে পারে ফরয, হতে পারে ওয়াজিব, অথবা হতে পারে কোন প্রমাণিত সুন্নাহ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি ﵀ এর 'ইকফারুল মুলহিদিন' গ্রন্থটি অধ্যায়ন করা যেতে পারে।

www.banglakitab.weebly.com

শ্রেণিতে স্থান দিয়েছেন–অর্থাৎ ওয়াজিব গণ্য করেছেন। আর জুমহুর উলামা এটাকে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্থান দিলেও তাঁদের জুমহুর উলামার মত হলো ফরযের পর দ্বিতীয় শ্রেণি হলো সুন্নাহ। সুতরাং হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের মত অনুযায়ী তিলাওয়াতের সিজদাহ হলো ওয়াজিব, আর জুমহুর উলামার মত হলো এটা সুন্নাহ। অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজিবকে দুটো পৃথক শ্রেণি গণ্য করার কারণে পার্থক্য হচ্ছে শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে। প্রথম দল যেহেতু ফরয ও ওয়াজিবকে একই মনে করেন তাই তারা বলেন, ইবনু উমার ﷺ বলেছেন এটা ফরয না, তার অর্থ এটা ওয়াজিবও না; কারণ এ দুটো একই। তাই তিলাওয়াতের সিজদাহ হলো সুন্নাহ। আর হানাফিরা মনে করেন এটা ফরয না, তবে সুন্নাহও না; বরং ওয়াজিব।

কুরবানির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। হানাফি আলিমগণের মত হলো কুরবানি করা ওয়াজিব, আর অন্যান্য ইমামগণের মত হলো কুরবানি করা সুন্নাহ। একইভাবে হানাফি আলিমগণের মতে ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে বিতরের নামায পড়া ওয়াজিব। তাদের মতে বিতরের নামায না পড়া গুনাহর কাজ এবং যে বিতরের নামায পড়ে না সে ফাসিক হিসাবে গণ্য হবে। জুমহুরের মত হলো বিতরের নামায হলো সুন্নাহ।

এই পুরো মতপার্থক্যের উপসংহার অত্যন্ত সোজা এবং পরিষ্কার। যদি এক লাইনে উত্তর চান, তাহলে এ ব্যাপারে অধিকতর উপযুক্ত মত হলো–ফরয আর ওয়াজিব এক ও অভিন্ন। অধিকাংশ আলিম এ মতটি গ্রহণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তারা নস-ভিত্তিক প্রমাণ–যেমন হাদিস–উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে যারা এ দুটো পৃথক হবার মত গ্রহণ করেছেন তারা ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞার আলোকে এ অবস্থান নিয়েছেন। এ দু-ধরনের প্রমাণের মধ্যে তুলনা করলে প্রথম মতের পক্ষে পাল্লা ভারী হবে। দ্বিতীয়ত, প্রথম মত অধিকতর সঠিক কারণ ফরয ও ওয়াজিব এই অর্থে এক যে, এগুলো করা বাধ্যতামূলক এবং উপযুক্ত ওযর ছাড়া এগুলো ছেড়ে দেয়া গুনাহ। সুতরাং সংজ্ঞার দিক থেকে দুটো প্রায় একই, যার কারণে প্রথম অবস্থানকে অধিকতর শক্ত মনে হয়।

ইসলামি জ্ঞানের শাখাগুলো পরস্পর সংযুক্ত :

লক্ষ করুন, তাওহিদ নিয়ে শেখার সময় আমরা তাওহিদের পাশাপাশি এ রকম বিষয় নিয়েও শিখছি। এই আলোচনাগুলো তাওহিদের বইগুলোতে নেই, উসুলুল ফিকহের বইয়ে আছে। কারণ, এগুলো হলো উসুলের আলোচনা। কিন্তু আমরা এ আলোচনা আনছি যাতে করে লেখক (يجب) বলে কী বুঝিয়েছেন সেটা আমরা বুঝতে পারি। ইয়াজিবু বলতে লেখক কি ফরয বুঝিয়েছেন, নাকি আবু হানিফা ﷺ যেমনটা বলেছেন সে রকম ফরযের চেয়ে একটু নিচের একটি শ্রেণি বুঝিয়েছেন? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার জন্য এবং লেখক এখানে কী বোঝাচ্ছেন তা বোঝার জন্য আমরা উসুলের সাহায্য নিচ্ছি। অর্থাৎ তাওহিদ ও আকিদাহর বিষয়কে বোঝার জন্য আমাদের উসুলের সাহায্য নিতে হচ্ছে। একইভাবে কখনো কখনো

www.banglakitab.weebly.com

আমরা হাদিস নিয়ে আলোচনা করব। এমন অনেক হাদিস আছে যেগুলো ব্যাপকভাবে পরিচিত কিন্তু কিছু কিছু আলিম সেগুলোকে যইফ মনে করেন। সামনের আলোচনাগুলোতে যখন এমন কোনো হাদিস আসবে তখন আমরা ওই হাদিসটি কেন যইফ বা কেন সহিহ, সেটা নিয়েও আলোচনা করব। এটাকে বলা হয় মুস্তালাহ (مصطلح)। যদিও আমাদের মূল আলোচনা তাওহিদ নিয়ে, কিন্তু আমরা এখানে মুস্তালাহ এবং হাদিস নিয়েও আলোচনা করব। আর তারপর আমাদের আলোচনার বড় একটা অংশজুড়ে থাকবে তাফসির। এ ছাড়া অন্যান্য আরও বিষয়ও আমাদের আলোচনায় আসবে।

কখনো কখনো নাহুর পরিভাষাগুলো ভেঙে ভেঙে আলোচনা করতে হয়। যেমনটা প্রথমদিকে আমরা 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম' নিয়ে করেছি। তাই যদিও আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো তাওহিদ, কিন্তু ইসলামে ইলমের শাখাগুলো পরস্পর সংযুক্ত। আর এটা হলো ইসলামি জ্ঞানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

লেখক ওয়াজিব বলতে কী বুঝিয়েছেন?

ওয়াজিব ও ফরযের বিষয়টি আমরা কেন আনলাম? কারণ, এখানে লেখক বলছেন– ইয়াজিবু–আপনাকে অবশ্যই চারটি বিষয় জানতে হবে। আমরা জানি ইমাম আবু হানিফা ﷺ ওয়াজিবকে ফরযের চেয়ে কিছুটা নিচের ক্যাটাগরি ধরেছেন–এখানে লেখকও কি এই অর্থে ওয়াজিব বলেছেন? না, এখানে তিনি ওয়াজিব বলতে ফরয বুঝিয়েছেন। এখানে ইয়াজিবু শব্দটির বদলে ইয়াফরাদু (يفرض) বসালেও একই অর্থ হবে। এখানে তিনি অন্য তিন ইমামের মত অনুযায়ী ওয়াজিব বলতে ফরযকেই বোঝাচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমাদের জন্য এ ৪টি বিষয় সম্পর্কে জানা বাধ্যতামূলক। এগুলো জানা ফরয। নারী, পুরুষ, দাস, মুক্ত–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহয় বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলিমকে ৪টি বিষয় সম্পর্কে জানতেই হবে। এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ ও গভীরভাবে অনুধাবন করা, আত্মস্থ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।

আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান :

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞানের তিনটি ধরন আছে :

১. ই'তিকাদ

২. ফি'ইল এবং

৩. তারক[৫১]

৫১ এটি একটি পরিভাষাগত ব্যাপার। এখানে ই'তিকাদ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদাহ, ফি'ইল দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ ﷻ-এর আদেশসমূহ সুন্নাহসম্মত উপায়ে আমল করা এবং তারক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ বর্জন করা।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন তা হলো বিশ্বাস, কাজ এবং ত্যাগ করা। কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ওপর আপনার বিশ্বাস আনতে হবে। কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ওপর আপনার আমল করতে হবে। আর কিছু বিষয় এমন আছে যেগুলো ত্যাগ করতে হবে, যেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে আপনার জ্ঞান হয় 'ইলম আইনি' (অর্থাৎ ফারযুল আইন) অথবা ইলম কিফায়ি। অর্থাৎ এ তিন ধরনের জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আপনার আচরণ হয় ফারযুল আইন হবে অথবা ফারযুল কিফায়াহ হবে।

ফারযুল আইন :

ফারযুল আইন হলো এমন কিছু যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযান মাসের রোযা–এগুলো ফারযুল আইন। প্রত্যেক মুসলিমকে এগুলো পালন করতেই হবে।

ফারযুল কিফায়াহ :

ফরযের অন্য শ্রেণিটি অন্যটি হলো ফারযুল কিফায়াহ বা সামষ্টিক দায়িত্ব। এটি হলো এমন ফরয, যা যথেষ্ট-সংখ্যক মানুষ পালন করলে বাকিদের ওপর আর তা পালন করার বাধ্যবাধকতা থাকে না। এ দায়িত্বগুলো পালন করা সামষ্টিকভাবে মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক না। অর্থাৎ ফারযুল কিফায়াহ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয না, বরং সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরয। যেমন : মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া। অথবা ধরুন কোনো সমুদ্রের পাড়ে আমরা ১০ জন দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় আমরা দেখতে পেলাম একজন মানুষ পানিতে ডুবে যাচ্ছে। আমাদের সামর্থ্য আছে তাকে বাঁচানোর। এ অবস্থায় মানুষটিকে উদ্ধার করা আমাদের সবার ওপর দায়িত্ব, কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে থেকে দুজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে, তাহলে সেটাই যথেষ্ট। এতেই সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। তবে ওই দুজন সক্ষম ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করতে না গেলে আমাদের দশজনেরই গুনাহ হবে। এটা হলো ফারযুল কিফায়াহ। এটা আলাদা আলাদাভাবে আবদুল্লাহ, উমার, মুহাম্মাদ কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে না। বরং চাওয়া হচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে কাজটা পালন করতে হবে। অন্যদিকে ফারযুল আইন পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। যদি একদল মুসলিম আসরের নামায আদায় করে, তাহলে বাকি মুসলিমরা কিন্তু আসরের নামায পড়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না। প্রত্যেক মুসলিমকেই আসরের নামায পড়তে হবে।

সামষ্টিক কর্তব্য বা ফারযুল কিফায়াহর ক্ষেত্রে কিছু লোক পালন করলে বাকি সবার জন্য যথেষ্ট হবে। অন্যদিকে যদি কেউই কর্তব্য পালন না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে। ফারযুল

www.banglakitab.weebly.com

কিফায়াহর ক্ষেত্রে দায়িত্বগুলো সম্পূর্ণভাবে পালন করতে হবে। নিজ অক্ষমতার কারণে কেউ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে না পারলে, তার এবং আমাদের দায়িত্ব হবে অন্যান্যদের এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। যাতে করে আমাদের সবার গুনাহর ভাগীদার হতে না হয়। একটু আগের উদাহরণটির কথা চিন্তা করুন। সমুদ্রপাড়ে আমরা দশজন আছি। একজন মানুষ ডুবে যাচ্ছে। ধরুন আমরা কেউই সাঁতার পারি না। আমরা তাকে উদ্ধার করতে পারছি না। এ অবস্থায় আমাদের দায়িত্ব হবে সাঁতার পারে এমন কাউকে খুঁজে বের করা এবং তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে আমরা সবাইকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারি।

ইলম, আমল, বিরত থাকা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে ফারযুল আইন :

আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারে ফারযুল আইন

এখন দেখা যাক ইলমের ক্ষেত্রে কোনগুলো ফারযুল আইন। ইলমের ক্ষেত্রে ফারযুল আইন হলো ওই জ্ঞান যা ছাড়া দ্বীন সম্পূর্ণ হয় না এবং দ্বীন পালন করা যায় না। যে জ্ঞান ছাড়া দ্বীন পূর্ণ হয় না এবং দ্বীন পালন করা যায় না, সেই জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। এটা হতে পারে আকিদাহ, আমল অথবা কোনো কথার ব্যাপারে জ্ঞান। যে জ্ঞান না থাকলে দ্বীনের আবশ্যক বিষয়ে, আপনার বিশ্বাস, আমল কিংবা কথা অসম্পূর্ণ থাকবে–সেই জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক, ফারযুল আইন। ব্যক্তিগতভাবে এ জ্ঞান খুঁজে বের করতে ও শিখতে আপনি বাধ্য। এখানে লেখক বলছেন : يَجِب عَلَيْنَا তার এ বক্তব্যের অর্থ হলো, আপনাকে করতেই হবে, জানতেই হবে। এটা ফারযুল আইন।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই এ ব্যাপারগুলো জানতে হবে। এখানে কোনো ছাড় নেই। এগুলো জানা প্রত্যেকের ওপর ফারযুল আইন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়–কিছু জ্ঞান এমন আছে ব্যক্তিভেদে যেগুলো সম্পর্কে জানার আবশ্যকতার তারতম্য হয়। অর্থাৎ এগুলো জানা কিছু মানুষের জন্য আবশ্যক, আবার কিছু মানুষের জন্য আবশ্যক না। কারণ, মানুষের মধ্যেও তারতম্য আছে। তবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা, কিছু নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এগুলোর বাইরে আরও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যেগুলোর ব্যাপারে পার্থক্য আছে। ইবনু আব্দিল বার ﷺ তাঁর *জামিয়ু বায়ানিল ইলম* কিতাবে এবং ইবনু কুদামা ﷺ ও অন্যান্য আলিমগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আমি এটা নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করছি, যাতে করে আপনাদের জন্য বোঝা সহজ হয়। আলিমগণ বলেছেন, এ ব্যাপারে ইজমা আছে যে কিছু জ্ঞান অর্জন করা ফারযুল আইন আর কিছু জ্ঞান হলো ফারযুল কিফায়াহ। অর্থাৎ জ্ঞান দু-ধরনের। সব জ্ঞান অর্জন ফারযুল আইন না আর সব জ্ঞান ফারযুল কিফায়াহ না, এই ব্যাপারে ইজমা আছে।

পবিত্রতা অর্জন, ওযু, তাহারাহ এবং নামায–আপনাকে অবশ্যই এ আমলগুলো সম্পর্কে

www.banglakitab.weebly.com

জ্ঞান রাখতে হবে। যদি রমাদ্বান পর্যন্ত আপনার হায়াত থাকে, যদি আপনি রমাদ্বান মাসে বেঁচে থাকেন তবে আপনাকে অবশ্যই রমাদ্বান সম্পর্কে, রোযা ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে, ফজরের আগ থেকে মাগরিব পর্যন্ত কী কী করতে হবে–এগুলো জানতে হবে। এগুলো জানা আপনার জন্য বাধ্যতামূলক। একইভাবে একজন নারীর জন্য মাসিক চক্রের (menstrual cycle) সাথে সম্পর্কিত শারীয়াহর নিয়মগুলো জানা ফারযুল আইন, কারণ এর ওপর তার নামায ও রোযা কবুল হবার বিষয়টি নির্ভর করে। কখন নামায পড়তে পারবেন, কখন পারবেন না, কীভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়–এগুলো একজন নারীকে জানতে হবে। আবার একজন পুরুষের জন্য মাসিক চক্র সম্পর্কিত নিয়মকানুন, আহকাম জানা আবশ্যক না। তবে যদি তার স্ত্রীর এ ব্যাপারে জানার আর কোনো উপায় না থাকে, তিনিই তার স্ত্রীর জানার একমাত্র মাধ্যম হন, সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে জানা সেই পুরুষের ওপর আবশ্যক। যেহেতু তিনি তার স্ত্রীর অভিভাবক। এমন ক্ষেত্রে হয় তিনি নিজে জেনে তার স্ত্রীকে জানাবেন অথবা তার স্ত্রীকে ইলমসম্পন্ন এমন কারও কাছে নিয়ে যাবেন যিনি তার স্ত্রীকে বিষয়গুলো জানাতে পারবেন। সাধারণত একজন পুরুষের এ বিষয়গুলো জানার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে ওই পুরুষকে এসব বিষয়ে জানতে হবে। তার জন্য ফারযুল আইন হলো, সে নিজে এটা জেনে তাদের জানাবে অথবা তাদের এমন কোথাও নিয়ে যাবে যেখানে তারা এটা জানতে পারবে। অথবা সে তাদের এ বিষয়ে জানার উদ্দেশ্যে কোথাও যাবার অনুমতি দেবে। বুঝতে পারছেন কীভাবে আবশ্যকতার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়?

একইভাবে যদি আপনার সম্পদ থাকে, তাহলে আপনার যাকাতের হুকুম-আহকাম জানতে হবে। যদি আপনার সম্পদ না থাকে, তাহলে যাকাত সম্পর্কে জানা আপনার জন্য আবশ্যক না। হ্যাঁ, আপনি যদি জেনে রাখেন তাহলে সেটা উত্তম। কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করছি কোনটা ফারযুল আইন, সেটা নিয়ে। যদি সক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকে, তাহলে আপনাকে হজ্জ সম্পর্কে জানতে হবে। যদি আপনার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে কতটুক সম্পদ ও শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে হজ ফরয না, শুধু এটুকু জানলেই আপনার চলছে।

বিরত থাকার ক্ষেত্রে ফারযুল আইন

একইভাবে কোন কোন বিষয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক, এ সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ফারযুল আইন আছে। একজন অন্ধ ব্যক্তির এটা জানার দরকার নেই যে কোন কোন জিনিসের দিকে তাকানো হারাম। কী কী শোনা হারাম, সেটা একজন বধির ব্যক্তির জানার দরকার নেই। কিন্তু আপনি-আমি, যাদের দৃষ্টিশক্তি আছে, শ্রবণশক্তি আছে, তাদের জন্য ব্যাপারটা আলাদা। যেহেতু আমাদের শ্রবণশক্তি আছে, তাই কী শোনা হারাম সেটা আমাদের জানতে হবে। কী কী শোনা হারাম সেটা জানা প্রত্যেক শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মুসলিমের জন্য ফারযুল আইন। যিনা হারাম, এটা জানা প্রত্যেকে মুসলিমের ওপর ফারযুল আইন। সুদ, মদ, শূকরের গোশত, যুলুম–এগুলো হারাম এটা জানা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফারযুল আইন। আরেকজন

www.banglakitab.weebly.com

মুসলিমকে হত্যা করা কিংবা অত্যাচার হারাম এটা জানা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফারযুল আইন। প্রতিটি মুসলিমের এ বিষয়গুলোতে পতিত হবার আশঙ্কা আছে, তাই এগুলো সম্পর্কে জানা ফারযুল আইন। যাতে করে তারা এগুলো এড়িয়ে যেতে পারে।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ফারযুল আইন

কোন বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করা ফারযুল আইন তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো, আমরা এখানে যা যা নিয়ে আলোচনা করছি। এ চারটি বিষয় নিয়ে জানা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফারযুল আইন। ঈমানের বিষয়গুলো, আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাব, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, জান্নাত ও জাহান্নাম–এ বিষয়গুলোর ওপর সবাইকে ঈমান আনতে হবে। বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতেই হবে। আপনি বাধ্য এগুলো জানতে। যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে তাকে ইসলামের ওই বিষয়গুলো জানতে হবে যেগুলো সন্দেহ দূর করে। কারণ, ইসলামে বিশ্বাসের একটি অংশ হলো কোনো সন্দেহ ছাড়াই ইসলামের ওপর বিশ্বাস আনা। যদি কেউ এমন কোনো দেশে থাকে যেখানে ব্যাপকভাবে বড় ধরনের বিদআহ প্রচলিত, তাহলে সেই বিদআহর ব্যাপারে তাকে অবশ্যই জানতে হবে। যাতে করে সে ওই বিদআহ এড়িয়ে চলতে পারে এবং নিজেকে এ থেকে রক্ষা করতে পারে।

সুতরাং জানার ব্যাপারে ফারযুল আইন হলো ওই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা যা ছাড়া ব্যক্তির ঈমান, ইবাদত, আমল এবং কথা সঠিক ও শারীয়াহ-সম্মত হবে না। যদি এমন কোনো বিষয় আপনার জানা না থাকে, তাহলে সেটা জানা আপনার জন্য ফারযুল আইন।

চারটি আবশ্যক বিষয়

লেখক বলছেন,

أَرْبَعُ مَسَائِلَ

এমন চারটি বিষয় আছে যেগুলো জানা আপনার জন্য ফরয। ফরয বলতে এখানে তিনি ফারযুল আইন বোঝাচ্ছেন। এ বিষয়গুলোর আলোচনা দিয়ে লেখক তার পুস্তিকা শুরু করেছেন। এ চারটি বিষয় হলো আপনার সম্পূর্ণ দ্বীন। আর এগুলোর অসাধারণ উপকারিতার কারণেই এগুলোর সম্পর্কে গভীর মনোযোগ দেয়া উচিত।

লেখক তার পুস্তিকাতে প্রথমে এ চারটি বুনিয়াদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর তিনটি মূলনীতির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এখন আমরা এ চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের আলোচনা করব।

www.banglakitab.weebly.com

এ চারটি বিষয়ের প্রথম হলো ইলম। আর এ ইলমের তিনটি অংশ আছে। লেখক বলছেন,

مَعْرِفَةُ اللهِ ومَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، ومَعْرِفَةُ دِينِ الْاسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ

দলিল-প্রমাণসহকারে আল্লাহ ﷻ-এর পরিচয় লাভ করা, তাঁর নবির পরিচয় লাভ করা এবং দ্বীনুল ইসলামের পরিচয় লাভ করা।

সুতরাং এখানে বেশ কিছু বিষয়ের আলোচনা আছে। মনোযোগ না দিলে এখানে খেই হারিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা মূল পুস্তিকা একবার পড়ে নেন। তাহলে লেখক কীভাবে বিভিন্নভাগে বইকে সাজিয়েছেন তা নিয়ে একটা ধারণা পাবেন। আপনি এটাও বুঝতে পারবেন যে, লেখক কিছু কিছু কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এ কারণে কিছু বিষয়ের ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আর অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। কোনো বই ব্যাখ্যা করার সময় বা কোনো বই পড়ে লেখকের বক্তব্য বোঝার জন্য লেখকের তৈরি করা কাঠামো ও বিন্যাস অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা ভালো, এতে করে সম্পূর্ণ ফায়দা নেয়া সম্ভব হয়।

চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের মধ্যে তিনি প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন তা হলো ইলম। তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই ইলম হলো আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে জ্ঞান এবং দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান। ইলমকে তিনি এ তিনটি অংশে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আর উসুল আস-সালাসাহর মূল আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ তিনটি মূলনীতিও এ তিনটি বিষয় নিয়েই।

মাসআলার সংজ্ঞা :

লেখক বলছেন, এখানে চারটি বিষয় আছে। আরবিতে বললে, চারটি মাসআলা আছে। অর্থাৎ চারটি ইস্যু, চারটি বিষয়, চারটি জিনিস আছে। আরবিতে মাসআলার সংজ্ঞা হলো, এমন কিছু যার জন্য দলিল বা প্রমাণ খোঁজা হয়।

المسألة هى ما يبحث عن برهانها أو دليلها

লেখক এখানে চারটি মাসায়িলের কথা বলেছেন। প্রথমটি হলো ইলম। দ্বিতীয়টি আমল। তৃতীয় মাসআলা হলো দাওয়াহ, চতুর্থটি হলো সবর। এই হলো ওই চারটি বুনিয়াদি বিষয় যেগুলোর ব্যাপারে লেখক বলছেন, এগুলো খোঁজা, অনুসরণ করা এবং যুক্তি-প্রমাণসহ এগুলোর ব্যাপারে জানা আবশ্যক।

'ইলম' এর সংজ্ঞার আলোচনায় আমরা বলেছিলাম–জ্ঞান বা ইলম হলো কোনো কিছুর প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা। এখানে লেখক জ্ঞানকে একটু অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত

www.banglakitab.weebly.com

করেছেন। তিনি বলছেন, জ্ঞান হলো আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে জানা।

তাহলে আসুন এ বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

প্রথম বুনিয়াদি বিষয়–ইলম :

আল্লাহ ﷻ-কে জানা

ইলমের প্রথম অংশ হলো আল্লাহ ﷻ-কে জানা। আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে জানার অর্থ হলো সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জানা এবং তাঁর ব্যাপারে সচেতন হওয়া। এ জ্ঞান ও সচেতনার কারণেই ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ মেনে নেয়। যা কিছু আপনাকে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আত্মসমর্পণে, তাঁর নাযিলকৃত আইন, বিধিবিধান ও হুকুম মেনে নিতে এবং এগুলোর আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করে, বাধ্য করে–তা এই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এ হলো স্বীয় প্রতিপালকের ব্যাপারে জ্ঞান যা অর্জিত হয় আল্লাহ ﷻ-এর নিদর্শন ও কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে। এগুলোই এ জ্ঞানের উৎস। এ জ্ঞান অর্জিত হয় কুরআন, হাদিস এবং সৃষ্টিসমূহের মাঝে থাকা আল্লাহ ﷻ-এর নিদর্শনগুলো থেকে।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

> সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য জমিনে অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর (নিদর্শন আছে) তোমাদের মাঝেও, তবুও তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (সূরা আয-যারিয়াত, ২০-২১)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, 'তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?'

তো এগুলো হলো চিহ্ন ও নিদর্শন যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-কে জানা যায়। আমরা এগুলো পাই কুরআনে, হাদিসে এবং আল্লাহ ﷻ-এর সৃষ্টিজগৎ থেকে।

মা'রিফাতুল্লাহ

আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ এ জ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মা'রিফাতুল্লাহ দু-ধরনের হয়ে থাকে। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান এবং তাঁর নির্ধারিত হালাল ও হারামের ব্যাপারে জ্ঞান।

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জানার অর্থ তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানা। আল্লাহ ﷻ-কে জানার অর্থ আপনার ওপর আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া। মা'রিফাতুল্লাহর অর্থ হলো এটা জানা যে সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞান সর্বোচ্চ,

www.banglakitab.weebly.com

সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁকে জানার অর্থ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তাঁকে জানার অর্থ ওই ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যার মাধ্যমে এ মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এ সবই আল্লাহকে জানার অংশ, মা'রিফাতুল্লাহর অংশ। আল্লাহ ﷻ-কে জানার অর্থ তাঁর পবিত্র নামসমূহ সম্পর্কে জানা, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা, সেগুলোর অর্থ অনুধাবন করা এবং সেগুলোর যা আবশ্যক করে তা মেনে চলা। যে জ্ঞান অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর ভয় সৃষ্টি করে তা হলো মা'রিফাতুল্লাহ। আল্লাহ ﷻ-এর সম্মান সম্পর্কে অবগত হওয়া, তাঁর প্রশংসা করা মা'রিফাতুল্লাহ।

লেখক এভাবেই মা'রিফাতুল্লাহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

মহান আলিম ও ইমাম, আশ-শা'বি ؒ-কে উদ্দেশ্য করে এক লোক বলেছিল,

أيها العالم

অর্থাৎ, হে আলিম। লোকটির বলার উদ্দেশ্য ছিল, হে শায়খ। কিন্তু তা না বলে সে বলেছিল 'হে আলিম'। তখন আশ-শা'বি ؒ বলেছিলেন, 'আল-আলিম হলো সে যে আল্লাহকে ভয় করে।'[৫২] ইলম হলো আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান যা অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর ভয় সৃষ্টি করে। মা'রিফাতুল্লাহ যেমন অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর ভয় সৃষ্টি করে তেমনি সৃষ্টি করে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ভালোবাসাও। অনেক মানুষ এ জ্ঞানের ব্যাপারে অনবহিত ও অমনোযোগী। অথচ এ জ্ঞানই দুনিয়াতে এবং আখিরাতে ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। দুই জীবনেই এই জ্ঞানের ফলাফল উত্তম।

সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন :

ما عصى الله إلا جاهل

কেবল জাহিলরাই, মূর্খরাই আল্লাহ ﷻ-এর অবাধ্য হয়।[৫৩]

এখানে তাঁরা কোন ধরনের মূর্খতার কথা বলছেন? তাঁরা কিন্তু হালাল ও হারামের ব্যাপারে অজ্ঞতার কথা বলছেন না। হুকুম-আহকাম, বিধিনিষেধের ব্যাপারে অজ্ঞতার কথা বলছেন না। এখানে তাঁরা মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতার কথা বলছেন। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে, আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত পুরস্কার আর শাস্তির ব্যাপারে অজ্ঞতার ব্যাপারে বলছেন। ওই অজ্ঞতা যার কারণে আপনি আল্লাহ ﷻ-এর জমিনকে ব্যবহার করছেন পাপ করার জন্য। আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া শক্তি আর ক্ষমতাকে পাপের জন্য কাজে লাগাচ্ছেন। সালাফরা যখন বলতেন কেবল মূর্খরাই পাপ করে–তখন তাঁরা এ ধরনের মূর্খতা ও অজ্ঞতাকে বোঝাতেন।

---

৫২ ইবনু তাইমিয়্যাহ ؒ, *মাজমু আল ফাতাওয়া* : ৩/৩৩৩
৫৩ *ইবনু তাইমিয়্যাহ, শিফাযুল আলিল* : ২/১৭

www.banglakitab.weebly.com

হালাল ও হারামের ব্যাপারে জ্ঞান

মা'রিফাতুল্লাহর অন্য অংশটি হলো হালাল ও হারামের ব্যাপারে জানা। আল্লাহকে জানার অর্থ হলো তাঁর নির্ধারিত হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানা। মাজমু আল ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডে, ৩৩৩ পৃষ্ঠার পর থেকে ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে চারটি শ্রেণি দেখা যায়।

প্রথম শ্রেণিতে হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে এবং তাঁর নির্ধারিত হারাম ও হালালের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, আর এটাই শ্রেষ্ঠ শ্রেণি। আমাদের সবার উচিত এ অবস্থানে পৌঁছার চেষ্টা করা। দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-কে চেনে কিন্তু আল্লাহ ﷻ-এর আহকামের ব্যাপারে অজ্ঞ। তৃতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-এর আহকামের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে কিন্তু আল্লাহ ﷻ-কে জানার ব্যাপারে, মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞ। আর চতুর্থ হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-কেও চেনে না, তাঁর আহকামগুলো সম্পর্কেও অজ্ঞ। সর্বোত্তম হলো প্রথম শ্রেণি, সর্বনিকৃষ্ট হলো চতুর্থ শ্রেণি।

এখন চিন্তা করে বের করুন আপনি কোন শ্রেণিতে পড়েন। নিজের দুর্বলতা ও সবলতার জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করুন, কারণ এভাবেই আপনি মা'রিফাতুল্লাহ অর্জন করতে পারবেন।

মা'রিফাতুল্লাহর গুরুত্ব

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা'রিফাতুল্লাহ বিশাল একটি ব্যাপার এবং একে গুরুত্বের সাথে নেয়া আবশ্যক। আল্লাহকে জানা এবং তাঁর ইবাদত করা মানুষের ফিতরাহ বা স্বাভাবিক প্রবণতা। কেবল যাদের ফিতরাহ কলুষিত হয়ে গেছে তারাই আল্লাহ ﷻ-কে চেনে না এবং আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করতে চায় না। অর্থাৎ তাদের ফিতরাতের মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণতা, কোনো ত্রুটি দেখা দিয়েছে যার কারণে সঠিক ফিতরাহ থেকে তারা সরে গেছে।

আল্লাহ ﷻ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। এটা আপনাকে জানতে হবে, এটা মা'রিফাতুল্লাহ। আপনার শাহ রগের চেয়েও আল্লাহ ﷻ আপনার নিকটবর্তী, এটা জানতে হবে। এটা মা'রিফাতুল্লাহ।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

> আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনি হতেও অধিক কাছে। (সূরা আল-কাফ, ১৬)

ভগ্ন হৃদয়কে তিনিই জোড়া লাগান। যখন বিপদে পরেন, তখন তিনিই আপনার ডাকে সাড়া দেন। নির্যাতিতকে বিজয় দেন । তিনিই আপনার প্রতি আপনার মায়ের চেয়েও অধিক

www.banglakitab.weebly.com

দয়াশীল। এগুলো জানা মা'রিফাতুল্লাহ। যখন আপনি জানবেন ও অনুধাবন করবেন আল্লাহ ﷻ কতটা দয়াশীল, যখন আপনি উপলব্ধি করবেন আপনার নিজের মায়ের চেয়েও আল্লাহ ﷻ আপনার প্রতি অধিক দয়াশীল, তখন সেটা মা'রিফাতুল্লাহর অংশ। মা'রিফাতুল্লাহ হলো এই জ্ঞান যে, তিনি এবং একমাত্র তিনিই আপনার কল্যাণ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। সমগ্র বিশ্ব একত্র হয়ে আপনার বিরুদ্ধে জড়ো হলেও, আল্লাহ ﷻ যদি না চান, তাহলে তারা সবাই মিলে আপনার অণুপরিমাণ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। মা'রিফাতুল্লাহ হলো এটা জানা যে, তিনিই আল্লাহ, যার প্রতি দুআর হাত তোলার পর তিনি আপনাকে খালি হাতে ফেরান না। যখন সবাই ঘুমন্ত তখনো যে সত্তা ক্রন্দনরত মানুষের কান্না শোনেন–তিনিই আল্লাহ। ধরুন আপনার বাসায় কেউ একজন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দুআ করার সময় আপনি কাঁদছেন, সেটা সে শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ ﷻ সে কান্না শুনতে পান। এটা জানা হলো মা'রিফাতুল্লাহ। মা'রিফাতুল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ﷻ-কে জানা ছাড়া সঠিকভাবে, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করা সম্ভব না। আপনি এ ব্যাপারে যত জানবেন আপনি তত বেশি ইবাদত করবেন। আপনার অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর ভয় তত বাড়বে। আপনি আল্লাহ ﷻ-এর ওপর তত বেশি ভরসা করতে পারবেন, তত বেশি আশাবাদী হবেন। আল্লাহ ﷻ-কে জানা হলো সকল জ্ঞানের মূলনীতি, কারণ এ জ্ঞানের মাধ্যমে আপনি আপনার অস্তিত্বের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। আল্লাহ ﷻ-কে জানা, তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানা, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা–এটা জানা হলো মা'রিফাতুল্লাহ। যা কিছু আল্লাহ ﷻ-এর জন্য না, এমন সব ইবাদত বাতিল–এটা জানা মা'রিফাতুল্লাহ। মা'রিফাতুল্লাহ সম্পর্কে আপনি যত বেশি জানবেন আপনার ঈমান তত দৃঢ় হবে।

এগুলো হলো মা'রিফাতুল্লাহর ফল, মা'রিফাতুল্লাহর দাবি। আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর ওপর আশার কারণে তাঁর নির্ধারিত দায়িত্বগুলো পালনে এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা হলো মা'রিফাতুল্লাহর চূড়ান্ত পর্যায়।

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান হলো সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান

এই হাদিসটি শুনুন, বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কতটা শক্তিশালী, কতটা ভারী অনুভব করুন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস رضي الله عنه বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন এবং বললেন, যখন নূহ عليه السلام-এর মৃত্যুর সময় এল, তিনি তাঁর দু-ছেলেকে সতর্ক করলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সংক্ষিপ্ত কিছু উপদেশ দেবো।

آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكُمَا عَنِ اثْنَتَيْنِ

আমি তোমাদের দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আর দুটি বিষয় থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করছি।

www.banglakitab.weebly.com

লক্ষ করুন, নূহ ﷺ তাঁর সন্তানদের মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো কী উপদেশ দিচ্ছেন।

أَنْهَاكُمَا عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ

আমি তোমাদের সতর্ক করছি আল্লাহর সাথে শরীক করা আর অহংকারের ব্যাপারে।

وَآمُرُكُمَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ،

আর আমি তোমাদের আদেশ করছি যে, তোমরা জানবে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

অর্থাৎ নূহ ﷺ চাচ্ছেন তাঁর ছেলেরা যেন মা'রিফাতুল্লাহ জানে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো মা'রিফাতুল্লাহ।

তারপর তিনি কী বলছেন লক্ষ করুন, এ জন্যই আমি এ হাদিসটি উল্লেখ করলাম।

فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فِي الْكِفَّةِ الأُخْرَى، كَانَتْ أَرْجَحَ

তিনি বললেন, যদি সাত আসমান আর সাত জমিনকে এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুকে একত্র করে এক পাল্লায় রাখা হয় আর অন্য পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রাখা হয়–তাহলে দ্বিতীয় পাল্লা প্রথম পাল্লার চেয়ে ভারী হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–শুধু এ শব্দগুলো যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে তার ওজন সাত আসমান ও সাত জমিন এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুর সম্মিলিত ওজনের চেয়ে বেশি হবে। মা'রিফাতুল্লাহ এমনই গুরুতর, এমনই ব্যাপক ও বিশাল।

তারপর হাদিসে বলা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا

যদি আসমানসমূহ ও জমিন একটি আংটির আকৃতিতে হতো আর এর ওপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হতো, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একে ভেঙে ফেলত। একে ধ্বংস করে ফেলত।

অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মা'রিফাতুল্লাহ কতটা ভারী, কতটা শক্তিশালী।

তারপর নূহ ﷺ তাদের আরেকটি কাজের আদেশ করলেন :

وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلاَةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ

আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলার। কারণ, এটা হলো

www.banglakitab.weebly.com

সকল সৃষ্টির সালাত, এরই মাধ্যমে সবকিছু নিজ নিজ রিযক লাভ করে।[৫৪]

এ হাদিস থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন মা'রিফাতুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–কতটা ভারী, শক্তিশালী, গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। মৃত্যুশয্যায়ও একজন নবি বিশেষভাবে তাঁর ছেলেদের বলছেন, তোমাদের এটা জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে।

হত্যা, মদ্যপান অথবা অন্য কোনো কবিরা গুনাহকারী যদি আল্লাহ ﷻ-এর নিয়ামতে হৃদয়ে তাঁর ভয় অনুভব করে, যদি গুনাহর পর হিদায়াত পেয়ে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি সে সিজদাবনত হয় এবং মা'রিফাতুল্লাহ অর্জন করে–তাহলে সে স্বীকার করবে, আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যে ফিরে আসার পর সালাত, তাসবিহ আর দুআর মধ্যে সে যে আনন্দ পেয়েছে তার সাথে আগের গুনাহ কিংবা অন্য কোনো পার্থিব সুখের তুলনা হয় না। পাপাচারের জীবন ত্যাগ করে ইসলামে আসার পর আগের জীবনে পাপের মাধ্যমে পাওয়া সুখের সাথে ইবাদত ও মা'রিফাতুল্লাহর তুলনা করে–সে বলবে এ আনন্দের সাথে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। যদি তার মধ্যে আদল-ইনসাফ থাকে, তাহলে সে এটা স্বীকার করবে। যদি কেউ সত্যিকারভাবে মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান অর্জন করে, তাহলে সব পার্থিব আনন্দের চেয়ে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে সিজদাবনত হওয়া তার কাছে বেশি প্রিয় হবে।

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করলে ব্যক্তি ওই মুহূর্তগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে যখন সে সালাত, দুয়া, রুকু, সিজদাহ, যিকির অথবা অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্য লাভ করে। অন্যদিকে মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞানের অভাব আপনাকে ওই মানুষদের মতো বানাবে যারা সালাত শেষ হবার জন্য মুখিয়ে থাকে। যারা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করে ইবাদত শেষ হবার জন্য। যারা কখনো কুরআন ছুঁয়েও দেখে না। প্রতিদিন কুরআন খুলে দেখার, সেখান থেকে তিলাওয়াত করার আগ্রহও তাদের থাকে না। যে সত্যিকার অর্থে মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান অর্জন করে, সে এই আয়াতের কথা স্মরণ করবে :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

সেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে। আর তাদের সিজদাহ করার জন্য আহ্বান জানানো হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। (সূরা আল-কালাম, ৪২)

যে আল্লাহ ﷻ-কে চেনে, যার মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান আছে, দুনিয়াতে সে স্বেচ্ছায়, আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়াতে সে রুকু আর সিজদাহ করে যাতে করে যেদিন আল্লাহ ﷻ মানুষের মধ্যে বিচার করার জন্য অবতরণ করবেন এমন ব্যক্তি সেইদিনও আল্লাহ ﷻ-এর সম্মানে সে রুকু ও সিজদাহ করতে পারে।

---

৫৪ *মুসনাদু আহমাদ* : ৭১০১, হাদিসটির সনদ খুব শক্তিশালী। বর্ণনাকারীগণ অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান কবরে প্রবেশ করার আগে আপনার কবরকে আলোকিত করবে। আপনি কি আলোকিত, উজ্জ্বল কবরে প্রবেশ করতে চান না? আপনি প্রবেশ করার আগেই মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান আপনার কবরকে উজ্জ্বল করবে, আলোকিত করবে। আর তাই আমরা এ নিয়ে শিখছি, যাতে করে যখন আমাদের কবরে শায়িত করা হবে আমরা যেন একটি আলোকিত, উজ্জ্বল কবরে জায়গা পাই। মা'রিফাতুল্লাহর ফল হলো আল্লাহ ﷻ-এর সাথে দেখা হবার আগে আল্লাহ ﷻ-কে সন্তুষ্ট করা। আপনি কি আল্লাহ ﷻ-এর সাথে দেখা হবার আগেই, আল্লাহ ﷻ-কে সন্তুষ্ট করতে চান না? নিশ্চয় আপনি চান যখন আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সামনে দাঁড়াবেন তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। মা'রিফাতুল্লাহ এ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই। লোকেরা আপনার ওপর সালাত (জানাযা) আদায় করার আগে, নিজের সালাত আদায় করা ও নিজের দায়িত্ব পালন করা হলো মা'রিফাতুল্লাহ। আর এ ব্যাপারে জ্ঞানের অভাবের কারণেই মানুষ গুনাহ করে থাকে।

মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

> নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন-নিসা, ১৭)

এখানে অজ্ঞতা বলতে হারাম ও হালাল সম্পর্কে অজ্ঞতাকে বোঝানো হচ্ছে না। একজন মানুষ কোনো একটা হারাম কাজ করছে আর সে জানে না যে এটা হারাম–এমন খুব কমই হয়। যে হত্যা করে, হত্যা করা হারাম জেনেই করে। যারা যিনা করে তারা সবাই জানে যে যিনা হারাম। ব্যভিচার করতে উদ্যত ব্যক্তি জানে সে একটি হারাম করতে যাচ্ছে। যিনা হারাম এটা জানে না এমন লোক যদি থেকেও থাকে, তবে সেটা দুর্লভ ব্যতিক্রম। কুরআনে ব্যতিক্রমের কথা বলা হচ্ছে না।

এখানে যে অজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে তা হলো আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে অজ্ঞতা, মা'রিফাতুল্লাহর ক্ষেত্রে অজ্ঞতা। আর তাই তাওহিদ সম্পর্কে জানা আবশ্যক। এ কারণেই আমরা তাওহিদের ব্যাপারে শিখি। কেউ কেউ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে, আবার অনেকে গুনাহ করে সাময়িক বোকামিপূর্ণ অজ্ঞতার কারণে। আবারও বলি, কিছু মানুষ মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ। এরা হলো দুশ্চরিত্র, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যাদের সারা জীবন কাটে পাপ আর হারামের মধ্যে। আর কিছু মানুষ আছে যারা সাময়িক বোকামিপূর্ণ

www.banglakitab.weebly.com

অজ্ঞতায় পড়ে গুনাহ্ করে ফেলে। আর এ দ্বিতীয় ধরনের মানুষের মধ্যে অনেকেই ইন শা আল্লাহ্ তাওবাহ্ করে আবার ফিরে আসে।

عنْ قتادةُ عنْ أبِي العالِيةِ : أنَّهُ كان يُحدِّثُ : أنَّ أصْحاب رسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم كانُوا يقُولُون : كُلُّ ذنْبٍ أصابهُ عبْدٌ فهُو بِجهالةٍ عمْدًا كان أوْ غيْره

> আবুল আলিয়াহ বলেছেন—সাহাবি ﷺ-দের মধ্যে এ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, প্রত্যেক গুনাহ যাতে ব্যক্তি লিপ্ত হয় বা পতিত হয়, তা হয় অজ্ঞতার কারণে—গুনাহটি ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক।[৫৫]

কিসের ব্যাপারে অজ্ঞতা, হে সাহাবিগণ?

মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা।

বুঝতে পারছেন এ ধরনের তাওহিদ কতটা অপরিহার্য? এমন অনেকে আছে যারা তাওহিদ শেখানোর সময় কেবল বইয়ের পাতা উলটে যায়। কিন্তু তাওহিদ এমনভাবে শেখাতে হয় যাতে করে আপনি তাওহিদের ওপর আমল করতে আকৃষ্ট হন। আর এ ধরনের তাওহিদ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে নিজেকে সংশোধন করতে।

মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান জান্নাতে যাবার আগে এ দুনিয়াতে আপনার জন্য জান্নাতের আবহ সৃষ্টি করবে। ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। আমি ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর মাজমু আল ফাতাওয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চার থেকে পাঁচবার পড়েছি, তবুও ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর উক্তিগুলোর মধ্য থেকে এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় উক্তিগুলোর একটি।

ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ فِيْ الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَّمْ يَدْخُلْهَا لَا يَدْخُل جَنَّةَ الْأَخِرَةَ

> দুনিয়ার জীবনেও একটি জান্নাত আছে। যে এই জান্নাতে প্রবেশ করেনি, সে পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করবে না।[৫৬]

ইবনু তাইমিয়্যাহ, দুনিয়াতে এ কোন জান্নাতের কথা আপনি বলছেন? যখন আপনি এ জীবনে মোট সাতবার বন্দী হয়েছিলেন? বছরের পর বছর জেলে কাটিয়েছিলেন, আর এমন দারিদ্র্যের মাঝে জীবন কাটিয়েছিলেন যে পরার জন্য একটার বেশি কাপড় আপনার ছিল না? আপনি তো দুনিয়াতে ছিলেন নির্যাতিত ও নিগৃহীত। আপনি এ কোন জান্নাতের কথা বলছেন? দুনিয়ার কোন জান্নাতী বাগানের কথা আপনি বলছেন, যেখানে প্রবেশ না করতে পারলে কেউ আখিরাতের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না?

---

৫৫ *তাফসির ইবনু কাসির*, উপরোক্ত আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

৫৬ *আল ওয়াবিলুস সাইয়িব মিনাল কালামিত তাইয়িব* : ১/৫৭

www.banglakitab.weebly.com

এখানে ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷫ তা-ই বুঝিয়েছেন যেটা সালাফদের অনেকের কথায়ও উঠে এসেছে :

إِنَّهُ لَيَمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوْقَاتٌ. أَقُولُ : إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هذا، إِنَّ هُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ

দুনিয়াতে মাঝে মাঝে আমাদের অন্তর এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় যে আমরা বলি, যদি জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর এই অবস্থায় থাকে, যদি তাদের অন্তর এমন অনুভূতি হয়, তাহলে বলা যায় যে তারা ভালো অবস্থায় আছে!

মাদারিজ আস-সালিকিনের প্রথম খণ্ডে, সম্ভবত পৃষ্ঠা চার শ আশি বা এর কাছাকাছি কোথাও এ উদ্ধৃতিটি পাবেন।[৫৭]

এটাই হলো মা'রিফাতুল্লাহ। মা'রিফাতুল্লাহ জান্নাতে যাবার আগেই আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যায়।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানা :

ইলমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মা'রিফাতুল্লাহর পর লেখক বলেছেন,

مَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ইলমের আরেকটি অংশ হলো আপনাকে অবশ্যই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে চিনতে হবে, তাঁর সম্পর্কে জানতে হবে। নবি ﷺ-কে চেনা হলো ইলম। এটি সেই জ্ঞান যার কারণে ব্যক্তি ওইসব কিছু মেনে নেয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এনেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে এবং তিনি যা কিছু জানিয়েছেন তার সবকিছুই সত্য বলে স্বীকার করতে হবে এবং সত্যায়ন করতে হবে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে জানার অর্থ সব আদেশের অনুসরণ করা। ওইসব কিছু এড়িয়ে চলা যেগুলোর ব্যাপারে তিনি ﷺ আমাদের নিষেধ করেছেন। যা কিছুর ব্যাপারে তিনি আমাদের অনুৎসাহিত করেছেন সেগুলো ত্যাগ করা। যে নাযিলকৃত আইনসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন, সেই আইন দিয়েই আপনাকে বিচার করতে হবে এবং আল্লাহ ﷻ-এর যেকোনো বিচার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যেকোনো নির্দেশের ব্যাপারে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ ও রাসূল ﷺ-কে শুধু মেনে চললে হবে না; বরং তাঁদের পক্ষ থেকে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে তা নিয়ে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে জ্ঞানের অর্থ হলো এ সত্য জানা যে তিনি আল্লাহ ﷻ-এর গোলাম এবং আল্লাহ ﷻ-এর রাসূল। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে চেনার অর্থ হলো, এ মানুষটির প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যে অন্তর পরিপূর্ণ হওয়া। আপনি তাকে যত

৫৭ *ইবনুল কাইয়িম ﷫, মাদারিজুস সালিকিন* : ১/৪৫৪

www.banglakitab.weebly.com

ভালোবাসবেন ততই সত্যিকারভাবে তাঁর অনুসরণ করবেন।

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (সূরা আলি ইমরান, ৩১)

আল্লাহ ﷻ আপনাকে ভালোবাসার একটি পূর্বশর্ত হলো নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনা মেসেজের ওপর আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। মেনে চলতে হবে তাঁর দেয়া নির্দেশ, অনুসরণ করতে হবে তাঁর আনা হেদায়েতের। কেন? কারণ, আল্লাহ ﷻ-এর নাযিলকৃত শারীয়াহকে জানা এবং হেদায়েত পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো মুহাম্মাদ ﷺ-কে চেনা। যেসব বিধিবিধান, হুকুম-আহকাম অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে, আমরা তা পেয়েছি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে। তাই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে চিনতে হবে, তাঁর ﷺ ব্যাপারে জানতে হবে। ইলম অর্জনের জন্য নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে চেনা আবশ্যক। আর তাই লেখক এ বিষয়টিকে ইলমের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এককথায় নবি ﷺ-এর ব্যাপারে জানা হলো—ওইসব জ্ঞান অর্জন ও উপলব্ধি করা যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে হেদায়েতসহ পাঠানো হয়েছিল, আপনি তা গ্রহণ করতে পারেন। নবিকে চেনার অর্থ তাঁর ওপর ঈমান আনা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। (সূরা আন-নিসা, ৬৫)

আল্লাহ ﷻ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে শুধু পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন? না, আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন :

'তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।'

সম্পূর্ণ সমর্পণের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যেকোনো নির্দেশ গ্রহণ করে নিতে আপনি বাধ্য। তাঁর নির্দেশ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে আপনার অন্তরে থাকবে হবে শতভাগ সন্তুষ্টি।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মুমিনদের যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মুমিনদের জবাব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম। (সূরা আন-নূর, ৫১)

যখন আপনি মানুষকে বলেন, 'এই হলো কুরআনের বক্তব্য, এই হলো হাদিসের দলিল, দেখো এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ এমন বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে এটি বলেছেন'–কিছু মানুষ বলবে, 'না! এসব কথা আমাদের জন্য প্রযোজ্য না।' অথবা তারা বলবে, 'ওসব কথা আমাদের নিয়ে না, এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই।' কিংবা তারা বলবে, 'আসলে এ কথাগুলোর অর্থ এ রকম না এগুলোর অর্থ অন্য কিছু।' এভাবে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের কথাকে এড়িয়ে যাবার জন্য তারা লক্ষ লক্ষ অজুহাত বের করবে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ বলেছেন, মুমিন হলো তাঁরাই যারা বলে :

'আমরা শুনলাম এবং মানলাম।'

আল্লাহ ﷻ বলছেন, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের কথা বলা হলে যারা বলে 'আমরা শুনলাম এবং মানলাম' তাঁরাই সফল। সফল হবার অর্থ হলো তাদের জান্নাত দান করা হবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

কাজেই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের ওপর ফিতনাহ নেমে আসবে কিংবা তাদের ওপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি। (সূরা আন নূর, ৬৩)

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

ওই ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক হও, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদেশের অবাধ্য হলে যা তোমাদের ওপর আপতিত হবে।

কোন ফিতনা? কী ধরনের ফিতনা? ইমামদের অনেকে এ আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, এখানে ফিতনাহ অর্থ হলো শিরক। নবিজি ﷺ-এর অবাধ্য হওয়া আপনাকে শিরকের দিকে নিয়ে যাবে। নবিজি ﷺ-এর কাছ থেকে আসা কোনো কিছু যদি আপনি অস্বীকার করেন,

www.banglakitab.weebly.com

যদি নবির সুন্নাহ বাদ দিয়ে মানুষের যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা, মানবিক দর্শন, আদর্শ কিংবা বুলির ওপর ভরসা করেন, যদি অবহেলা করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে, যদি একে কাটছাঁট করেন, তাহলে এ কাজ আপনাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আপনি শিরকে পতিত হবেন।

ইসলামকে জানা :

লেখক বলেছেন,

ومعْرِفةُ دِينِ الْاسْلام بالأدِلّةِ

ইলম বা জ্ঞানের তৃতীয় অংশটি হলো ইসলাম সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ ইলম হলো আল্লাহ ﷻ-কে জানা, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানা এবং ইসলামকে জানা।

ইসলামের সংজ্ঞা

শাব্দিক ভাবে ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু শারীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম অর্থ :

الْاسْتِسْلامُ لِلّهِ بِالتَّوْحِيدِ، والانْقِيادُ لهُ بِالطّاعةِ، والخُلُوصُ مِن الشِّرْكِ وأهْلِهِ

তাওহিদের সাথে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি পূর্ণ সমর্পণ, পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে নেয়া, শিরক এবং মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান করা এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো ইসলাম।

এগুলো ইসলামের শর্ত এবং সীমারেখা। এটি হলো ইসলামে বিশ্বাস করার সংজ্ঞা।

আল্লাহ ﷻ-এর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম

কুরআনের অনেক আয়াতে পূর্ববর্তী রাসূল আলাইহিমুস সালাম এবং আল্লাহ ﷻ-এর শারীয়াহর প্রতি তাঁদের সমর্পিত হবার কথা এসেছে। আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি তাঁদের এ সমর্পণকে বোঝানোর জন্য কুরআনে 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

www.banglakitab.weebly.com

'হে আমাদের রব, আমাদের মুসলিম বানান এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের বিধিবিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (সূরা আল-বাকারাহ, ১২৮)

উসূল আস-সালাসাহর লেখক বলছেন, আপনার অবশ্যই ইসলামকে জানতে হবে। আর এ ইসলাম হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন। মুসা, ঈসা এবং ইব্রাহীম আলাইহিমুস সালামের দ্বীন। পার্থক্য হলো, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পর তাঁর ওপর নাযিলকৃত বিধিবিধান, হুকুম ও নীতিগুলোর দ্বারা আগের সকল শারীয়াহকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। মুসা ﷺ-এর সময়কার ইহুদিরা ছিল মুসলিম। ঈসা ﷺ-এর সময়কার খ্রিষ্টানরা ছিল মুসলিম। তাঁরা নিজেদের সমর্পণ করেছিল ঈসা ﷺ-এর শিক্ষার প্রতি। মনে রাখবেন, আমরা এখানে তাঁদের কথা বলছি যারা মুসা এবং ঈসা আলাইহিমুস সালামের সময় পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছিলেন, আমরা তাঁদের কথা বলছি। বর্তমানের ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা যদি আসলেই মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের প্রকৃত অনুসারী হতো তবে তারা কুরআনের অনুসরণ করত এবং সেসব মেনে চলত যা মুহাম্মাদ ﷺ তাদের অনুসরণ করতে বলেছেন। সত্যিকারভাবে নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসী হলে তারা নবিজি ﷺ-এর আনীত বার্তা ও দ্বীনের অনুসরণ করত। এটি স্পষ্ট সত্য এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মর্ডানিস্ট[৫৮] এবং যারা ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সংহতি[৫৯] ইত্যাদির কথা বলে—উম্মাহর জন্য ক্যান্সারস্বরূপ এসব গোমরাহ লোকেরা বলে, আল্লাহ ﷻ নাকি কুরআনে বর্তমানের

---

৫৮ ইসলামি মর্ডানিযম/ ইসলামি মর্ডানিস্ট - একটি বাতিল ফিরকা। মর্ডানিস্টরা পশ্চিমা সভ্যতা ও সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট বিশ্বব্যবস্থার আলোকে ইসলাম ও শরীয়াহকে পুনঃসংজ্ঞায়িত ও পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। মানদন্ড হিসেবে মর্ডানিস্টরা গ্রহণ করে উদারনৈতিক পশ্চিমা দর্শনকে (liberalism)। ইসলামের যা কিছু এই দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক মর্ডানিস্টরা সেগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যাতে করে সেগুলো উদারনৈতিক পশ্চিমা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। মর্ডানিস্টরা মনে করে আমরা এক ব্যতিক্রমধর্মী সময় বাস করছি এবং আমাদের উচিৎ ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা। একারণে তাঁরা সালাফ আস-সালেহিনসহ উম্মাহর পূর্ববর্তী ইমাম ও আলিমগণের ঐক্যমত, ব্যাখ্যা ও ইলমি শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে শরীয়াহর অনেক কিছুর ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অবস্থান ভুল ছিল, অথবা তাঁদের দেয়া ব্যাখ্যাগুলো শুধু ওই সময়কালের জন্য প্রযোজ্য ছিল। মর্ডানিস্টদের অনেক সময় 'নব্য মু'তাযিলা' বলা হয়, কারণ তাদের মানহাজ তথা পদ্ধতির সাথে মর্ডানিস্টদের মানহাজের সাদৃশ্য বিদ্যমান। মর্ডানিস্ট ইসলাম হল আধুনিক সময়ে অ্যামেরিকার প্রচারিত ও সমর্থিত 'মডারেট ইসলাম' (Civil Democratic Islam) আদর্শিক পূর্বসূরী।

৫৯ ইন্টারফেইথ বা ইন্টারফেইথ ডায়ালগ : আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপ। এ-জাতীয় কার্যকলাপকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের মুখস্থ বুলি প্রচলিত থাকলেও আদতে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, সম্প্রীতি ও সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হলো, 'সকল ধর্ম সমান', 'সকল ধর্ম সঠিক', 'সকল পথই একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়', 'সকল ধর্ম এক'—এমন একটি দর্শনের প্রচার। এটি নির্জলা কুফর ও শিরক এবং বর্তমানের ইন্টারফেইথ আন্দোলন মূলত ফ্রিম্যাসনিক 'এক ধর্ম, এক বিশ্ব' এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, ইসলাম ছাড়া আর কোনো সঠিক ধর্ম নেই। ঈমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক, মুসলিম ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না। আলিমদের মতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপের এ আহ্বান হলো মূলত রিদ্দার আহ্বান। এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন - https://islamqa.info/en/10213 এবং লাজনাহ আদ দাইমাহর ফাতওয়া নম্বর ১৭,৩০০

www.banglakitab.weebly.com

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রশংসা করেছেন! নিজেদের খেয়ালখুশিকে জায়েজ করার জন্য তারা আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের অর্থ বিকৃত করে।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

> নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদি হয়েছে এবং খ্রিষ্টান ও সাবিঈন–যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরা আল বাকারাহ, ৬২)

এই আয়াত দেখিয়ে এরা বলে, দেখো! আমরা সবাই ভাই ভাই! দেখো, আল্লাহ ﷻ বলছেন ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও আমাদের সাথে জান্নাতে যাবে।

অথচ এ আয়াতে ওইসব লোকেদের কথা বলে হচ্ছে যারা তাঁদের সময়ে হকের ওপর ছিলেন। যারা মুসা ﷺ-এর সময়ে হকপন্থী ছিলেন, যারা ঈসা ﷺ-এর সময়ে হকপন্থী ছিলেন–এ আয়াতে সেইসব মানুষের কথা বলা হচ্ছে। বর্তমানে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নুবুওয়্যাতের পরে, যদি মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের সত্যিকারের কোনো অনুসারী থেকে থাকে, যদি আসলেই তারা মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের অনুসারী হয়ে থাকে তবে তারা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

বাস্তবতা হলো, আমরা মুসলিমরাই হলাম মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের প্রকৃত অনুসারী। কারণ, তাঁদের নুবুওয়্যাতের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে তাঁরা শপথ করেছিলেন যে, তাঁদের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন ঘটলে তাঁর ওপর তাঁরা ঈমান আনবেন এবং তাঁর অনুসরণ করবেন। এটি ছিল তাঁদের নবি হবার শর্ত। তাঁদের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ ﷺ প্রেরিত হলে তাঁরা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণে বাধ্য থাকবেন–এটি ছিল তাঁদের ওপরই শর্ত। তাহলে চিন্তা করুন তাঁদের উম্মাহর জন্য অবস্থাটি কী রকম! তাঁদের দুজনের হাজারো বছর পর আজ তাঁদের উম্মাহও নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদেশ ও নিষেধের অনুসরণে বাধ্য।

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

www.banglakitab.weebly.com

আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ নবিদের অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তোমাদের যে কিতাব ও হিকমাহ দিয়েছি অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে–তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর ওপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' আল্লাহ্ বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।' (সূরা আলি ইমরান, ৮১)

প্রত্যেক রাসূল আলাইহিমুস সালামকে এ শপথ করতে হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ এলে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এটি রাসূলদের জীবদ্দশাতেই তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তাহলে আজকে ব্যাপারটা কেমন হবার কথা? আজকের খ্রিষ্টান এবং ইহুদিরা মুসলিম না। মুসলিম হলো তাঁরাই যারা আল্লাহ ﷻ এবং নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর বিশ্বাস করে। আমরা বিশ্বাস করি, মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের ওপর বিশ্বাসের অংশ হলো এই বিশ্বাস যে, মুহাম্মাদ ﷺ প্রেরিত হলে তাঁর ﷺ অনুসরণ করার এবং তাঁর শারীয়াহকে গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ তাঁদের কাছ থেকে শপথ নিয়েছেন। এবং আমরা বিশ্বাস করি এই সত্য তাঁদের উম্মাহকে এই মহান রাসূলগণ জানিয়েছেন।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। (সূরা আলি ইমরান, ১৯)

আর যারা ইন্টারফেইথে বিশ্বাস করে এ আয়াত হলো তাদের জন্য :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলি ইমরান, ৮৫)

ইসলাম হলো সেই ধর্ম যা আল্লাহ ﷻ এ উম্মাহর জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং এটিই এ উম্মাহর জন্য সব সম্মানের চেয়ে বড় সম্মান।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (সূরা আল মায়িদা, ৩)

www.banglakitab.weebly.com

এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামেই বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ ﷻ-এর মনোনীত একমাত্র দ্বীন, আল্লাহ ﷻ-এর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম—এটি বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক।

ইসলামে আমলের ভিত্তি

ইসলামকে জানার অর্থ হলো, বিশ্বাসী হিসেবে যেসব কাজ করা আবশ্যক সেগুলো সম্পর্কে জানা :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

> ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ আদায় করা এবং রমাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করা।[৬০]

এগুলোই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত সব কাজ না, তবে এগুলো হলো ইসলামে আমলের মূলনীতি। ইসলামে আমলসমূহের ভিত্তিস্বরূপ মূলনীতিগুলো সম্পর্কে জানা, সেগুলোর প্রতি আত্মসমর্পণ এবং অনুসরণ করাও ইসলামকে জানার অংশ।

আমরা এ আলোচনায় ইলম ও ইলমের সংজ্ঞা সম্পর্কে জানলাম। আমরা জানলাম যে, ইলম হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে জানা। আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম কারণ, তিনটি মূলনীতির আলোচনায় এ বিষয়গুলো আবারও আসবে। কারণ, কবরে এ তিনটি বিষয় নিয়েই আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। এখানকার সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইলমের সংজ্ঞা আপনাদের সামনে স্পষ্ট করা।

---

৬০ *সহিহুল বুখারি* : ৮; *সহিহ মুসলিম* : ১২১

www.banglakitab.weebly.com

দারস ৫

ইলমের সংজ্ঞার ক্রমধারা :

উসুল আস-সালাসাহর লেখক ইলমের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ক্রমধারায়–প্রথমে আল্লাহ ﷻ-কে জানা, তারপর নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানা এবং তারপর দ্বীন ইসলামকে জানা। আদ-দুররারসহ (الضرر) অন্যান্য বইতে দেখবেন এ ধারাটা ভিন্নভাবে এসেছে। এসব বইতে প্রথমে আল্লাহ ﷻ-কে, তারপর দ্বীন ইসলাম এবং তারপর মুহাম্মাদ ﷺ কে জানার কথা বলা হয়েছে। এ পার্থক্য কেন? এর দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ হলো, দ্বীন ইসলাম আর নবি মুহাম্মাদ ﷺ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কাজেই এ দুটোর মধ্যে কোনটিকে আগে বলা হচ্ছে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না।

দ্বিতীয় কারণ হলো, লেখক এখানে ওয়া (و) ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন,

مَعْرِفَةُ اللهِ ، ومَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ، ومَعْرِفَة دِينِ الْاسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ

আরবিতে 'ওয়া' অর্থ হলো 'এবং'। যদিও অধিকাংশ সময় ওয়া ব্যবহার করা হলে সেটার দ্বারা সিকোয়েন্স বোঝায় কিন্তু সব ক্ষেত্রে ওয়া দ্বারা ক্রমধারা বা সিকোয়েন্স বোঝাবে, এটা আবশ্যক না।

আল্লাহ ﷻ, নবি মুহাম্মাদ ﷺ ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে দলিলসহ জানা :

লেখক বলছেন, আল্লাহ, নবি ও দ্বীন ইসলাম, এ তিনটি বিষয়ে আপনাকে জানতে হবে–বিল আদিল্লাহ–দলিলসহ।

আদিল্লাহ বা দলিল-প্রমাণের এর শাব্দিক অর্থ হলো এমন কিছু যা অন্বেষিত বস্তু বা লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। তবে আমরা আগেও বলেছি লুগ্বাউই বা শাব্দিক/ভাষাতাত্ত্বিক অর্থের পাশাপাশি পরিভাষাগুলোর ইস্তিলাহি বা শার'ঈ অর্থও থাকে। আদিল্লাহ বা দলিলের শার'ঈ

www.banglakitab.weebly.com

অর্থ হলো, নসভিত্তিক (textual proof) ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ। নসভিত্তিক প্রমাণ বলতে বোঝানো হয় কুরআন-সুন্নাহ এবং এ দুটোর ওপর ভিত্তি করে পাওয়া ইজমা ও কিয়াস। কাজেই দলিল বা প্রমাণের একটি হলো নসভিত্তিক প্রমাণ। পাশাপাশি উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর দ্বীনকে চেনাও দলিলের অংশ। কুরআনে আল্লাহ ﷻ অনেকবার তাঁর সৃষ্টিসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের উদাহরণ।

وَمِنْ آيَاتِهِ

এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে...

শুধু এ কথাটি কুরআনে এগারো বার এসেছে। আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত, প্রমাণ, নিদর্শনসমূহ এবং সৃষ্টির জন্য শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলো আকাশ, জমিন, সমুদ্র এবং দিন ও রাত্রির আবর্তন। কুরআনে এগুলোর দিকে তাকানো, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার কথা এসেছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

> নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে, লোকের উপকারী দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানের মধ্যে এবং আকাশ হতে আল্লাহর বর্ষিত সেই পানির মধ্যে যদ্দ্বারা তিনি পৃথিবীকে মরে যাওয়ার পর আবার জীবিত করেন এবং তাতে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তারণে এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। (সূরা আল-বাকারাহ, ১৬৪)

পাশাপাশি আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সংঘটিত মু'জিযাগুলোও দলিলের অন্তর্ভুক্ত। এসব মু'জিযার মধ্যে আছে তাঁর ﷺ হাতের আঙুলের মাঝ থেকে পানির প্রবাহ, বিভিন্ন জড় বস্তুর সাথে কথোপকথন, পাথর কর্তৃক তাঁকে সালাম দেয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে গাইবের এমন অনেক খবর জানিয়েছেন, যেগুলো কেবল আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া ওহির মাধ্যমেই জানা সম্ভব। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অনেকগুলো হুবহু তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে, আর বাকিগুলোর ব্যাপারে আমরা অপেক্ষমাণ। এগুলোও প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত।

তাওহিদের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশ্বাস হতে হবে দৃঢ় ও নিশ্চিত। এমন বিশ্বাস যাতে কোনো সন্দেহ থাকবে না। সাধারণত প্রমাণের মাধ্যমেই এমন অবস্থায় পৌঁছানো যায়। তাই লেখক বলছেন, দলিল জানতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

আকিদাহর ক্ষেত্রে তাকলিদ :

প্রশ্ন হলো, আকিদাহর ক্ষেত্রে কি কোনো শাইখ, আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তির তাকলিদ বা অন্ধ অনুসরণ করা জায়িয? নাকি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রমাণ জানা আবশ্যক? প্রমাণ জানা কি ঈমানের পূর্বশর্ত? প্রমাণ না জানলে আপনার ঈমান কি গৃহীত হবে?

ধরুন দুজন ব্যক্তির মধ্যে একজন জ্ঞানী, অন্যজন অজ্ঞ। তারা শাহাদাহ গ্রহণ করেছেন। তারা তাওহিদের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস রাখেন এবং তাদের মনে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা প্রমাণ জানেন না। দলিল সম্পর্কে জানেন না। তাদের কাছে দলিল জানতে চাইলে তারা বলতে পারবেন না। তাদের ঈমান কি গৃহীত হবে?

صِحَّةِ إِيمانِ الْمُقَلِّدِ فِي الْعقائِدِ

শিরোনামের অধীনে আলিমগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেছে। মুকাল্লিদ হলো অনুসরণকারী। মুকাল্লিদের ঈমান কী সঠিক?

লেখক বলছেন কিছু বিষয়ের ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ জানতে হবে। প্রশ্ন হলো, এগুলো জানা কি বাধ্যতামূলক নাকি এগুলো জানা উত্তম? দলিল-প্রমাণ না জানলে কি আপনার ঈমান কবুল হবে? এ বিষয়গুলো নিয়ে আলিমগণ আলোচনা করেছেন। অনেকে মনে করেন এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। কিন্তু আসলে বিষয়টি অতটা সহজ না। কারণ, এ নিয়ে দু-ধরনের দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে।

প্রথম ও মূল দ্বন্দ্ব হলো মু'তাযিলা[৬১] ফিরকা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ–অর্থাৎ আমাদের মধ্যে। মু'তাযিলাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা এমন সব লোকের ঈমান প্রত্যাখ্যান করে যারা আকিদাহর ব্যাপারে দলিল-প্রমাণগুলো জানে না। অনেকে বলে থাকেন আশা'ইরাহ বা আশআরিরাও এ ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের অনুরূপ বলে। তবে আল-কুশাইরিসহ আশআরিদের অন্যান্য আলিমগণ বলেছেন যে, আবুল হাসান আল-আশআরি ﷺ এমন কোনো কথা বলেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন মুকাল্লিদের ঈমান গ্রহণযোগ্য। আবুল হাসান আল-আশআরি ﷺ হলেন আশআরিদের জনক তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি পরবর্তীকালে আশআরি আকিদাহ থেকে ফিরে এসেছিলেন। যা হোক আকিদাহর ব্যাপারে

৬১ মু'তাযিলা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে ওয়াসিল ইবনু আতা ও আমর ইবনু উবাইদ। এই ফিরকার উদ্ভব দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে। তাদের বাতিল আকিদার কারণে হাসান আল-বাসরি ﷺ কুফার মাসজিদে স্বীয় হালাকা থেকে তাদের বের করে দিয়ে ছিলেন, এবং বলেছিলেন 'দূর হও আমাদের থেকে' (ই'তাযিল আন্না) সেই থেকেই তাদের নাম হয় মু'তাযিলা। এরা আকল বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলকে নকল তথা ওয়াহির ওপর প্রাধান্য দেয়। এদের প্রথম বিদআহ ছিল ঈমান-সংক্রান্ত। তারা বলে, কবিরা গুনাহগার মুমিনও নয়, কাফিরও নয়; সে দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরে (بين منزلتين)। তারা তাকদির অস্বীকার করার ক্ষেত্রে মাবাদ জুহানি ও গায়লানের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। এরপর তারা আল্লাহ ﷻ-এর সিফাত অস্বীকার করে। আর তারা সাহাবিদের ﷺ সমালোচনাকে বৈধ মনে করে। এ ছাড়াও ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তারা আহলুস সুন্নাহর সাথে দ্বিমত পোষণ করে।

www.banglakitab.weebly.com

তাকলিদের প্রশ্নে প্রথম দ্বন্দ্ব হলো আহলুস সুন্নাহ ও মু'তাযিলাদের মধ্যে।

দ্বিতীয় মতপার্থক্য হলো আহলুস সুন্নাহর নিজেদের মধ্যে। এ ব্যাপারে মোট তিনটি মত আছে।

প্রথম মত—দলিল জানতে হবে

প্রথম মত হলো, আপনাকে অবশ্যই আকিদাহর বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রমাণ জানতে হবে। আকিদাহর বিষয়গুলোর ব্যাপারে দলিল না জানলে আপনার ঈমান প্রত্যাখ্যাত। আর-রাযি, আবুল-হাসান আল-আমিদি এবং মু'তাযিলাদের অধিকাংশই এমন কথা বলেছেন। আবুল মুযাফফর আস-সাময়ানি বলেছেন, ফকিহদের কেউ কেউ এবং ফালাসিফারা বলেছেন আকিদাহর ব্যাপারে অন্ধ অনুসরণ সাধারণ মানুষের জন্যও জায়েজ না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াস এবং অন্যান্য উৎস থেকে আসা প্রমাণ জানতেই হবে। মু'তাযিলারা এ ব্যাপারে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের ওপর খুব বেশি ভরসা করত।

দ্বিতীয় মত—দলিল জানা বাধ্যতামূলক না

দ্বিতীয় মতটি হলো এ ব্যাপারে প্রমাণ জানা বাধ্যতামূলক না। কোনো আলিমের কথার অনুসরণ ও অনুকরণ অর্থাৎ তাকলিদ করা যথেষ্ট। ঈমান দৃঢ় হলে এবং মনে কোনো সন্দেহ না থাকলে এতেই ঈমান গৃহীত হবে। তবে অন্তরে কোনো সন্দেহ থাকতে পারবে না—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এটা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ আলিমের মত।

সুতরাং প্রথম মতটি হলো, ঈমান থাকার জন্য আকিদাহর বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রমাণ জানা আবশ্যক। মূলত এটা হলো মু'তাযিলাদের অবস্থান। দ্বিতীয় অবস্থান হলো, অন্তরে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় না থাকলে এবং ব্যক্তি সত্যের অনুসারী হলে এসব ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ জানা আবশ্যক না।

তৃতীয় মত—দলিল প্রমাণ জানার চেষ্টা করা হারাম

তৃতীয় মতটি হলো দলিল-প্রমাণ খোঁজা হারাম। কারণ, এ ব্যাপারে যোগ্য না হলে দলিল খুঁজতে গিয়ে আপনি বিপথগামী হয়ে যেতে পারেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ-এর কিছু অনুসারী এ মত রাখতেন বলে বলা হয়ে থাকে। তবে আমি এ মতটি বাদ দেবো, কারণ আমার মতে এ কথাটি আউট অফ কনটেক্সট নেয়া হয়েছে। মূলত এ কথাটি ওইসব দুর্লভ লোকদের জন্য বলা যারা অজ্ঞভাবে প্রমাণ খোঁজা শুরু করে এবং এর ফলে বিপথগামী হয়। এ কথাটি এমন লোকদের জন্য প্রযোজ্য যারা প্রমাণ বোঝার ক্ষেত্রে একেবারেই অক্ষম এবং তারা যদি প্রমাণ দেখে, তাহলে সেটা সঠিকভাবে না বুঝে বরং তাদের গোমরাহ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। তাই এ ধরনের লোকের জন্য একজন আলিমের কাছে যাওয়া আবশ্যক। কাজেই আমরা এ তৃতীয় মতটি বাদ দেবো, কারণ এখানে বিশেষ অবস্থার কথা বলা হচ্ছে।

www.banglakitab.weebly.com

প্রথম দুটি মতের সারসংক্ষেপ :

প্রথম দুটি মতের সারসংক্ষেপ হলো, কোনো ব্যক্তির দলিল খোঁজার ও অনুধাবন করার যোগ্যতা থাকলে তাঁর উচিত আকিদাহ ও অন্যান্য বিষয়ে দলিল খোঁজা। আর এ জন্যই আমরা এত বিস্তারিত আলোচনা করছি। দলিল অনুধাবন ও তা সঠিকভাবে আত্মস্থ করা যার পক্ষে সম্ভব না, এমন ব্যক্তির জন্য প্রমাণ জানার প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ সে ঈমানের ওপর দৃঢ় আছে এবং তার মনে কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই। তবে উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণ ছাড়া ঈমান আনা ব্যক্তিকে মুমিন গণ্য করা হবে। সে ইলমসম্পন্ন হোক বা না হোক। আর যারা মনে করেন মানুষকে প্রমাণ জানতেই হবে তারা প্রমাণ জানাকে ঈমান আনার পর প্রথম দায়িত্ব সাব্যস্ত করেন। মু'তাযিলারা বলত,

أول واجب هو النظر والاستدلال

'ব্যক্তির ওপর প্রথম দায়িত্ব হলো প্রমাণ ও যুক্তি খোঁজা।'

এ কথার সবচেয়ে সোজা জবাব হলো, প্রমাণ খোঁজা হয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। যদি কেউ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে যায়, তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

এ ব্যাপার আস-সাফারানির একটি ভাষ্য আছে, যার মাধ্যমে পুরো বিষয়টির সারাংশ ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন, 'সত্য কথা হলো, কেউ মুকাল্লিদের ঈমানের বৈধতার স্বীকৃতি দেয়াকে এড়িয়ে যেতে পারে না। মুকাল্লিদ বা অনুসারী হলো এমন ব্যক্তি, যে অন্য কারও অনুকরণ করে। অর্থাৎ যে তাকলিদ করে। তাকলিদ করা হয় সঠিক পথে পৌঁছানোর জন্য। আর মুকাল্লিদ সঠিক পথে পৌঁছানোর জন্য একটি পথ বেছে নিয়েছে।' এখানে তার কথার অর্থ হলো, প্রমাণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য সঠিক পথে পৌঁছানো। যদি কেউ তাকলিদের মাধ্যমে সঠিক পথে পৌঁছে যায়, তাহলে সে তো মূল লক্ষ্য অর্জন করেছে। এ কথার সাথে ইমাম নাওয়াউয়ী ﷫-ও একমত পোষণ করেছেন এবং মুসলিমের শরাহতে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

শাইখ আলী আল-খুদাইর[৬২] বলেছেন, 'আকিদাহর ব্যাপারে তাকলিদ করা জায়েজ, যতক্ষণ পর্যন্ত যা অনুসরণ করার কথা, সে ব্যাপারে আপনি দৃঢ় থাকবেন এবং দলিল না জানা সত্ত্বেও আপনার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না। আল্লাহ ﷻ জাযিরাতুল আরবের জেলখানা থেকে শাইখ আলী আল-খুদাইরের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। শাইখ নাসির আল-ফাহদের গ্রেফতারের

৬২ আলী বিন খুদাইর বিন ফাহদ আল-খুদাইর। ১৩৭৪ হিজরিতে রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। কাসিমে অবস্থিত জামিয়াতুল ইমাম থেকে ১৪০৩ হিজরিতে উসূল আদ-দ্বীনে ডিগ্রি নিয়ে বের হন। শাইখের শিক্ষকদের মধ্যে আছেন আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-উরদুনি, মুহাম্মাদ বিন মুহাইযি, আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আহলুশ শাইখ, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল মানসুর, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন ﷫ - সহ আরো অনেকে। এছাড়া শাইখ আলী হলেন আল্লামা হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি ﷫ এর প্রধান ও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছাত্র। মুসলিম বিশ্বের ওপর অ্যামেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফাতওয়া দেয়ার কারণে শাইখ নাসির আল-ফাহদ ও শাইখ আহমাদ আল খালিদির সাথে শাইখ আলী আল-খুদাইরকে গ্রেফতার করা হয়। আল্লাহ ﷻ তাঁদের সত্যের ওপর অটল রাখুন ও তাঁদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

www.banglakitab.weebly.com

দিন একই কারণে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তিনি তাঁদের অন্যতম। শাইখ ইবনু উসাইমিন ﷺ-ও একই উপসংহার ব্যক্ত করেছেন যে—যদি কারও মধ্যে কোনো সন্দেহ না থাকে, তাহলে আকিদাহর ব্যাপারে তাকলিদ জায়েজ।

আকিদাহর ক্ষেত্রে তাকলিদ জায়েজ হবার প্রমাণ :

তাকলিদ জায়েজ হবার দলিলগুলো কী কী? প্রথম দলিল হলো, আল্লাহ ﷻ মানুষকে বলেছেন আহলুল ইলম বা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতে। কোনো কিছু না জানলে, আল্লাহ ﷻ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন করতে বলেছেন। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওয়াহি পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো। (সূরা আন-নাহল, ৪৩)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জানো তবে (অবতীর্ণ) কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে তাদের জিজ্ঞেস করো। (সূরা আল-আম্বিয়া, ৭)

জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করুন।

কী জিজ্ঞেস করবেন?

কী জিজ্ঞেস করতে হবে আল্লাহ ﷻ সেটা এখানে বলে দেননি। একে আরবিতে বলা হয় হাযফ ফিল-মুতায়াল্লাক (حذف فى المتعلق)। ইসলামের মৌলিক বিষয় অর্থাৎ তাওহিদ নিয়ে, নাকি সাধারণ ফিকহি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে সেটা আল্লাহ ﷻ নির্দিষ্ট করে দেননি। সুতরাং উত্তর হলো সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাওহিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে—যেমন আমরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করছি অথবা যাকাত, হজ, সালাতের আহকাম বা এ রকম ফিকহি বিষয়ে—সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পন্নদের প্রশ্ন করতে বলা হচ্ছে। এটা হলো প্রথম দলিল।

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান

www.banglakitab.weebly.com

> আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ্ থেকে) বেঁচে থাকে। (সূরা আত-তাওবাহ্, ১২২)

এর অর্থ হলো ইলমসম্পন্ন একদল মানুষকে পেছনে থেকে যেতে হবে এবং অন্যান্যরা ফিরে এলে এ দলটি তাদের সতর্ক করবে, যাতে তারা ভালো ও মন্দের ব্যাপারে অবগত হতে পারে এবং পার্থক্য জানতে পারে। অর্থাৎ একদল লোক পেছনে থেকে যাবে এবং দ্বীনের শিক্ষা দেবে। লক্ষ করুন, এখানে শুধু সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে। যারা পেছনে থেকে যাবেন, তাদের মধ্য থেকে শিক্ষকরা শিক্ষা দেবেন আর অন্যরা অনুসরণ করবে। অর্থাৎ এ আয়াত অনুযায়ী সতর্ক করাই যথেষ্ট। আগের আয়াতের মতো এ আয়াতেও প্রমাণের কথা বলা হয়নি।

তৃতীয় প্রমাণ হলো, আল্লাহ ﷻ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেছেন :

فَإِنْ كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

> সুতরাং আমি তোমার নিকট যা নাযিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাকো, তাহলে যারা তোমার পূর্ব থেকেই কিতাব পাঠ করছে তাদের জিজ্ঞাসা করো। অবশ্যই তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না। (সূরা ইউনুস, ৯৪)

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ ﷺ যদি আপনি সন্দিহান হন, তাহলে লোকদের জিজ্ঞেস করুন। আর আমরা জানি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যে কোনো সন্দেহ ছিল না। সুতরাং যেহেতু তাঁকেই ﷺ প্রশ্ন করতে বলা বলা হচ্ছে, সাধারণ মানুষ তাই প্রশ্ন করতে ও অনুসরণ করতে পারবে।

এ সবগুলো আয়াতে শুধু প্রশ্ন করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রমাণ জানতে হবে—এমন কিছু বলা হয়নি। এখানে বলা হয়নি আপনাকে প্রমাণ জানতে, মুখস্থ করতে অথবা খুঁজে বের করতে হবে।

চতুর্থ প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদিস :

فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ

> সুতরাং যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দিলো, সে আমার থেকে তার জান-মালকে নিরাপদ করে নিল।[৬৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, যে ব্যক্তি বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ তার সম্পদ

---

৬৩ *সহিহুল বুখারি* : ৬৯২৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৩

www.banglakitab.weebly.com

ও রক্ত সংরক্ষিত হয়ে যাবে। যদি কেউ এগুলোর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে তবে আল্লাহ ﷻ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেন এ ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদকে সংরক্ষিত ও পবিত্র গণ্য করা হলো? কারণ, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলেছে। রাসূলুল্লাহ কী এখানে প্রমাণসহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলার কথা বলেছেন? তিনি কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার কথা বলেছেন। যদি প্রমাণ জানা বাধ্যতামূলক হতো, তাহলে তিনি ﷺ প্রমাণের কথা উল্লেখ করতেন এবং হাদিসে এর উল্লেখ থাকত।

পরবর্তী প্রমাণটির ওপর শাইখ ইবনু উসাইমিন রহ. জোর দিয়েছেন। অজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষ ইজতিহাদ করতে পারে না। পরিপূর্ণভাবে দলিল অনুধাবন ও মুখস্থ করা এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সঠিকভাবে দলিলের প্রয়োগ তারা করতে পারে না। সুতরাং যখন আপনি তাদের বলবেন দলিল জানতে, আপনি তাদের এমন কিছু করতে বলছেন তা তাদের সাধ্যের বাইরে। আর আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

> আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না। (সূরা আল-বাকারাহ, ২৮৬)

যেটা বাধ্যতামূলক এবং মূল উদ্দেশ্য তা হলো, কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। সেটা দলিলের মাধ্যমে হোক বা অনুসরণের মাধ্যমে। অধিকাংশ ফুকাহা বলেছেন, সাধারণ মানুষকে আপনি ফিকহের বিষয়ে দলিল জানতে বাধ্য করতে পারেন না, কারণ এটা তাদের জন্য অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং আমরা আকিদাহর ব্যাপারেও তাদের দলিল জানতে বাধ্য করতে পারি না, কারণ সেটা আরও দুঃসাধ্য।

হাদিস থেকে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

দিমাম ইবনু সালাবাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। দরজার কাছে উট বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, 'আমি আপনার সাথে সহজ-সরল কিছু কথা বলব।' দিমামা ছিলেন একজন বেদুইন। মানুষ হিসেবে তারা কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের। এখানে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলার চেষ্টা করছেন যে, আমার কথা বলার ধরন একটু ভিন্ন। দিমাম প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে ইবনু আব্দিল মুত্তালিব কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি ইবনু আব্দিল মুত্তালিব। দিমাম বললেন, তুমিই কি মুহাম্মাদ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমিই মুহাম্মাদ। দিমাম তখন বললেন, আমি তোমাকে সোজাসাপ্টা কিছু কথা বলব। আমি এগুলো ব্যক্তিগতভাবে নেব না, তুমিও এগুলো ব্যক্তিগতভাবে নিয়ো না।

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ-এর একত্ব নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। জিজ্ঞেস

www.banglakitab.weebly.com

করলেন, তোমাকে কি আল্লাহ পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর একত্বের শিক্ষাসহ। তারপর দিমাম পাঁচটি ফরযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। আল্লাহর কসম দিয়ে দিমাম প্রশ্ন করলেন আল্লাহ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এগুলো জানানোর জন্য পাঠিয়েছেন কি না। প্রশ্নোত্তরের পর তিনি ঈমান এনে হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এসবের সাথে কিছু সংযোজন করব না, এ থেকে কিছু অপসারণও করব না। আপনি যা কিছু বললেন সবকিছু আমি বিশ্বাস করব। দেখুন, দিমাম তাওহিদ, শাহাদাহ, ফরয এবং দ্বীনের পাঁচটি স্তম্ভ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কোনো সন্দেহ ছাড়া তিনি ঈমান গ্রহণ করলেন এবং চলে গেলেন।[৬৪]

সহিহ মুসলিমের শরাহতে ইমাম নাওয়াউয়ী ؒ এ হাদিসটি নিয়ে মন্তব্য করেছেন, ইমামরা যখন বলেন যে, সাধারণ লোকদের মধ্যে যারা তাকলিদ করে তাদের মুমিন হবার জন্য প্রমাণ জানা শর্ত না–এটা তার প্রমাণ। আন-নাওয়াউয়ী ؒ মু'তাযিলাদের বিপরীতে বলেছেন, কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা ছাড়া দৃঢ় বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট এবং এই হাদিস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কীভাবে এই হাদিস থেকে এর পাওয়া যায়? কারণ, দিমাম ؓ কোনো প্রমাণ ছাড়া ঈমান এনেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঈমান অনুমোদন করেছিলেন। তাদের কথোপকথনে প্রমাণের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়নি যে, তুমি কি এই প্রমাণটা সম্পর্কে জানো, ওই মু'জিযা সম্পর্কে জানো? সুতরাং এটা হলো দলিল যে, ঈমান আনার জন্য প্রমাণ জানা আবশ্যক না।

পরবর্তী প্রমাণ হলো, সাহাবা ؓ অনারবদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পর যেসব লোক ঈমান আনল, সাহাবি ؓ গণ তাঁদের ঈমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। বেদুইন কিংবা অনারবদের কাউকে মু'তাযিলাদের কথামতো বসে বসে প্রমাণ বলতে বাধ্য করা হয়নি। কারও পরীক্ষা নেয়া হয়নি। কাউকে প্রশ্ন করা হয়নি কোন দলিলের ভিত্তিতে তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বললে?

এ ব্যাপারে আলিমদের কিছু বক্তব্য দেখুন।

ইমাম নাওয়াউয়ী ؒ বলেছেন, যে সত্যিকার ভাবে বিশ্বাস করে শাহাদাহ উচ্চারণ করবে, সে মুমিন–যদি সে মুকাল্লিদও হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ শাহাদাতের উচ্চারণকে যথেষ্ট মনে করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে তাওহিদ ও আকিদাহর প্রমাণ জানতে চাননি। আর এ ব্যাপারে যে হাদিসগুলো আছে সেগুলো সহিহ এবং মুতওয়াতির। এটা হলো আন-নাওয়াউয়ী ؒ-এর বক্তব্য।

ইবনু আকিল ؒ বলেছেন, দলিল জানা মূল উদ্দেশ্য না। দলিল জানা হলো দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছানোর উপায়। যদি দলিল ছাড়া এটা অর্জিত হয়, তাহলে সেটাই যথেষ্ট।

---

৬৪ *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৮০; *মুসনাদু বাযযার* : ৫২১৯

www.banglakitab.weebly.com

আল ফাসলের চতুর্থ খণ্ডে, পৃষ্ঠা ৩৫-এর আশেপাশে ইবনু হাযম ﷬ বলেছেন, মু'তাযিলারা ছাড়া অন্য সবাই বলেছে যে, কেউ যদি অন্তরে সত্যিকারের বিশ্বাস রাখে, সেটা মুখে উচ্চারণ করে, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে, মুহাম্মাদ ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সবকিছুর সত্যায়ন করে এবং এ ছাড়া অন্য সকল কিছুকে অস্বীকার করে, তাহলে সে একজন বিশ্বাসী–যদিও সে মুকাল্লিদ হয়। দলিল জানা এখানে কোনো পূর্বশর্ত না।

ইবনু কুদামা ﷬ উসুল নিয়ে লেখা তার বইয়ে (*রাওদ্বাতুন নাদ্বির*) বলেছেন, মুকাল্লিদের ঈমান ঠিক আছে। *রাওদ্বাতুন নাদ্বির* নিয়ে মন্তব্য করার সময় সমকালীন আলিমদের মধ্যে শানকিতি ﷬ এ মত গ্রহণ করেছেন। যেমনটা কিছুক্ষণ আগে বললাম–আস সাফারিনি বলেছেন, সত্য কথা হলো কেউ মুকাল্লিদের ঈমানের বৈধ হওয়াকে এড়িয়ে যেতে পারে না। এ ছাড়া শাইখ আলী আল-খুদাইর ও শাইখ ইবনু উসাইমিন ﷬-সহ অন্যান্যরা কী বলেছেন সেটাও এরই মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বুনিয়াদি বিষয় : ইলমের ওপর আমল করা :

চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের দ্বিতীয়টি হলো–ইলমের ওপর আমল করা।

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة : العملُ بِهِ

আমলের শ্রেণিবিভাগ :

এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে ইসলামে কীভাবে কাজ বা আমলের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণি হলো এমন আমল যেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে–অর্থাৎ ওয়াজিব, ফরয। তার পরের শ্রেণি হলো এমন কাজ যা করা বাধ্যতামূলক না, কিন্তু করলে তার জন্য আপনি পুরস্কৃত হবেন। এগুলো হলো সুন্নাহ, মুস্তাহাব। তার পর হলো মাকরুহ অর্থাৎ অপছন্দনীয় আমল, আর তারপর হারাম আমল।

হারাম থেকে বিরত থাকার কারণে কি মানুষ পুরস্কৃত হবে?

হারাম কাজ ও যেসব কাজ শিরক সেগুলোর ব্যাপারেও ইলমের ওপর আমল করার বিষয়টি প্রযোজ্য। এসব ব্যাপারে ইলম প্রয়োগের অর্থ হলো এগুলো ত্যাগ করা ও এগুলো থেকে দূরে থাকা। পাপ ও শিরক ত্যাগ করা ইলম অনুযায়ী আমল করার অন্তর্ভুক্ত। হারাম কাজের ক্ষেত্রে ইলম অনুযায়ী আমল করলে, অর্থাৎ শিরক ও পাপ বর্জন করলে কি ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে? এর উত্তর দু-রকম হতে পারে। যদি সে আল্লাহ ﷻ-এর জন্য এগুলো ত্যাগ করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে অবস্থা হলো বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত এ হাদিসের ব্যক্তির মতো–যে

www.banglakitab.weebly.com

ব্যক্তি কোনো পাপ কাজের কথা চিন্তা করে অথবা করার ইচ্ছা করে, যদি সে ওই পাপ কাজটি করে তাহলে একে তার আমলনামায় একটি গুনাহ হিসাবে লেখা হবে। যদি সে কেবল গুনাহর কথা চিন্তা করে ও ইচ্ছা করে–তবে সেটা লেখা হবে না। একই হাদিসের অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে পুরস্কারের আশায় সেই পাপ কাজটি করা থেকে বিরত থাকলে সে এর জন্য পুরস্কৃত হবে।[৬৫]

এটা হলো প্রথম অবস্থা। পাপ কাজ করার ইচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহ ﷻ-এর জন্য তা থেকে বিরত থাকলে ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে।

আর পাপ কাজের ইচ্ছে হবার পর, অলসতা বা অক্ষমতার কারণে যদি কেউ সেই পাপ থেকে বিরত থাকে–তবে সে ক্ষেত্রে সে পুরস্কার পাবে না। যেমন : দোস্তরা তাকে নিতে না আসার কারণে সেদিন ছেলেটির বারে যাওয়া হলো না। আর তারপর সে বলল, আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো আজকে পুরস্কার পাচ্ছি। না, এ ক্ষেত্রে সে পুরস্কার পাবে না। কারণ, পাপ কাজ থেকে সে আল্লাহ ﷻ-এর জন্য বিরত হয়নি, তার বারে যাওয়া হয়নি দোস্তরা গাড়ি নিয়ে না আসার কারণে। কেউ কোনো মেয়েকে প্রস্তাব দেয়ার পর মেয়েটি তা প্রত্যাখ্যান করল। আর তারপর সেই লোক বলল, আলহামদুলিল্লাহ, আমি যিনা করিনি তাই পুরস্কার পাব। না, সে এ ক্ষেত্রে পুরস্কার পাবে না, কারণ তার জন্য সম্ভব হচ্ছে না বলে সে যিনা থেকে বিরত থেকেছে। যদি এমন হতো যে পাপ করার সব সুযোগ তার সামনে থাকার পরও সে বলল, আমি আল্লাহ ﷻ-এর জন্য এ পাপ করা থেকে বিরত থাকলাম–তাহলে সে পুরস্কার পাবে। পাপের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ ﷻ-এর জন্য সেটা বর্জন করলে আপনি পুরস্কৃত হবেন। সুযোগ না থাকার কারণে পাপ করলেন না, এ ক্ষেত্রে আপনি কোনো পুরস্কার পাবেন না। সুতরাং ইলমের ওপর আমল করার ব্যাপারটি হারামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইলম প্রয়োগের অপরিহার্যতা :

লেখক তাঁর আলোচনাতে প্রথমে ইলমের আর তারপর ইলমের ওপর আমল করার কথা এনেছেন। কারণ, ইলমের দ্বারা নিয়ত এবং কর্মপদ্ধতি বিশুদ্ধ হবার মাধ্যমে আমল সঠিক হয়। এখন আসুন ইলম অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া যাক।

সালাফদের সাথে আমাদের বর্তমান যুগের মানুষদের একটা বড় পার্থক্য হলো–ইলম অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৬৫ *সহিহ মুসলিম* : ৩৪৯; *সহিহুল বুখারি* : ৭৫০১

www.banglakitab.weebly.com

> তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো, তবে কি তোমরা বোঝো না? (সূরা বাকারাহ, ৪৪)

প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ এখানে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছেন। তোমরা মানুষকে যা করতে বলো, নিজেরা সেটা করো না? যা আপনি জানেন, প্রচার করেন—সেটা অনুযায়ী আমল না করার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ তিরস্কার করছেন। এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল বনি ইসরাইলের আলিমদের ব্যাপারে। তবে এ আয়াতটি প্রযোজ্য উম্মাতে মুহাম্মাদির আলিম, সাধারণ মানুষ এবং অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রেও।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে থেকে যারা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল তাদের মদীনার ইহুদিরা ইসলামের ওপর থাকতে বলত। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষার ওপর থাকতে বলত, কারণ তিনি সত্য বলছেন। কিন্তু তারা নিজেরা ঈমান আনতো না। যা প্রচার করত সেটা অনুযায়ী তারা আমল করত না। তাই তাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়।

ইবনু জারির আত-তাবারি ﷺ বলেছেন, বনি ইসরাইলের আলিমরা সাধারণ ইহুদিদের বলত আল্লাহ ﷻ-এর আদেশ মেনে চলতে ও সৎ কাজ করতে। কিন্তু নিজেরা পাপ করত। এ আয়াত তাদের জন্য তিরস্কার। কিন্তু এখানে কেন তিরস্কার করা হচ্ছে? ভালো কাজ করতে বলার কারণে কিন্তু তাদের তিরস্কার করা হচ্ছে না। তিরস্কার করা হচ্ছে, কারণ তারা নিজেরা ভালো কাজ করত না। বিষয়টি লক্ষ করুন, আমি চাই না কেউ ভাবুক যে, তালিবুল ইলমদের দায়িত্ব অনেক বেশি, তাদের অনেক সতর্ক থাকতে হয়, এর চেয়ে বরং অজ্ঞ থাকা সোজা আর নিরাপদ। তাই আমি ইলম শেখাই বন্ধ করে দেবো।

এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা, আর নিজের বেলায় এর বাস্তবায়ন—এ দুটো আলাদা জিনিস। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ হলো এক দিক, আর নিজের বেলায় এর বাস্তবায়ন হলো আরেকটি আলাদা দিক। দুটো করাই বাধ্যতামূলক। তাই কোনো একটি ছুটে গেলে অন্যটি ছেড়ে দেয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে আরেকটি মত থাকলেও এটাই হলো সঠিক মত। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা আমাদের দায়িত্ব। আবার আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং কাছের মানুষদের মধ্যে এর বাস্তবায়নও আমাদের দায়িত্ব। কোনো কারণে একটির ক্ষেত্রে কমতি হলে, অন্যটি বন্ধ করে দেয়া যাবে না। যদিও অনেকে বলেছেন, কেউ নিজে কোনো গুনাহতে লিপ্ত থাকলে তার উচিত না অন্যদের সেই গুনাহ করতে মানা করা। কিন্তু দুটি মতের মধ্যে এ মতটি দুর্বল।

আমরা যে আয়াতটির কথা বললাম, মূলত এখানে বলা হচ্ছে—তোমরা সৎ কাজের আদেশ করছ, এটা সঠিক। কাজেই তোমরা নিজেরাও এ উপদেশের অনুসরণ করো। এখানে বলা হচ্ছে না যে, যদি নিজে না করো তাহলে সেটা বলাও বন্ধ করো। বরং বলা হচ্ছে—তোমরা সত্য বলছ, নিজেরাও সেই সত্যের অনুসরণ করো। মানুষকে যে মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে

www.banglakitab.weebly.com

বলছ নিজেরাও সেগুলো থেকে বিরত হও। নিজেদের সংশোধন করার কাজও করো। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার কারণে এখানে তিরস্কার করা হচ্ছে না। বরং বলা হচ্ছে যা বলছ, যা শেখাচ্ছ নিজেও সেটার অনুসরণ করো।

সূরা হূদে আমরা পাচ্ছি যে শু'আইব ﷺ বলছেন :

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

'যে কাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমতো সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোনো তাওফিক নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।' (সূরা হূদ, ৮৮)

যে ব্যক্তির আমল তার ইলমের সাথে মেলে না :

বুখারি ও মুসলিমে একটি হাদিস আছে, হাদিসটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। উসামা বিন যাইদ ﷺ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

(ভাবানুবাদ) একজন ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামে রাখা হবে। আরেক বর্ণনাতে আছে, এই ব্যক্তি হলো জাহান্নামে প্রবেশ করানো প্রথম ব্যক্তি। জাহান্নামের আগুনের ভেতর চক্রাকারে সে ঘুরতে থাকবে। যেভাবে গাধা বা গরু ঘানি টানতে থাকে। তার চারপাশে জাহান্নামের বাসিন্দারা এসে জড়ো হবে আর বলবে, হে অমুক, হে শাইখ, হে আলিম–আপনিই না আমাদের সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করতেন? আমাদের সামনে সুন্দর খুতবা দিতেন, টিভি চ্যানেলে আসতেন আর বলতেন কী কী করা উচিত? আপনি না টুইট করতেন, ফেইসবুক স্ট্যাটাস দিতেন, আপনার বিভিন্ন ভিডিও না আমরা ইউটিউবে দেখতাম? আপনিই না আমাদের শেখাতেন কী করা উচিত আর কী বর্জন করা উচিত? আপনি এখানে কী করছেন?

এ ব্যক্তিকে জাহান্নামে দেখতে পেয়ে জাহান্নামের বাসিন্দারা অবাক হবে, বিস্মিত হবে। কারণ, দুনিয়াতে সে ছিল একজন শাইখ, একজন আলিম। তারা অবাক হবে কারণ এই ব্যক্তিকে

www.banglakitab.weebly.com

দুনিয়াতে ধার্মিক, দ্বীনদার ও ন্যায়পরায়ণ মনে করা হতো। প্রশ্নের জবাবে লোকটি বলবে, আমি অন্যদের সৎ কাজের আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে করতাম না। অন্যদের অসৎ কাজে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতাম না।[৬৬]

সহিহ তারগিব ওয়াত তারহিবে লেখক বলেছেন, এ হলো এমন এক ব্যক্তি যার আমল তার ইলমের সাথে মিলত না। সে তার ইলমের ওপর আমল করত না।

ব্যক্তি তার ইলমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে :

*তিরমিযি ও দারিমি*তে একটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ

চারটি বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়া ছাড়া কিয়ামতের দিন কেউ এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না। যে বিষয়টির ব্যাপারে সে প্রথমে জিজ্ঞাসিত হবে তা হলো কীভাবে সে তার জীবন কাটিয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে তার ইলমের ব্যাপারে। সে কি অর্জিত জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে ও জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে? বিশেষ করে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। তৃতীয় প্রশ্ন হবে তার সম্পদ নিয়ে। কীভাবে সে সম্পদ অর্জন করেছে এবং কীভাবে খরচ করেছে। চতুর্থ প্রশ্ন হবে কীভাবে সে তার যৌবন কাটিয়েছে।[৬৭]

এই চারটি বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়া ছাড়া কেউ এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না। আমরা এখানে হাদিসটি উল্লেখ করলাম কারণ এ হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিচারের দিনে অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। অর্জিত জ্ঞানের ওপর আমল করা হয়েছে কি না–এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে। ইলম মস্তিষ্কে মজুদ করে রাখার জিনিস না। ইলম হলো আমলের জন্য।

ব্যক্তি নিজে যা করে না, তা বলা :

তাবারানির মু'জামুল কাবিরে একটি হাদিস আছে, মুনযিরি ﷬ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ইলমসম্পন্ন ব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজে সেই ইলম বাস্তবায়ন করতে ভুলে যায়, তার অবস্থা হলো মোমবাতি বা প্রদীপের মতো। সে অন্যকে

৬৬ *সহিহুল বুখারি* : ৩২৬৭; *সহিহ মুসলিম* : ৭৬৭৪
৬৭ *সুনানুত তিরমিযি* : ২৪১৭; *সুনানুদ দারিমি* : ৫৪৬

www.banglakitab.weebly.com

আলো দেয়, কিন্তু নিজে জ্বলে যায়।[৬৮]

এটা হলো নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দেয়া উদাহরণ। *মুসনাদে আহমাদ, সহিহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ইবনু হিব্বান* এবং *আল-বায়হাকি*তে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالُوا خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ

ইসরা ওয়াল মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কিছু লোককে দেখলেন যাদের ঠোঁট ও জিহ্বাগুলো আগুনের ছুরি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। প্রতিবার কাটার পর এগুলো আবার আগের অবস্থায় ফেরত যাচ্ছিল। আবার সেগুলো কাটা হচ্ছিল। এভাবে চলতে থাকছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে ছিলেন জিবরিল ﷺ। রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন করলেন, জিবরিল, এরা কারা? কেন তারা এভাবে কষ্ট পাচ্ছে? জিবরিল ﷺ জবাব দিলেন, এরা হলো আপনার উম্মাহর বক্তারা। তারা যা বলত, নিজেরা তা করত না।[৬৯]

অনুপকারী ইলম :

সহিহ মুসলিমে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি অনুপকারী ইলম থেকে, আল্লাহর ভয়হীন অন্তর থেকে, অতৃপ্ত নফস থেকে এবং এমন দুআ থেকে যার উত্তর দেয়া হয় না।[৭০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, 'আমি অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।'

যদি এই পুরো আলোচনা থেকে একটি মাত্র জিনিস মনে রাখেন, তাহলে এই হাদিসটি মনে রাখুন। আল্লাহর কসম! সত্যিকারভাবে এ হাদিসের অর্থ অনুধাবন করলে আপনি নিদারুণ মনোবেদনা অনুভব করবেন। তীব্র অন্তর্জ্বালায় ভুগবেন যদি আপনি আসলেই হাদিসের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। একটু নিজেদের সাথে সৎ হয়ে প্রশ্ন করুন, আমরা কয়জন এ দুআ করি?

৬৮ তাবারানি, *মু'জামুল কাবির* : ১৬৮১
৬৯ *মুসনাদু আহমাদ* : ১২২৩২; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৩৯৯৬
৭০ *সহিহ মুসলিম* : ৭০৮১

www.banglakitab.weebly.com

যারা এ হালাকাগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে, আমি তাদের উত্তমদের মধ্যে উত্তম মনে করি, ইন শা আল্লাহ। আমরা এখানে এমন জ্ঞানের কথা আলোচনা করি যা দুনিয়াবি প্রাপ্তির জন্য না। এখানে অর্থের লেনদেন হয় না, আমরা জনপ্রিয়তা কিংবা কোনো প্রতিযোগিতার খাতিরে এগুলো করি না। মেয়েদের সাথে কথা বলতে বা বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে মেলামেশা করতে কেউ এখানে আসে না। আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের ত্রুটি নিয়ে আজ অনেকে প্রেমের ফিকহ বা এ-জাতীয় নামের আড়ালে নারী-পুরুষের মিলন-সংক্রান্ত কৌতুক শোনায়, কিন্তু এখানে সেটা হয় না। কেউ এখানে এসবের জন্য আসে না।

এখানে তাঁরাই আসে যারা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী এবং অন্য সব রাসূল আলাইহিমুস সালামের মানহাজ অনুযায়ী তাওহিদের হেদায়তের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। আর তারাই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাহক। এমন মানুষেরাই উম্মাহকে পুনর্জীবিত করে, উম্মাহকে টেনে তোলে পরাজয় ও অন্ধকারের গহ্বর থেকে এবং স্বভাবতই এমন মানুষেরা পূর্ববর্তী ও রাসূল আলাইহিমুস সালামের মতো পরীক্ষিত হন। এটাই তাওহিদ, এটাই ইসলাম। হয় এভাবে গ্রহণ করবে, অন্যথায় তুমি যেতে পারো। এভাবেই আমরা তাওহিদের শিক্ষা দিই।

কাজেই ইন শা আল্লাহ আপনারা হলেন ওইসব হাতে গোনা মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা গুরুত্বের সাথে এই দ্বীন ও তাওহিদ শেখে। অথচ হাতেগোনা এ কয়েকজনের মধ্যেই বা ক'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ দুআ করেন? 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না?' আমি জানি যারা এখানে আমাদের সাথে ক্লাস করেন এবং যারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাসগুলো দেখেন তাদের অনেকেরই উদ্দেশ্য হলো ইলমসম্পন্ন হওয়া। তাদের অনেকে দুআ করেন এবং বলেন :

'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।' (সূরা আত-ত্বহা, ১১৪)

কিন্তু আমরা কয়জন অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আশ্রয় চাই? নিজের সাথে সৎ হয়ে জবাব দিন। অনুপকারী ইলম বলতে ওই ইলমকে বোঝানো হয় যা প্রয়োগ করা হয় না। আমার ভয় হয়, যদি আমরা এ নিয়ে একটি জরিপ করি, তাহলে সেটার ফলাফল আমাদের হতাশ করবে। আসুন নিজেদের প্রতি সৎ হয়ে এ প্রশ্নের জবাব দিই। শেষ কবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে, আল্লাহ ﷻ-এর সামনে বৃষ্টিভেজা কম্পমান পাখির মতো আমরা দুআ করেছি, ভিক্ষা চেয়েছি–আল্লাহ ﷻ যেন আমাদের এমন ইলম থেকে হেফাযত করেন, যা উপকারে আসে না?

এটাই হলো খালাফদের সাথে সেই সালাফদের পার্থক্য যারা উম্মাহর ইতিহাস গড়েছেন। এটাই পরবর্তীদের সাথে পূর্ববর্তীদের পার্থক্য। উম্মাহকে টেনে তোলার জন্য যে কারিকুলাম দরকার সেটা আমাদের সামনে আছে। নতুন কিছুর প্রয়োজন আমাদের নেই। তথাকথিত মুফাক্কিরদের ও চিন্তাবিদদের লম্বা লম্বা কথার আমাদের প্রয়োজন নেই, ওইসব লোকদের প্রয়োজন নেই যারা ইসলামকে বদলে দিতে চায়। উম্মাহর পুনর্জাগরণের কারিকুলাম আমাদের

www.banglakitab.weebly.com

সামনেই আছে। দিকনির্দেশনা আমাদের কাছেই আছে এবং এটা অপরিবর্তিতভাবে আমাদের সামনে আছে চৌদ্দ শ বছরের বেশি সময় ধরে। সমস্যা হলো প্রয়োগে, বাস্তবায়নে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুআ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফল হয়েছিল সাহাবি ﷺ-দের ইলমের প্রয়োগ করাতে। কাগজে ছাপানো যেসব আয়াত ও হাদিস আমরা পড়ি, সাহাবি ﷺ-দের অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলো গেঁথে দিয়েছিলেন। এই ইলমকে তিনি এমন এক দিকনির্দেশনায় পরিণত করেছিলেন যার ওপর সাহাবি ﷺ-গণ আমল করেছিলেন এবং এটি তাঁদের জন্য একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। এটাই হলো তাদের সাফল্যের রহস্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে বিধ্বস্ত, মরুভূমির বুকে পরস্পর যুদ্ধরত, ধ্বংসাত্মক (anarchists) বেদুইনদের পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সফল জাতিতে পরিণত করেছিলেন? প্রায় চোখের পলকে, বিদ্যুৎ চমকের মতো এ জাতি সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাসে এমন নজির আর নেই। কীভাবে? এই সেই গোপন চাবিকাঠি।

১৩ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যস্ত ছিলেন সাহাবি ﷺ-দের অন্তরে এই তাওহিদ ও আকিদাহ গেঁথে দেয়ার কাজে। কাগজ, সিডি, ইউটিউব কিংবা ইন্টারনেটে না, তিনি তাঁদের অন্তরে এই ইলম বসিয়ে দিচ্ছিলেন। সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের তালিবুল ইলমের কাছেও আজ যত বই থাকে, উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করা অনেক আলিমের কাছে এত বই ছিল না। যেমন : মাকতাবাতুশ শামিলাহ নামে একটা সফটওয়্যার আছে, ডাউনলোড করা যায়। এতে হাজার হাজার খণ্ড বই আছে। যদিও আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এখনো এটা তেমন একটা দেখার সুযোগ পাইনি। যে ইলম পূর্ববর্তীদের ছিল সেটা আজ আমাদের হাতের কাছে। এই ইলমের বিন্যাস, পরিমাণ, ইচ্ছেমতো কাগজে কিংবা সিডিতে নিতে পারা, ইচ্ছেমতো এর মধ্য থেকে যেকোনো একটা তথ্য খুঁজে বের করতে পারা—সব মিলিয়ে যেদিক থেকেই দেখুন না কেন ইতিহাসবিখ্যাত আলিমদের চেয়েও বেশি ইলম এখন আমাদের হাতের নাগালে।

কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইয়াকুব ﷺ-এর ব্যাপারে বলেছেন :

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

> আর সে ছিল জ্ঞানী, কারণ আমি তাকে শিখিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সূরা ইউসুফ, ৬৮)

কাতাদা ﷺ বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো তাঁকে জ্ঞান প্রয়োগ করার সক্ষমতা দান করা হয়েছিল। আমরা যা শিখিয়েছিলাম সেটা প্রয়োগ করার যোগ্যতা তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

سئل سفيان الثوري: طلب العلم أحب إليك يا أبا عبد الله أو العمل. فقال : إنما يراد العلم

www.banglakitab.weebly.com

للعمل، لا تدع طلب العلم للعمل، ولا تدع العمل لطلب العلم

সুফিয়ান আস-সাওরি ﷀ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কি ইলম অর্জন করতে পছন্দ করেন নাকি অর্জিত ইলম প্রয়োগ করতে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ইলম তো অন্বেষণ করা হয় আমলের জন্য। তাই কখনো আমল করার জন্য ইলম অর্জন ছেড়ে দিয়ো না, আর ইলম অর্জনের জন্য আমল করা ছেড়ে দিয়ো না।[৭১]

সুফিয়ান আস-সাওরি ﷀ এখানে কী বলতে চাচ্ছেন? মূলত তিনি বলছেন, ইলম ও ইলমের প্রয়োগ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা যায় না।

ইমাম আহমাদ ﷀ তাঁর ছাত্রদের একবার বলেছিলেন, কোনো হাদিসের ওপর আমল করার আগে আমি সেটা বর্ণনা করিনি। একবার একটি হাদিসে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তীবার কাছে হিজামা করানোর জন্য গিয়েছিলেন এবং এ জন্য তাকে এক দিনার দিয়েছিলেন। তারপর আমিও একজনের কাছে গিয়ে হিজামা করালাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দাম দিয়েছিলেন সেই দামই দিলাম, যাতে করে আমি হুবহু সুন্নাহর অনুসরণ করতে পারি। ইমাম আহমাদ ﷀ এখানে বলছেন, এমন কোনো হাদিস তিনি বর্ণনা করেননি যেটার ওপর তিনি আগে আমল করেননি! *মুসনাদু আহমাদে* প্রায় ৪০ হাজার হাদিস আছে। আর ১০ লক্ষেরও বেশি তাঁর হাদিস মুখস্থ ছিল। তিনি এ সবগুলোর ওপর আমল করেছিলেন? এটা কি আদৌ সত্য হতে পারে? নিশ্চয় ইমাম আহমাদ ﷀ কখনো এমন দাবি করবেন না যা তিনি করেননি। ইব্রাহীম আল-হারবি ﷀ বলেছেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷀ-এর সাথে ছিলাম। আমি ছিলাম তার সাথি। বিশ বছর ধরে, শীত-গ্রীষ্ম, দিন-রাতনির্বিশেষে আমি এমন কোনো দিন পাইনি যেই দিন ইমাম আহমাদ ﷀ বিগত দিনের চেয়ে বেশি আমল করেননি। বিশ বছর ধরে দিন-রাত, প্রতিদিন তিনি আগের দিনের চেয়ে বেশি আমল করছিলেন, ইলমের প্রয়োগ করছিলেন।

ইলমমুখী হবার পর অর্জিত ইলমের প্রভাব সালাফদের মধ্যে প্রকাশ পেত। সেই ইলম প্রকাশ পেত তাঁদের নম্রতা, বিনয়, কথা ও আমলের মধ্য দিয়ে। এভাবে ইলম তাঁদের প্রভাবিত করত। অথচ আজ এমন অনেক তালিবুল ইলম হবার দাবিদার আছে যারা কিছুদিন আগেও বারে ছিল, আর এখন উম্মাহর মহিরুহদের বিরুদ্ধে তারা মুখের লাগাম খুলে দেয়। এমন সব মানুষদের আক্রমণ করে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর খেদমতে যাদের জুতাতে লেগে থাকা ধুলোর সমানও তারা হতে পারবে না। কিছুদিন আগে তুমি বারে সময় কাটাতে, এখন হঠাৎ তালিবুল ইলম হয়ে তুমি মহিরুহদের খণ্ডন করা শুরু করে দিয়েছ? এখানে আমি শুধু বাতিল মুরজিআদের কথা বলছি না। বরং ওইসব লোকদের কথাও বলছি যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মর্ডানিস্টদের সাথে এক হয়ে তাওহিদের সত্যিকারের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কথা

৭১ আসবাহানি, *হিলইয়াতুল আওলিয়া* : ৩/১৫১

www.banglakitab.weebly.com

বলে। দুই দিন আগে যে র‍্যাপ করত সে এখন উম্মাহর মহিরুহদের কথা খণ্ডন করতে চায়। বার ও ক্লাবে সময় কাটানো লোক এখন আলিম আর যারা তাদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় উজাড় করে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তাঁদের আক্রমণ করে, অপবাদ দেয়—তাদের বিষাক্ত গোশত চাবায়। কেন?

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ

পূর্ববর্তীরা এমন মানুষ ছিলেন যে ইলম অর্জন করার শুরু করামাত্র সেটা তাদের মধ্যে প্রকাশ পেত। তাদের খুশু, বিনয়, নম্রতা, কথা ও কাজের মাঝে সেটা প্রকাশ পেত। আদবের ব্যাপারে না জানার কারণে কি কারও মধ্যে আদব ও ভদ্রতার অভাব হয়? আপনি কি মনে করেন, এমন লোকেরা তাদের সীমালঙ্ঘন, হাতের কামাই আর অপবাদের বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না? তারা জানে। কিন্তু এটা হলো অনুপকারী জ্ঞানের ফসল। নইলে কেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দুআতে এ ব্যাপারে জোর দেবেন?

এমন অনেকে আছে যা তিরের বেগে আল ওয়ালা ওয়াল বারার বই পড়ে শেষ করে ফেলে। ধারালো তিরের মতো ঢুকে বের হয়ে যায়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এর কোনো বাস্তবায়ন থাকে না। ইলম লা ইয়ানফা—এমন ইলম যা উপকারে আসে না।

আল জামি লি আহকামিল কুরআনে একটি বর্ণনা আছে। আবু উসমান আল-হায়ইরি নামে একজন আলিম হালাকা শুরু করার জন্য বসলেন। ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলার পর নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। চুপ করে আছেন তো আছেন। একসময় আবুল আব্বাস প্রশ্ন করলেন, শাইখ কী হয়েছে? হালাকা কখন শুরু হবে? শাইখ তাঁর মাথা তুলে কাঁদতে শুরু করলেন আর বললেন,

وَغَيْرُ تَقِيٍّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَى طَبِيبٌ يُدَاوِي وَالطَّبِيبُ مَرِيضُ

> একজন তাকওয়াবিহীন লোক (এখানে তিনি নিজেকে বোঝাচ্ছেন), মানুষকে তাকওয়ার আদেশ দিচ্ছে। যেন একজন ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছে, অথচ সে নিজেই রোগী।[৭২]

উপস্থিত সবাই কাঁদতে শুরু করল। ইলমের ওপর আমল করা, অর্জিত ইলম প্রয়োগ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তারা জানতেন।

বিখ্যাত কবি আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলির এ ব্যাপারে একটি কবিতা আছে,

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ هَلاَّ لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ

হে অন্যকে শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি, তোমার কি উচিত না নিজেকে শিক্ষা দেয়া?

---

৭২ বাইহাকি, *শুয়াবুল ঈমান*: ৬৮১২

www.banglakitab.weebly.com

فابْدأْ بِنفسِك فانْهها عنْ غيّها فإذا انْتهتْ عنْهُ فأنْت حكِيمُ

নিজেকে দিয়ে শুরু করো, তাকে বিরত করো, যদি নিজেকে বিরত করায় সফল হও তাহলেই তুমি প্রজ্ঞাবান।

فهُناك يقْبلُ ما تقُولُ ويقْتدى بِالْقوْلِ مِنْك وينْفعُ التّعْلِيمُ

আর তখন তোমার কথা গৃহীত হবে, তা অনুসৃত হবে এবং তোমার দেয়া শিক্ষা উপকারী হবে।

لا تنْه عنْ خُلُقٍ وتأْتِي مِثْله عارٌ عليْك إذا فعلْت عظِيمُ

যে কাজে তুমি অন্যকে মানা করো, কেন নিজে তা-ই করো? ধিক তোমার জন্য, যদি এমন করো।'[৭৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ

হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি অনুপকারী ইলম থেকে।

এ দুআর অর্থ এখন বুঝতে পেরেছেন? কথার ফুলঝুরি আর ইলম আজ সহজলভ্য, কিন্তু ইলম অনুযায়ী আমল দুর্লভ। এসব বলে আমি আপনাদের ইলম অর্জন করা থেকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছি না। বরং এর মাধ্যমে আপনাদের অনুপ্রাণিত করতে চাইছি অর্জিত ইলমের ওপর আমল করার জন্য। মানুষকে যে কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছেন, নিজেও তা থেকে বিরত হোন। মানুষকে যে কাজ করতে বলছেন, নিজেও সেটা করুন।

---

৭৩ মাওয়ারদি, *আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ দ্বীন*, পৃ. ১৪

www.banglakitab.weebly.com

দারস ৬

অপ্রয়োজনীয় ইলম :

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হলো, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করা। আশ-শাতিবি ﷺ বলেছেন, 'যে ইলম আমলের ক্ষেত্রে কোনো উপকারী ভূমিকা রাখে না, সেই ইলম প্রশংসনীয় হবার পক্ষে শারীয়াহ থেকে কিছু পাওয়া যায় না।

সব সময় মনে রাখবেন আমল দুই ধরনের–বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। কিছু কিছু মানুষ অন্তরের আমলকে আমলই মনে করে না, আসলে এ-ও কিন্তু আমল। ঈমান হলো অন্তরের একটি আমল, যা ইলমের ফলস্বরূপ উৎসারিত হয়। ইলমের ওপর আমল অভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক, দুভাবেই হতে পারে। যেমন : আল্লাহ ﷻ-এর নাম, সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমরা কী পাই? আসলে এতে অনেক উপকার আছে, যার মধ্যে আছে একটি অন্তরের আমলও–সত্য, সুদৃঢ় ও মজবুত ঈমান (তাসদিক)। ইলম অর্জনের আরও একটি উদ্দেশ্য হলো, বাহ্যিক আমল। আমরা সবাই এ বিষয়ে জানি তাই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। সালাত, যিকির, হজ, ওযু, তাহারাত ইত্যাদি বাহ্যিক আমলের কিছু উদাহরণ।

ইলম ও আমলের পার্থক্য :

ইলম ও আমল সম্পূর্ণ আলাদা দুটো বিষয়। এগুলো আলাদা বলেই আপনার ইলম আছে মানেই যে আপনি আমলদার, ব্যাপারটা এমন না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

www.banglakitab.weebly.com

يَعْلَمُونَ

'আমি যাদের কিতাব দান করেছি, তারা তাকে এমনভাবে চেনে, যেমন চেনে আপন পুত্র ও সন্তানদের। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে (অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত মুহাম্মাদ ﷺ-এর গুণাবলিসমূহ অস্বীকার করে)।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৪৬)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তারা আল্লাহ ﷻ-এর প্রেরিত রাসূল হিসেবে চিনতে পেরেছিল। আল্লাহ ﷻ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে তারা জানত। তাদের ইলম ছিল। কিন্তু তারা কি ইলমের ওপর আমল করেছিল? না, ইলম থাকা সত্ত্বেও তারা এর ওপর আমল করেনি। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ইলম ও আমল আসলে দুটো ভিন্ন জিনিস। ইলম থাকা সত্ত্বেও অনেকে হয়তো এর ওপর আমল না-ও করতে পারে। ইলম ও আমলের এই ভিন্নতার বিষয়টি আমাদের সবারই তাই মাথায় রাখতে হবে।

সূরা আল-বাকারাহর এ আয়াতে যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ইলমের অধিকারী হবার ব্যাপারটি জানানো হয়েছে, তেমনিভাবে কুরআনের অন্যান্য আয়াতে ইলমের ওপর আমল না করার কারণে তাদের কঠোরভাবে তিরস্কারও করা হয়েছে। ইলম থাকা সত্ত্বেও একে আমলে পরিণত না করা একটি নেতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, ইলম ও আমল ভিন্ন; বইয়ের পাতা, মেমরি কার্ড কিংবা স্মৃতিতে মজুদ হবার জন্য ইসলাম আসেনি, ইসলাম এসেছে আমলের জন্য।

ইলম নাযিলের উদ্দেশ্য আমল :

কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন :

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

'আলিফ-লাম-রা (এগুলো কুরআনের মুজিযাসমূহের একটি এবং একমাত্র আল্লাহ ﷻ এর অর্থ জানেন); এটি এমন এক গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত ও প্রশংসার যোগ্য সেই পালনকর্তার দিকে তাঁরই নির্দেশে।' (সূরা ইব্রাহীম, ১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ বলছেন, আমি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছি। কেন আল্লাহ এই কিতাব নাযিল করলেন? যেন এর সাহায্যে আপনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে

www.banglakitab.weebly.com

আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। যাতে মানবজাতিকে আপনি অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারেন এই কিতাবের ওপর আমল করার মাধ্যমে।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ○ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

'আলিফ, লা-ম, রা; এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশদভাবে বর্ণিত, এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। (বলো), যেন তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করো। নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মাদ ﷺ) তোমাদের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।' (সূরা হুদ, ১-২)

এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন, এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে বিশদ বর্ণনাসহ। কেন বিশদ বর্ণনাসহ এ কিতাব নাযিল করা হলো? ঠিক পরের আয়াতটি লক্ষ করুন। আল্লাহ ﷻ বলছেন :

'যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করো।'

এখানে ইবাদত অর্থাৎ আমলের কথা বলা হয়েছে। এই কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য হলো যেন এর ওপর আমল করা হয়। কীভাবে এই কিতাবের ওপর আমল করবেন? এক আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদতের মাধ্যমে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

'(হে মুহাম্মাদ) আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি, যাকে এ কথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা সবাই আমারই ইবাদত করো।' (সূরা আল-আম্বিয়া, ২৫)

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার আগে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে এ কথাই জানিয়েছি যে, মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিক্ষা দাও। লক্ষ করুন, আয়াতের একেবারে শেষাংশে কী বলা হয়েছে,

فَاعْبُدُونِ

ইবাদত করো

অর্থাৎ প্রত্যেক রাসূলকে দলিলসহ, ওয়াহিসহ পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁরা তা প্রচার করেছিলেন যাতে করে সবাই আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করে।

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

'নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।' (সূরা আন-নিসা, ১০৫)

আল্লাহ বলছেন, হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছি,

'যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ ﷻ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান।'

এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত শরীয়াহ অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করেন। এই আয়াতের অনুরূপ আরেকটি আয়াত হলো :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

'নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) আমি আপনার প্রতি এই কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে এক আল্লাহর ইবাদত করুন।' (সূরা আয-যুমার, ২)

আগের আয়াতে বলা হয়েছিল,

لِتَحْكُمَ

অর্থাৎ, এর ওপর আমল করুন মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করার মাধ্যমে।

আর এই আয়াতে বলা হচ্ছে,

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ

অর্থাৎ, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ﷻ-এর আদেশ পালনের মাধ্যমে এর ওপর আমল করুন, ইবাদত করুন।

সুতরাং আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে, ইলম নাযিল করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য। ইলম অনুযায়ী আমলের জন্য। আর যে ইলম আমলের ক্ষেত্রে উপকারী ভূমিকা রাখে না, শারীয়াহতে তা অপ্রশংসনীয়।

ইলমের ওপর আমল না করার পরিণাম :

ইলম যদি দেহ হয় তবে আমল হলো তার অন্তরাত্মা। আমল ছাড়া ইলম প্রাণহীন মৃতদেহের মতো। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে না, সে যেন ইতোমধ্যেই মৃতদেহে

www.banglakitab.weebly.com

পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ইলম ব্যক্তির বিরুদ্ধে একদিন সাক্ষ্য দেবে। মালিক ইবনু দিনার ﷺ বলেন, অর্জিত ইলমের ওপর আমল না করলে মসৃণ পাথরের ওপর গড়িয়ে পড়া পানির মতো ইলম তার অন্তর থেকে ধুয়ে যায়। কখনো ঝরনা দেখে থাকলে দেখবেন ঝরনার নিচের পাথর থেকে ক্রমাগত পানি ঝরে পড়ছে। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে না, ইলম এভাবেই তার কাছ থেকে ঝরে পড়ে। এমন কত ইলমওয়ালা আছেন যারা মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও নিজেরাই এ ব্যাপারে গাফেল? তাকওয়ার (আল্লাহ ﷻ-এর ভয়) বাণী প্রচারকারীদের মধ্যে এমন কতজন আছেন যারা নিজেরাই তাকওয়াহীন ও বেপরোয়া? মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্য অর্জনের দিকে ডাকা কতজনই তো নিজেরাই আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে। মনে রাখবেন, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে সাক্ষ্য দেবে তাদের হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

'আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।' (সূরা ইয়াসিন, ৬৫)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ

'তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্ সবকিছুকে বাক্শক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও বাক্শক্তি দিয়েছেন।...' (সূরা ফুসসিলাত, ২১)

মানুষ আল্লাহ ﷻ-কে বলবে, আমি সাক্ষী উপস্থিত করতে চাই। আল্লাহ ﷻ বলবেন, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কি তুমি সাক্ষী হিসেবে মেনে নেবে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন নিজ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকবে। সে বলবে, কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ, আমি তো তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করতাম?

কিন্তু যাদের ইলম আছে তাদের অবস্থা হবে আরও ভয়াবহ। আলিম ও দা'ঈদের বেলায় অতিরিক্ত সাক্ষী হিসেবে যুক্ত হবে তাদের শেখা প্রতিটি আয়াত ও হাদিস। সহিহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

কুরআন তোমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।[৭৪]

৭৪ *সহিহ মুসলিম* : ৫৫৬; *সুনানুত তিরমিযি* : ৩৫১৭

www.banglakitab.weebly.com

আপনার শেখা হাদিস কিংবা আয়াতগুলো কি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে নাকি বিপক্ষে? এগুলো কি আপনার নাজাতের কারণ হবে নাকি আপনাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে? আপনার ইলম কি আপনার শাস্তি বা আযাবের কারণ হবে? মানুষের শেখা হাদিস ও আয়াত কিয়ামতের দিন তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে—এ কথা শুনলে কার না ভয় লাগে!

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন,

لو نفع العلم بلا عمل لما ذمّ الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذمّ المنافقين

'আমল ছাড়া ইলম যদি কল্যাণময় হতো, তবে আল্লাহ ﷻ আহলুল কিতাবের (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) ধর্মযাজকদের ভর্ৎসনা করতেন না। আর যদি সততা ও নিষ্ঠা ছাড়াই কোনো আমল কারও জন্য উপকারে আসত, তবে আল্লাহ ﷻ মুনাফিকদের নিন্দা ও ভয় প্রদর্শন করতেন না।'[৭৫]

আমল ছাড়া ইলম হলো মধুবিহীন মৌচাকের মতো। ইলম হলো সম্পদ। বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি জানে, সম্পদ থেকে লাভবান হবার উপায় হলো তা খরচ বা বিনিয়োগ করা। জমিয়ে রাখা টাকা থেকে কেউ কোনো উপকার পায় না। ইলমের ব্যাপারটাও একই রকম। ইলম ঠিক ততটুকু আপনার কাজে দেবে, যতটুকু আমল আপনি করবেন। আপনি ব্যয়-ই না করেন, তাহলে মজুদ করে রাখা সম্পদের মূল্য কী? ইলমের বেলাতেও তা-ই। আয-যুহরি ﷺ বলেছেন, ওই আলিমের কথা গ্রহণ করবে না, যে নিজে যা বলে তার ওপর আমল করে না। আর ওই ব্যক্তির কথাও শুনো না, যে ইলম ছাড়া কথা বলে (অর্থাৎ এমন কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি, যে হয়তো কখনো কখনো সত্য বলে কিংবা ভালো কাজ করে)। যে ইলম কোনো সুফল বয়ে আনে না, অন্তর ও আমলের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না, সেই ইলম একদিন আপনার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে।

জবাবদিহিতার ভয়ে ইলম অন্বেষণ পরিত্যাগ করা অনুচিত :

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। অনেকে ভাবেন, এই তাওহিদের দারস আসলে আমার জন্য না। আমি যত বেশি জ্ঞান অর্জন করব, ততই তা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে; তার চেয়ে আমি বরং বাদ দিই, আর না আগাই।

ওপরের আলোচনাগুলো পড়ার সময় অনেকের মাথায় হয়তো এমন চিন্তা এসেছে।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো, নির্দিষ্ট পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফারযুল আইন। প্রত্যেককে ফারযুল আইন ইলম অর্জন করতে হবে, নইলে সে গুনাহগার হবে। আর আমরা এখানে

৭৫ ইবনুল কাইয়্যিম, *আল-ফাওয়ায়িদ*, পৃ. ৩৫

www.banglakitab.weebly.com

মূলত এমনসব বিষয় নিয়েই কথা বলব, যেগুলো জানা আপনাদের জন্য ফরয। যেমন, লেখক বলেছেন :

اِعْلَمْ رحمك الله، أنَّهُ يجِبُ علَيْنا تعلُّمُ أرْبعِ مسائِل

'অবগত হোন—আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। চারটি বিষয়ে জানা আমাদের জন্য আবশ্যক।'

এ বিষয়গুলো নিয়ে ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। মুসলিম উম্মাহ অজ্ঞতার এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে, আজ আমরা মনে করছি, আমাদের আলোচ্য এ বিষয়গুলো নিয়ে জানাটা হলো বাড়তি অর্জন। বিশেষ কোনো কৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতা হলো এগুলো জানা আমাদের কর্তব্য, না জানলে বরং আমরা গুনাহগার হব।

এবার ফারযুল আইন না, এমন ইলমের আলোচনায় আসা যাক। অনেকে হয়তো ভাবেন, তাওহিদের এই দারসগুলো থেকে তারা কেবল ফরয অংশটুকু শিখে ক্ষান্ত দেবেন। এর উত্তরে কেবল একটি কথাই বলব, আপনারা তালিবুল ইলম হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিবারের জন্য বরাদ্দ সময় থেকে মূল্যবান কিছু সময় বের করে ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করছেন; অনেকের অগ্রগতি হচ্ছে, অনেকে অতটা এগোতে পারছেন না কিন্তু চেষ্টা করছেন—এতকিছু কেন করছেন? মূলত জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর পাওয়াটাই তো উদ্দেশ্য, তাই না? সিদ্দিকিনের স্তরে পৌঁছানোর অন্যতম মাধ্যম হলো ইলম। একজন আলিম আর একজন শহিদদের মধ্যে কে উত্তম—এ নিয়ে বড় বড় অনেক আলিম আলোচনা করেছেন। অবাক হবেন না। ইবনু মাসউদ ﷺ, ইবনুল মুবারাক ﷺ-সহ আরও অনেকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। আলিম ও শহিদের মধ্যে কে বেশি জ্ঞানী তা নিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ তাঁর *মিফতাহু দারিস সায়াদাহ* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই মুহূর্তে আমি সেই আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না। বর্তমানে উম্মাহর বুঝের মাত্রার কথা বিবেচনায় আমার মনে হয় এ নিয়ে এখানে আলোচনা না করাই ভালো, কারণ এ থেকে বিতর্কের সূত্রপাত হতে পারে। তবে এমন একটি প্রশ্ন নিয়ে যে আদৌ আলোচনা করা হচ্ছে, এটাই আখিরাতে আলিমদের উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ। তারপরও কি আপনি ইলম অর্জন বন্ধ করে দেবেন—কারণ কিছু মূর্খ বলে, 'কিছু না জানাই বরং ভালো!' এই মূর্খদের কথা শুনে আপনি জ্ঞানার্জন বাদ দিয়ে দেবেন? এটা তো একেবারেই অযৌক্তিক!

কাজেই, প্রথমত আমরা এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি তার অধিকাংশ ফরয ইলমের মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়ত এখানে ফারযুল আইন ইলমের বাইরে কিছু থেকে থাকলে সেটাও আপনার জানা উচিত, কারণ আপনি-আমি, আমরা সবাই জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে, জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছাতে চাই। এটাই তো আমাদের লক্ষ্য। দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো (তাওহিদ ও এর বাইরে অন্যান্য ফারযুল আইন ইলমের বিষয়সমূহ) নিয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি জান্নাতের পথে এক ধাপ অগ্রসর হয়। হয়তো এর ফলে সে স্থান করে নিতে পারে জান্নাতের

www.banglakitab.weebly.com

প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সর্বোচ্চ জান্নাতে—জান্নাতুল ফিরদাউসে—যাবার আশা রাখতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ যাকে ইলম থেকে বঞ্চিত করেন, অজ্ঞতা তাকে লাঞ্ছিত করে; আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে এটি একটি শাস্তি। ইলম তার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াবার পরও মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তির শাস্তির চেয়েও এই শাস্তি গুরুতর। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির, যাকে ইলম দান করা হয়েছে কিন্তু সে ওই ইলমের ওপর আমল করে না।

এ ছাড়া ফারযুল আইনের বাড়তি ইলম কেবল জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের পাথেয়ই না; বরং দুনিয়াতেও এর বহু ফায়দা আছে। এই ইলম দুনিয়ার জীবনেও পরম প্রশান্তি ও বারাকাহ্র কারণ হতে পারে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷫ এ দুনিয়াতে ছিলেন নিঃস্ব। তিনি এমন সময়ও পার করেছেন যখন তাঁর পরনের জন্য ছিল কেবল একটি জামা। তাঁর রাতগুলো কাটত মাসজিদুল আমাওয়িতে। তাঁর জীবনের লম্বা একটি অংশ কেটেছে কারাগারে যাওয়া-আসার মধ্যে। অথচ এ মানুষটিই বলতেন, 'আমাদের অন্তর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। আমি যা অনুভব করছি জান্নাতিরাও যদি তা অনুভব করত তবে নিজেদের সত্যিকারের সৌভাগ্যবান মনে করত।' অথচ বাহ্যিকভাবে, পার্থিব বিচারে তাঁর জীবন ছিল দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। তিনি আরও বলতেন, 'জান্নাতিদের জীবন যদি আমার এই জীবনের মতো সুখের হয়, তবে তো এমন জীবনই উত্তম, আমি তো এর-ই প্রত্যাশা করি।' দুনিয়ার জীবনে যার বলার মতো কিছুই ছিল না এমন একজন মানুষ এ কথা বলছেন। তিনি বলছেন—যে ব্যক্তি দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করেনি, সে কখনো পরকালীন জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।

আবার সালাফদের কেউ কেউ বলতেন যে, হৃদয়ের এ প্রশান্তির কথা যদি রাজা, বাদশাহ ও শাসকরা জানত, তাহলে তা ছিনিয়ে নেবার জন্য আমাদের সাথে যুদ্ধ করত।

অথচ তাঁদের অধিকাংশেরই জীবন কেটেছে কারাগার, পরীক্ষা আর নানা ধরনের জটিলতায়। কী সেই জিনিস যা পার্থিব বিচারে নিঃস্ব এই মানুষগুলোর অন্তরে এমন প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছিল? তাঁরা আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া ইলমের ওপর আমল করেছিলেন, আর এটাই তাঁদের জীবনে এনে দিয়েছিল সর্বোচ্চ প্রশান্তি। এটাই হলো ইলম অর্জনের ওই ফসল যা দুনিয়াতেই পাওয়া যায়, আর পুরস্কার হিসেবে পরকালে জান্নাত তো আছেই ইন শা আল্লাহ। কাজেই আমরা কেউ-ই এ কথা বলতে পারি না যে, ইলম আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে তাই আমি আর ইলম অর্জন করব না।

আমরা কি জান্নাতুল ফিরদাউস চাই না? আমরা দুনিয়ার জীবনে প্রশান্তি চাই না? এগুলো তো ইলম অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব।

ইলমসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন :

নিঃসন্দেহে আপনার ইলম যত বেশি হবে, ইলমের প্রয়োগ, অর্থাৎ আমলও তত বেশি হতে হবে। কারণ, সাধারণের মাপকাঠিতে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে, আপনাকে বিচার

www.banglakitab.weebly.com

করা হবে না। আমাদের ধর্মে পুরোহিততন্ত্র নেই। কে জান্নাতের কোন স্তরে যাবে, তা নির্ধারিত হবে ব্যক্তির ইলম ও আমল দ্বারা। আপনার ইলম ও আমল নির্ধারণ করে দেবে আপনি জান্নাতের কোন স্তরে থাকবেন। একদিকে যেমন ইলম ও আমলের কারণে আপনি অধিক মর্যাদা পাবেন, তেমনি গুনাহের জন্য আপনার শাস্তির মাত্রাও হবে সাধারণের চেয়ে কঠিন।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

'আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরকালীন জীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোনোই সাহায্যকারী পেতেন না।' (সূরা আল-ইসরা, ৭৪-৭৫)

রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ বলছেন, আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা হলেও ঝুঁকে পড়তেন। আল-কুশাইরি, আশ-শানকিতি ﵏-সহ অন্যান্যদের মত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি ঝুঁকে যাননি; কেননা আল্লাহ এখানে 'যদি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

দেখুন তারপর আল্লাহ ﷻ কী বলছেন :

'তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।'

এ কথাগুলো কাকে বলা হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। রাসূলুল্লাহ কাফিরদের প্রতি ঝুঁকে পড়েননি, তবুও কেন আল্লাহ তাঁর প্রিয় মুহাম্মাদ ﷺ-কে এ কথা বলেছেন? কেন আল্লাহ ﷻ সেই ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ শাস্তির কথা বলছেন যিনি দুনিয়ার বুকে চলা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ–যিনি সমগ্র মানবজাতি ও মানবতার মাঝে সর্বোত্তম? এই আয়াতের আলোচনায় ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, তিনি যদি ঝুঁকে পড়তেন (যদিও তিনি তা করেননি), তাহলে তাঁকে এ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি পেতে হতো।

কেন আল্লাহ তাঁর হাবিবকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার কথা বলছেন? আন-নাসাফি ﵀ বলেন, তিনি মহান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তাই কোনো দোষের ক্ষেত্রে তার শাস্তির মাত্রাও অত্যন্ত তীব্র। দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। পরকালীন জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-ওয়াসিলাহর মালিক যার মর্যাদা জান্নাতুল ফিরদাউসের চেয়েও বেশি। এটি জান্নাতের সর্বাধিক মর্যাদার স্থান। কিন্তু এর দাম চড়া। একইভাবে রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহধর্মিণী, উম্মুহাতুল মুমিনিন ﵅, দৃঢ়পদ ও ধৈর্যশীলা নারীদের প্রতিও আল্লাহ ﷻ অনুরূপ কথা বলেছেন। একবার এক

www.banglakitab.weebly.com

ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিল, তিনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আ'ইশা। কিন্তু আ'ইশা ﵂-সহ সকল উম্মুহাতুল মুমিনিনকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

'হে নবিপত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।' (সূরা আল-আহযাব, ৩০)

তাঁদের বেলায় শাস্তি দ্বিগুণ হবার কারণ কী? পরের আয়াতেই আল্লাহ ﷻ বলছেন :

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দুবার পুরস্কার দেবো এবং তার জন্য আমি রিযকান কারিমা (সম্মানজনক রিযক) প্রস্তুত করে রেখেছি।' (সূরা আল-আহযাব, ৩১)

অর্থাৎ নবি-পত্নীরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী। তাঁদের জন্য যেমন দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা, তেমনি গুনাহর ক্ষেত্রে তাঁদের শাস্তিও দ্বিগুণ।

দেখুন, আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে, তাঁর হাবিবকে বলছেন, আপনি যদি কুফফার ও জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন তবে আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানেই দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হতো। তারপর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্ত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তোমাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।

কাজেই যারা তালিবুল ইলম তাদের হিসেবটাও বাকি দশজনের মতো না। একজন তালিবুল ইলম যদি ইলমের ওপর আমল না করেন, তবে সাধারণ মানুষের তুলনায় তাকে বেশি শাস্তি ভোগ করতে হবে। গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়লে আপনাকে চড়া মূল্য দিতে হবে। আপনারা অন্যদের মতো নন, আর এ কারণে আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের বলেছেন :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

'...তোমরা অন্য নারীদের মতো নও।' (সূরা আল-আহযাব, ৩২)

আপনারা তালিবুল ইলম, অন্য সাধারণ মানুষদের মতো নন। আপনাদের সম্মান ও মর্যাদা যেমন বেশি, আপনাদের শাস্তিও তেমন কঠিন। ইবনু মাসউদ ﵁ আহলুল কুরআনের (কুরআন-শিক্ষার্থী) জন্য কী মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন দেখুন। তিনি বলেছেন, তাঁদের অবশ্যই দিনে সাওম ও রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে; যখন সবাই সময় কাটাবে

www.banglakitab.weebly.com

আনন্দে, তখন আল্লাহ ﷻ-এর স্মরণে তাঁরা ব্যথিত থাকবে। অন্যরা যখন অনর্থক কথায় লিপ্ত, তাঁরা তখন নিশ্চুপ থাকবেন; তাঁরা চিৎকার-চেঁচামেচি ও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন না, সব সময় তাঁদের খুশু বজায় রাখতে হবে। কুরআন-শিক্ষার্থীদের জন্য ইবনু মাসউদ رضي الله عنه-এর এই মানদণ্ড নির্ধারণের কারণ কী? কারণ, তাঁরা হলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি, দুনিয়ার বুকে জীবন্ত কুরআন। কুরআন-শিক্ষার্থীরা কুরআনের ধারক, তাঁরাই কুরআনকে উচ্চে তুলে ধরেন। আর তাই তাঁদের জন্য মাপকাঠিও এমন উঁচু। অন্যরা অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে এবং খুব সম্ভবত তাতে কোনো গুনাহও নেই (নিছক বেহুদা কথা বললেই গুনাহ হয়েছে বলা যাবে না), কিন্তু তালিবুল ইলমদের অবস্থান অন্যদের মতো না। আর এ কারণেই সালাফদের আলিমগণের অবস্থান এত উঁচুতে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে—সকাল, সন্ধ্যা, রাত, সপ্তাহ, মাস ও বছরজুড়ে, অন্তরে ও বাহ্যিকভাবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, আল্লাহ ﷻ ও মাখলুকের সাথে মুয়ামালাতে—তাঁরা নিজেদের ইলমের ওপর আমল করেছেন।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম, এই পুরো ব্যাপারটি নিয়ে আল-খাতীব আল-বাগদাদি رحمه الله-এর লেখা একটি ছোট পুস্তিকা রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, শাইখ আলবানি رحمه الله এ কিতাবের হাদিসগুলো তাহকিক করেছেন। আল-খাতীব আল-বাগদাদি رحمه الله বলেছেন, 'ইহুদিদের কাছে ইলম ছিল কিন্তু তারা ইলম অনুযায়ী আমল করত না। আর খ্রিষ্টানরা ইলম ছাড়াই আমল করত; এ কারণে প্রথম দলটি অভিশপ্ত এবং দ্বিতীয় দলটি পথভ্রষ্ট হয়েছে।' ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, 'এই উম্মাহর মাঝে যারা অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট হয়, তারা খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রাখে আর ইলমের ওপর আমল না করার কারণে আলিমদের মধ্যে থেকে যারা বিপথগামী হয়, তারা ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।'

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, ইলমকে অন্তরে স্থায়ীভাবে গেঁথে নেয়ার উপায় হলো এর ওপর আমল করা। কোনো কিছু মুখস্থ করতে কিংবা মনে রাখতে সমস্যা হলে কোনোভাবে সেই ইলমের ওপর আমল করার উপায় খুঁজে বের করুন। ইন শা আল্লাহ, তাহলে আপনি সেটা কখনোই ভুলবেন না।

ইলমের ওপর আমলের উদাহরণ :

ইলমের ওপর আমলের ব্যাপারে সালাফগণ অত্যন্ত একনিষ্ঠ ছিলেন। বুখারিতে সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব رحمه الله তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আবদুল্লাহ তোমার জীবন কতই-না বারাকাহ্পূর্ণ হতো, যদি তুমি রাতের সালাত আদায় করতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইল আদায়ের জন্য আবদুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه-কে উৎসাহিত করেছিলেন। সালিম (ইবনু উমার رضي الله عنه-এর পুত্র) বলেন, এরপর থেকে আমার পিতা খুব অল্পই ঘুমাতেন।[৭৬]

---

৭৬ *সহিহুল বুখারি* : ১১২২; *সহিহ মুসলিম* : ৬৫২৫

www.banglakitab.weebly.com

সহিহ মুসলিমে আছে, ফাতিমা ﷺ ও আলী ﷺ যখন খাদিম চেয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের ৩৩ বার করে সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা শিখিয়ে দিলেন।[৭৭] পরে আলী ﷺ বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলার পর থেকে আজ পর্যন্ত এক দিনও আমি এর ওপর আমল করা বাদ দিইনি। কেউ একজন প্রশ্ন করল, সিফফিনের সময়ও কি আপনি এর ওপর আমল করেছিলেন? সিফফিনের যুদ্ধে ৭০ হাজার মুসলিম নিহত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য ছিল আলী ﷺ-এর বাহিনীর। আলী ﷺ বললেন, সিফফিনের রাতগুলোতেও। এমন ভয়ানক যুদ্ধের রাতগুলোতেও তিনি এই আমল চালিয়ে গেছেন। দেখুন, ইলমের ওপর আমল করাকে তাঁরা কতটা গুরুত্ব দিতেন।

সহিহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মুসলিমের কোনো ওসিয়াত থাকলে, সে যেন অবশ্যই তা লিখে রাখে এবং তা বালিশের নিচে রেখে ঘুমায়।[৭৮] ইবনু উমার ﷺ বলেছেন, এ কথা জানার পর থেকে আমি বালিশের নিচে ওসিয়াতনামা রাখা ছাড়া একটি রাতও পার করিনি। একই রকম আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় সুনানু নাসায়ির একটি হাদিসে। যদিও ইবনুল জাওযী ﷺ এবং অন্যান্যরা একে যইফ বলেছেন, কিন্তু সঠিক মত হলো হাদিসটি সহিহ। আবু উমামাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক সালাতের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।[৭৯] অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই আমল করবে সে মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেছেন, 'আমার শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ কোনো অবস্থাতেই সালাতের পর এই আমলটি বাদ দিতেন না।'

আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ-এর এই ঘটনাটি শুনুন। বর্ণনাটি এসেছে সহিহ বুখারিতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন যে আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ প্রতিদিন সাওম পালন করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পরামর্শ দিলেন প্রতিমাসে তিন দিন সাওম থাকার। আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ-কে বললেন, আবদুল্লাহ, মাসে তিন দিন সাওম রাখো। আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি রাখতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, সপ্তাহে তিন দিন রাখো। আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ আবারও বললেন, আমি এর চেয়েও বেশি রাখতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে দুদিন পরপর একদিন সাওম রাখো। আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ এবারও বললেন, আমি এর চেয়েও বেশি রাখতে সক্ষম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে দাউদ ﷺ-এর মতো একদিন পরপর সাওম রাখো। এটি *বুখারির* বর্ণনা।[৮০] কিন্তু হাদিসের পরের অংশে এসেছে :

يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

৭৭ *সহিহ মুসলিম* : ৭০৯৪

৭৮ *সহিহ মুসলিম* : ৪২৯৪

৭৯ নাসায়ি, *সুনানুল কুবরা* : ৯৯২৮

৮০ *সহিহুল বুখারি* : (ভাবানুবাদ) ১৯৭৫

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবার পর আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷠ বলতেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শুরুতে যা বলেছিলেন (অর্থাৎ মাসে তিন দিন সাওম পালন), আমি যদি তা-ই করতাম!

এই বক্তব্যের দিকে লক্ষ করুন। আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷠ আফসোস করে বলছেন, হায়! আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামতো সবচেয়ে সহজ আমলটি বেছে নিতাম! আমি যদি মাসে তিন দিন, সপ্তাহে তিন দিন কিংবা দুদিন পরপর একদিন সাওম পালনকে বেছে নিতাম!

তিনি কেন এ কথা বললেন? এ কথা বলার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? এটা কি তাঁর ওপর ফরয করা হয়েছিল? না। যখন এ আমল তাঁর জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে গেল তিনি কেন এই অতিরিক্ত নফল সাওম ছেড়ে দিলেন না? কেন তিনি আফসোস করে বললেন, হায়! আমি যদি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাছাইকৃত সবচেয়ে সহজ আমলটি বেছে নিতাম! যদি তিনি বলতেন, আমি আর সাওম রাখব না। সারা জীবন অনেক সাওম রেখেছি, এখন আমি বৃদ্ধ, তাই এ থেকে বিরতি নিচ্ছি—তবে এতে তো কোনো সমস্যা ছিল না। অথবা তিনি যদি বলতেন, আমি এখন থেকে দাউদ ﷷ-এর মতো সাওম রাখার বদলে মাসে তিন দিন সাওম রাখব, তাতেও সমস্যার কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন যারা সুন্নাহর ওপর আমল করার প্রতিজ্ঞা করলে সেটাকে ফরযতুল্য মনে করতেন। মৃত্যুপর্যন্ত সেই আমল বহাল রাখতেন। এ কারণেই আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷠ এমন কথা বলেছিলেন। এভাবে তাঁরা ইলমের ওপর আমল করতেন।

সুফিয়ান আস-সাওরি ﷫ বলেন,

إِنَّمَا يُتَعَلَّمُ الْعِلْمُ لِيُتَّقَى اللهُ بِهِ ، وَإِنَّمَا فُضِّلَ الْعِلْمُ عَلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّقَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ

> 'ইলম শেখার উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করা। এ কারণেই ইলম ও আলিমের মর্যাদা বেশি এবং তাঁদের জন্য মাপকাঠি অন্য দশজনের চেয়ে আলাদা। কেননা, আলিমগণ আল্লাহ ﷻ-কে বেশি ভয় করেন।'[৮১]

ইবনু আব্বাস ﷠ বলেছেন, সবাই ভালো কথা বলে, সে-ই সৌভাগ্যবান যার আমল তাঁর ইলমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যার আমল তার কথার সাথে মেলে না, সে আসলে নিজেই নিজেকে তিরস্কার করছে। আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ﷫-এর সূত্রে মালিক ﷫ বর্ণনা করেছেন, আমি এমন মানুষ দেখেছি যারা কথার চেয়ে ইলমের প্রয়োগের বেশি কদর করতেন। এ সবকিছুর অন্তর্নিহিত শিক্ষা হলো—ইলম হলো আমলের জন্য।

এ কথাটি সব সময় মনে রাখবেন।

---

৮১ *জামিয়ু বায়ানিল ইলম,* বর্ণনা নং : ৭৭৫

www.banglakitab.weebly.com

ওলামায়ে সু :

ওলামায়ে সু সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হলো একে আমল রূপান্তরিত করা এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করা।

ওলামায়ে সু কারা?

এই ব্যাপারে আশ-শাতিবী ﷺ একটি মূলনীতির কথা বলেছেন,

فإنّ عُلماء السُّوءِ هُمُ الَّذِين لا يعْملُون بِما يعْلمُون

ওলামায়ে সু হলো সেইসব আলিম, যারা নিজেদের ইলমের ওপর আমল করে না।[৮২]

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ তাঁর বই আল ফাওয়াইদে একটি উপমা দিয়েছেন। ওলামায়ে সু হলো এমন ব্যক্তি যারা জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষকে ভেতরে ঢোকার আহ্বান করে। তাদের মুখের কথা মানুষকে জান্নাতের দিকে ডাকে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপ হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষকে তারা যত বেশি জান্নাতের দিকে ডাকে, ততই তাদের আচরণে প্রতীয়মান হয় যে— 'আমাদের কথা গ্রহণ কোরো না। কারণ, সত্যবাদী হলে আমরা নিজেরাই প্রথমে এ কথাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতাম।' এসব ওলামায়ে সু-কে দেখে পথপ্রদর্শক মনে হলেও আসলে এরা ডাকাতের মতো। আল্লাহ ﷻ আমাদের এদের হাত থেকে রক্ষা করুন। ধরুন আপনি রাস্তায় গাড়ি করে যাবার সময় কারও কাছে একটি ঠিকানা জানতে চাইলেন। সে সঠিক পথের বদলে আপনাকে ভুল পথ দেখিয়ে দিলো যাতে করে সে আপনাকে লুট করতে পারে। এটাই হলো ওলামায়ে সু-দের অবস্থা।

আমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণ এনেছেন। এসব উদাহরণের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট যেসব ব্যক্তির কথা এসেছে, যাদের দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত, তারা হলো ওই মানুষগুলো যারা ইলমকে আমলে পরিণত করে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

'তুমি এদের সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও, যাকে আমি নিদর্শন দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। আর আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম, কিন্তু

৮২ শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত* : ১/১০৩

www.banglakitab.weebly.com

সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা-বাসনার (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করতে থাকে। তার উদাহরণ কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি কষ্ট দাও, তাহলে জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এই উদাহরণ হলো সেই সম্প্রদায়ের জন্য। তুমি কাহিনি বর্ণনা করে শোনাতে থাকো, হয়তো তারা এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।' (সূরা আল-আরাফ, ১৭৫-১৭৬)

যে আলিমের কাজ তার ইলমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না, যে আলিম তার ইলম অনুযায়ী কাজ করে না, আল্লাহ ﷻ তার তুলনা করেছেন কুকুরের সাথে।

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

আল্লাহ ﷻ বলছেন, ইচ্ছে করলে তিনি অবশ্যই এ রকম আলিমকে সম্মানিত করতে পারতেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির উদাহরণ হলো কুকুরের মতো, সে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে আর নিজের নফসের আনুগত্য করছে। নিজের ইলম অনুযায়ী সে আমল করেনি। অর্জিত ইলমের অনুসরণ সে করেনি। তার দৃষ্টান্ত হলো কুকুরের মতো যে কুকুরকে তাড়িয়ে দেয়া হলে জিব বের করে সে হাঁপাতে থাকে। তাকে তার মতো ছেড়ে দিলেও সে জিব বের করে হাঁপাতেই থাকে। কুকুর জিব বের করে হাঁপাতে থাকে, সে সেই অবস্থাতেই থাকুক না কেন। এই উপমার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়িম ﷺ ওলামায়ে সু ও কুকুরের মধ্যে সাদৃশ্যের ১০টি পয়েন্ট উল্লেখ করেন, তবে এখানে সেই বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাব না।

এই উদাহরণ কে দিয়েছেন? আল্লাহ ﷻ স্বয়ং এই উদাহরণ দিয়েছেন। এবং তিনি যেকোনো কুকুরের কথা বলেননি; বরং এমন কুকুরের কথা বলেছেন যেটা সারাক্ষণ জিব বের করে হাঁপাতে থাকে। বিশ্রামে কিংবা ক্লান্তিতে, ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণায়—সব অবস্থায় যে হাঁপাতে থাকা নিকৃষ্ট কুকুরের কথা আল্লাহ ﷻ বলেছেন। আপনি এসব আলিমদের যদি বলেন, শাইখ সত্য প্রকাশ করুন! সে জিব বের করে হাঁপাতে থাকে। সে যে নিজের ইলম অনুযায়ী আমল সে করছে না, এই ব্যাপারে যদি আপনি চুপ থাকেন, তাহলেও সে জিব বের করে হাঁপাতে থাকে। সে জিব করে হাঁপাতে থাকে যখন আপনি তাকে বর্জন করেন। সে হাঁপাতে থাকে যখন আপনি তাকে উপেক্ষা করেন। যখন সে মুখ খোলে তখন জিব বের করা কুকুরের মতো হাঁপায়। যেহেতু নিজের জ্ঞানকে সে কাজে লাগায়নি, তাই আল্লাহ ﷻ তার তুলনা করেছেন জিব বের করে হাঁপাতে থাকা কুকুরের সাথে।

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

যাদের ওপর তাওরাতের নির্দেশনা মেনে চলা এবং এর বিধানসমূহ প্রয়োগ করার দায়িত্ব

www.banglakitab.weebly.com

দেয়ার পর তারা ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের উদাহরণ হলো গাধার মতো। যারা কাঁধে বিশাল বিশাল বই বয়ে বেড়ালেও এগুলো থেকে কোনোরকম কল্যাণ, কোনো জ্ঞান অর্জন করে না। যেসব ব্যক্তি আল্লাহর স্পষ্ট আয়াত-নিদর্শন, প্রমাণ, অস্বীকার করে তাদের উদাহরণ কতই-না দুর্ভাগ্যজনক। আর আল্লাহ যালিমদের (মুশরিক, অনিষ্টকারী, অবিশ্বাসীদের) পথপ্রদর্শন করেন না। (সূরা জুমুআ, ৫)

এই আয়াতে যদিও তাওরাতের কথা বলা হয়েছে কুরআনের বলা হয়নি, কিন্তু যাদের ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাদের জন্যও এটা প্রযোজ্য। যাদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কুরআন মেনে চলার, কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলার–দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তাদের অবস্থাও বইয়ের বোঝা বহনকারী গাধার মতোই। কাঁধে বিরাট সব কিতাবের বোঝা তারা বহন করে। কিন্তু তা থেকে কোনো ইলম কি তারা অনুধাবন করেছে? উপলব্ধি করেছে? আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত অস্বীকারকারী ব্যক্তিদের অবস্থা এমনই। প্রথম উদাহরণে ইলমসম্পন্ন ব্যক্তিদের তুলনা করা হয়েছে কুকুরের সাথে আর দ্বিতীয় উদাহরণে তাদের তুলনা করা হয়েছে গাধার সাথে।

لَمْ يَحْمِلُوهَا

'তারা বহন করেনি।'

অর্থাৎ তারা সেটা কাজে লাগায়নি, নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করেনি। 'আসফার' বা বহনকৃত বোঝা কি গাধার কোনো কাজে আসে? আরবি আসফার (أَسْفَار) শব্দটি হলো সিফর (سِفر)-এর বহুবচন। আসফার শব্দটি দিয়ে সেইসব বিরাটাকৃতি বই বা পাথরে খোদাই করা ট্যাবলেট বোঝানো হয় যেগুলোতে আগেকার যুগে লেখা হতো। গাধার পিঠে আসফার তুলে দিলেও সেগুলো থেকে গাধা কোনো জ্ঞানার্জন করতে পারে না। সে কেবল ওজন বহন করে। যে ব্যক্তি বুখারি, মুসলিম, মুগ্বনী, উসুল আস-সালাসাহ-এর মতো বইয়ের জ্ঞান বহন করে, কিন্তু নিজের জীবনে এসবের শিক্ষা প্রয়োগ করে না, ওজন বহন করা ছাড়া আর কোনোভাবে কি সে উপকৃত হয়? না, সে কেবল গাধার মতো ওজনই বহন করে।

حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, হুম্মিলু (حُمِّلُوا) শব্দের মাধ্যমে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এসব জ্ঞান আমলে পরিণত করার। ইবনু কাসির ﷺ বলেছেন, এই উপমা সেই ব্যক্তিদের জন্য যারা জানেই না কিতাবে কী আছে। শেখার জন্য কিতাব দেয়া হলেও শেখার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ তাদের নেই। আবার সেই ব্যক্তিদের জন্যও এই উপমা খাটে যারা কিতাবে কী আছে তা জানে, এমনকি মুখস্থও করে, কিন্তু উপলব্ধি করে না। একইসাথে এ কথা তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা জানে কিতাবে কী আছে, কিন্তু নিজ স্বার্থে কিতাবের বক্তব্য তারা বিকৃত করে, ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করে। এরা গাধার চেয়েও অধম। কারণ, গাধার তো বোঝার মতো বুদ্ধি নেই, আর এরা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগায় না। ই'লামুল মুওয়াক্কিয়িন গ্রন্থে

www.banglakitab.weebly.com

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেছেন, এই আয়াত যদিও ইহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তবুও এটা সেইসব ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, কুরআনের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করে না।

ওয়াল্লাহি, গাধার সাথে তুলনীয় হওয়া কতো ভয়ংকর একটা ব্যাপার। আল্লাহ ﷻ আমাদের সতর্ক করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে গাধা আর কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন, যাতে করে ইলম অর্জন করার পর তা আমলে পরিণত করার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সতর্ক হই। যাতে করে অর্জিত জ্ঞান আমরা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করি। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এবং যারা আসলেই সত্য শুনতে চায়, মানতে চায়, তাদের জন্য এটা হলো রিমাইন্ডার।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

'নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্টচিত্তে।' (সূরা আল-কাফ, ৩৭)

আল্লাহ ﷻ ইয়াহইয়া ﷺ-কে বলেন :

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

'হে ইয়াহইয়া, তুমি কিতাবটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।' (সূরা মারইয়াম, ১২)

মুজাহিদ ও যাইদ ইবনু আসলাম ﷺ বলেছেন, এ আয়াতে বি কুওয়্যাহ (بِقُوَّةٍ) দ্বারা বোঝানো হয়েছে—জ্ঞানার্জন করো এবং সেই জ্ঞান জীবনে প্রয়োগ করো। আস-সুয়ূতি ﷺ বলেছেন, আচরণ, ইবাদত, নেক আমল কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো হাদিস জানার পর সেই হাদিসের ওপর আমল করতে হবে। কেননা, এটা হলো ইলমের যাকাত, অর্থাৎ জ্ঞানের শুদ্ধিকরণ। ইলম আত্মস্থ করার এটাই সর্বোত্তম পন্থা। ওয়াকি ﷺ বলেছেন, কোনো জ্ঞান কেউ আত্মস্থ করতে চাইলে তার উচিত সেটার ওপর আমল করা। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইব্রাহীম ইবনু ইসমাঈল বলেছেন, হাদিস মনে রাখার জন্য আমরা সেগুলোর ওপর আমল করতাম।

ওই ব্যক্তিদের মতো হবেন না যাদের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিযোগ করবেন। নিশ্চয় আপনি এমন কোনো বিচারের মুখোমুখি হতে চাইবেন না যেখানে আপনার বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ অভিযোগকারী হবেন, আর তিনি বলবেন :

يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে। (সূরা আল-ফুরকান, ৩০)

www.banglakitab.weebly.com

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ এই ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, মানুষ পাঁচভাবে কুরআনকে পরিত্যাগ করতে পারে। তার মধ্যে একটি হলো কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করা। আর কুরআনে কী বলা আছে সেটা না জানলে কীভাবে আপনি কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবেন? তাই জানতে হবে আর তারপর সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ কুরআনকে পরিত্যাগ করার দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন আর সেটা হলো কুরআনের বিধান দিয়ে বিচার করাকে পরিত্যাগ করা। মৌলিক এবং সেকেন্ডারি–যেকোনো ক্ষেত্রেই কুরআন দিয়ে বিচার না করা, কুরআনকে পরিত্যাগ করার শামিল।

তাই কুরআনের নির্দেশনা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমলও করতে হবে। কারণ, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হবেন–এটা আপনি বা আমি, আমরা কেউই চাই না।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইলম অনুযায়ী আমল করা

চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের তৃতীয়টি হলো দাওয়াহ ইলাল্লাহ। আপনি যা জেনেছেন, সেটার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। আসুন ইলমের ওপর আমল ও দাওয়াহ ইলাল্লাহ–এ দুটো নিয়ে একটু একসাথে চিন্তা করি। ইলম অর্জনের পর প্রথম দায়িত্ব হলো সেটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করা। দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো সেটা অন্যান্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর দাওয়াহ বা মানুষকে শেখানোর সর্বোত্তম উপায় হলো অর্জিত ইলম নিজের জীবনে প্রয়োগ করা। আর এভাবে এ দুটি নীতির সংমিশ্রণ ঘটে। হাজার জন মিলে একজন ব্যক্তিকে বোঝানোর চেয়ে, একজন ব্যক্তির আমল হাজারো মানুষের জন্য বেশি উপকারী। অর্জিত ইলম নিজের জীবনে প্রয়োগ করে মানুষকে যতটা কার্যকরী ভাবে শেখানো যায়, কেবল মুখে সেই জ্ঞানের প্রচার ততটা কার্যকরী হয় না। অনেকে ভাবেন শুধু দারস আর খুতবা হলো দাওয়াহর মাধ্যম, অথচ ইলমের ওপর আমল করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনুল জাওযী ﷺ ও তাঁর শাইখগণ :

সাইদুল খাতিরের এক শ আটষট্টি পৃষ্ঠায় ইবনুল জাওযী ﷺ বলেন,

'আমার বিভিন্ন ধরনের আর বিভিন্ন মাত্রার ইলমসম্পন্ন শাইখ ছিলেন। ওই শাইখদের সঙ্গই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর মনে হয়েছে যারা ইলম অনুযায়ী আমল করতেন, যদিও তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথেও আমার পরিচয় ছিল। আমি এমনও আলেমের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা অসংখ্য হাদিস মুখস্থ করেছেন, উসুলুল হাদিসে যাদের ছিল গভীর জ্ঞান–কিন্তু তারা গীবতকে বরদাশত করতেন। এমনকি অনেক সময় জার'হ ও তা'দীলের

www.banglakitab.weebly.com

অজুহাতে তারা গীবতের অনুমতি দিতেন এবং অর্থের বিনিময়ে হাদিস শিক্ষা দিতেন।'

ইবনুল জাওযী ﷺ এই বিষয়টি পছন্দ করেননি।

কোনো একটি হাদিস শিখতে চাইলে আপনাকে দশ হাজার কিংবা পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে। তাঁর কিছু শাইখদের ব্যাপারে তিনি আরও বলেছিলেন যে, অনেক সময় তারা নিশ্চিত না হয়েও তড়িঘড়ি করে নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিতেন। তারা সব প্রশ্নের জবাব দিতে চাইতেন যাতে করে নিজেদের খ্যাতি ও মর্যাদা বজায় থাকে।

তিনি বলেছেন, 'আমার সাথে আবদুল ওয়াহহাব আল-আনমাতি ﷺ-এর দেখা হয়েছিল, তিনি সালাফদের পথের ওপর ছিলেন। কখনো প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কারও নামে গীবত করতেন না এবং কখনোই অর্থ গ্রহণ করতেন না।'

ইবনুল জাওযী ﷺ এমন শাইখকে পছন্দ করতেন যিনি শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে অর্থ নিতেন না। তিনি আরও বলেছেন, 'যখন আমি তাঁকে কোনো হাদিস শোনাতাম তিনি কেঁদে ফেলতেন। কাঁদতেই থাকতেন। আমার বয়স তখন অনেক কম ছিল, আর এই বিষয়টি আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি সেইসব মাশাইখদের মতো ছিলেন যাদের কথা সালাফদের কিতাবে পাওয়া যায়, যারা ছিলেন সাহাবী ﷺ-দের মতো।'

'আমি আবু মানসূর আল জাওয়ালিকী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন অল্প কথার মানুষ, অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। এমনও হয়েছে যে তাঁকে এত সহজ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তাঁর সবচেয়ে কমবয়সী ছাত্ররাও ভাবত তারা এর জবাব জানে। কিন্তু তিনি সেগুলোর উত্তর দিতেও ইতস্তত করতেন। উত্তর দিতেন শতভাগ নিশ্চিত হয়ে। তিনি টানা রোজা রাখতেন, দারসের সময় ছাড়া অন্যান্য সময় নিশ্চুপ থাকতেন অথবা কোনো উত্তম আমলে ব্যস্ত থাকতেন।'

ইবনুল জাওযী ﷺ বলেছেন অন্য যেকোনো শাইখের চাইতে এই দুজনের কাছ থেকে তিনি বেশি উপকৃত হয়েছেন। শত শত মাশাইখের মধ্য থেকে এ দুজনের কথাই তিনি বিশেষভাবে বলেছেন, অথচ তারা ততটা বিখ্যাত নন। অনেকে হয়তো তাদের চিনবেন না। কেন তিনি তাঁদের কথা বলেছেন? কারণ, তারা ইলমের ওপর আমল করতেন। ইবনুল জাওযী ﷺ-এর ওপর তাদের প্রভাব অনেক বেশি ছিল, কারণ তারা অর্জিত জ্ঞান নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন।

ইবনুল জাওযী ﷺ উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, 'মানুষকে কথা দিয়ে পথ দেখানোর চেয়ে, নিজের কাজের মাধ্যমে পথ দেখানো অনেক উত্তম ও ফলপ্রসূ। তিনি বলেছেন, আমি কিছু শাইখকে দেখেছি যারা নিজেদের একান্ত সময়গুলো ঠাট্টা-তামাশা অথবা অলসতায় কাটাতেন। অনেকের কাছেই এ ধরনের কাজ তাদের সম্মানহানি করেছে, আর ধ্বংস করেছে তাদের ইলমকেও।'

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর কসম, এ কথাগুলো খুবই মূল্যবান। স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতো কথা।

ইবনুল জাওযী ﵀ আরও বলেছেন, 'জীবিত থাকাবস্থায় খুব সীমিত-সংখ্যক লোক এ ধরনের আলিমদের দ্বারা উপকৃত হয় আর মৃত্যুর পরে সবাই তাদের কথা ভুলে যায়। কদাচিৎ কেউ তাদের লেখা কিতাব খুলে দেখে।' তারপর তিনি বলেছেন, 'সত্যিকার অর্থে দুর্ভাগা ও দুঃস্থ হলো সেই ব্যক্তি, যে অর্জিত ইলমের ওপর আমল না করে নিজের জীবন কাটিয়ে দেয়।

দুনিয়াতে আমল করার প্রশান্তি থেকে তারা বঞ্চিত হয়[৮৩], আর বঞ্চিত হয় আখিরাতের প্রতিদান থেকেও। কিয়ামতে সে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে হাজির হয় নিঃস্ব অবস্থায়, নিজের বিরুদ্ধে অজস্র প্রমাণ নিয়ে।'

এই সবগুলোই ইবনুল জাওযী ﵀ *সাইদুল খাতির* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৮৪]

মনে রাখবেন আপনাকে তিনটি প্রতিবন্ধক পার হতে হবে–আপনাকে ইলম অর্জন করতে হবে, সেই ইলম নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ইলমের ব্যাপারে আন্তরিক ও সৎ হতে হবে। ইকতিদায়ুল ইলম আল আমল গ্রন্থে আল ফুদাইল ইবনুল ইয়াদ ﵀ বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করেও একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞ থাকে যতক্ষণ না সে নিজের জীবনে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে। কেবল ইলমকে আমলে পরিণত করলেই তিনি আলিম হিসেবে বিবেচিত হবেন। সালাফদের অনেকে দূরদূরান্ত থেকে আলিমদের কাছে ছুটে যেতেন। তাদের থেকে ইলম নেয়ার জন্য না, তারা কীভাবে ইলমের ওপর আমলে করতেন, তাদের ওপর ইলমের প্রভাব কী রকম, তা দেখার জন্য।

স্রষ্টা কিংবা সৃষ্টি, কারও সামনেই নিজেকে নিয়ে অহমিকায় ভুগবেন না :

যতই আমল করুন না কেন, কখনো যেন এ নিয়ে নিজের মধ্যে গর্ব না আসে। এ নিয়ে মানুষের সামনেও অহংকার করা যাবে না, আল্লাহ ﷻ-এর সামনেও না। আমল যেন আমাদের মধ্যে আত্মতুষ্টি বা দম্ভ তৈরি না করে। ভুলেও ভাববেন না যে অল্প বা কিছুসংখ্যক আমল করেই বা কিছু ইলমের অর্জনের সুবাদে আপনি জান্নাতুল ফিরদাউস পেয়ে যাবেন।

সিলাহ ﵀-এর কথা মনে আছে? কিয়ামুল লাইলের ওপর দারসে[৮৫] আমি সিলাহ ﵀-এর কথা বলেছিলাম। *সিফাতুস সাফওয়াহ* গ্রন্থে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে। তিনি রাতের বেলা সালাত আদায় করার সময় বন্য পশুরা তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে যেত। অন্ধকার জঙ্গলে তিনি তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তাঁর অন্তরে আল্লাহভীতি এত গভীর ও প্রবল ছিল যে, আল্লাহ ﷻ জঙ্গলের প্রাণীদের মনে সিলাহ ﵀-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সিলাহ

৮৩ কারণ, আমরা আগেই বলেছি যে ইলম অনুসারে আমল করতে পারা দুনিয়ার প্রশান্তির কারণ

৮৪ *সাইদুল খাতির*, পৃ. ১৪৭

৮৫ 'কিয়ামুল লাইল' নামে বাংলায় প্রকাশিত।

www.banglakitab.weebly.com

﵀ কি কখনো আত্মতৃপ্তি আর অহমিকায় ভুগেছেন? তিনি কি কখনো বলেছেন, দেখো আমাকে, আমি সারা রাত সালাত আদায় করি! না, বরং সারা রাত সালাত আদায় করার পর ভোরে তিনি লুকিয়ে সেনাবাহিনীতে ফিরে আসতেন। সারা রাত কী করেছেন কাউকে সেটা বুঝতে দিতেন না। ভান করতেন যেন সারা রাত তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ ﷻ-এর কারামাহ লাভ করেছিলেন, বন্য প্রাণীরা তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে যেত–তাও কি তিনি অহংকার অনুভব করতেন? বরং সালাত শেষে তিনি বলতেন,

يا رَبِّ أجِرْنِي مِن النَّارِ أو مِثْلِي يِسْأَلُ الجَنَّة

তিনি মনে করতেন তিনি জান্নাত চাইবার যোগ্য নন। তাই বলতেন,

'হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, আমার মতো তুচ্ছ কেউ কি জান্নাত চাইবার যোগ্য? আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।'

সুতরাং যতটুকু আমল করুন না কেন, কখনো তা নিয়ে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে অহমিকায় কিংবা আত্মতুষ্টিতে ভুগবেন না। ইবনুল জাওযী ﵀ সাইদুল খাতিরে এমন ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা কিছুদিন আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করার পর একসময় থেমে যেত। দম্ভভরে বলত, আর কেউ আমার মতো আল্লাহ ﷻ-এর এতটা উপাসনা করেনি, এখন আমি দুর্বল হয়ে গেছি। উমার আল ফারুক ﵁ জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, শয়তান তাঁকে দেখলে ভয়ে পালিয়ে যেত। এমন অনেক উদাহরণ আছে যখন কুরআন তাঁর বলা কথার সত্যায়ন করেছে। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যার ব্যাপারে রাসূল ﷺ স্বপ্ন দেখেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজ শাসনামলে সবার প্রতি ন্যায়বিচার করেছিলেন– হোক তা একটা ভেড়া বা একজন ইহুদি, একজন খ্রিষ্টান বা একজন মুসলিম। সেই উমার ﵁ বলেছেন, আমার ইচ্ছা আমি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় পুনরুত্থিত হব যে, আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকবে না আর আমার পক্ষেও কিছু থাকবে না। অর্থাৎ তিনি কেবল জাহান্নাম থেকে, শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

মুহাদ্দিস সুফিয়ান আস সাওরি ﵀ সম্পর্কে আলী ইবনুল ফুদাইল ﵀ বলেছেন, আস সাওরি ﵀ সিজদাহয় থাকা অবস্থায় আমি সাতবার কাবা তাওয়াফ করেছিলাম। অর্থাৎ তাঁর একটা সিজদাহর সময়ে সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করে আসা যেত। ইবনুল মুবারাক ﵀ বলেছেন, আমি এক হাজার এক শ জন শাইখের সম্পর্কে লিখেছি, আর তাঁদের মধ্যে আস সাওরি ﵀ ছিলেন শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয়। তাকে বলা হয় হাদিসশাস্ত্রের আমিরুল মুমিনিন। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন ﵀-কে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﵀-এর প্রায় সমপর্যায়ের মনে করা হয়, তিনি আস সাওরি ﵀ সম্পর্কে বলেছেন,

سفيان الثورى أمير المؤمنين فى الحديث

www.banglakitab.weebly.com

সুফিয়ান আস সাওরি ﷺ হাদিসের আমিরুল মুমিনিন।

এই মহান ব্যক্তি, সুফিয়ান আস-সাওরি ﷺ কি অহংকার করতেন? আত্মতুষ্টিতে ভুগতেন? স্বীয় মৃত্যুশয্যায় হাম্মাদ বিন সালামাহ ﷺ-কে তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, তুমি কি মনে করো আমার মতো একজন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে? তুমি কি মনে করো আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার যোগ্য?

তাই যত আমল করুন না কেন, কখনোই অহংকার করবেন না, আত্মতুষ্টিতে ভুগবেন না।

www.banglakitab.weebly.com

দারস ৭

উসূল আস-সালাসাহর লেখক যে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তার তৃতীয়টি হলো দাওয়াহ, অর্জিত ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

লেখক বলেছেন,

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ

তৃতীয় মাসয়ালা : তার দিকে দাওয়াহ

কিসের দিকে আহ্বান করতে হবে? সাধারণত 'তার দিকে দাওয়াহ' বলতে ইলম অনুযায়ী আমল করার প্রতি আহ্বান করাকে বোঝানো হয়। আমরা আগেই বলেছি ইলম অর্জন করা ছাড়া তা প্রয়োগ করা সম্ভব না। কাজেই দাওয়াহ অর্থ মানুষকে ইলম অর্জন ও নিজেদের জীবনে অর্জিত ইলম বাস্তবায়নের দিকে আহ্বান করা। এ দুটি বিষয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

দাওয়াহ কি ফারযুল আইন নাকি ফারযুল কিফায়াহ?

দাওয়াহ করা কি সবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক নাকি সামষ্টিকভাবে? এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। দাওয়াহ হলো আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার–অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। এ দায়িত্ব ফারযুল আইন নাকি ফারযুল কিফায়াহ সে প্রশ্নের উত্তরের দুটো অংশ আছে।

বিশদ ইলম অর্জন করা ফারযুল কিফায়াহ :

উত্তরের প্রথম অংশ হলো, উম্মাহর মধ্যে এমন একদল লোক থাকতে হবে যারা একনিষ্ঠভাবে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করবে। এটা হলো ফারযুল কিফায়াহ বা সামষ্টিকভাবে উম্মাহর দায়িত্ব। উম্মাহর মধ্যে কোনো একদল

www.banglakitab.weebly.com

মানুষ এ দায়িত্ব পালন করলে সেটা বাকি সবার জন্য যথেষ্ট হবে। সবার খতিব হতে হবে না। আমাদের ১.৬ বিলিয়ন খতিবের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বুখারির সব হাদিসের ব্যাখ্যা বা সনদ জানা জরুরি না। উম্মাহর কিছুসংখ্যক ব্যক্তি হাদিস, মুসতালাহ, সীরাহ, তাফসীর, ফারা'ইদ (সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নীতি) ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত, গভীর জ্ঞান অর্জন করলেই সেটা যথেষ্ট। এগুলো সবই ফারযুল কিফায়াহ।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

> আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে। (সূরা আত-তাওবাহ, ১২২)

অর্থাৎ এমন একদল লোক থাকা উচিত যারা দ্বীনের জ্ঞান ও নির্দেশনা লাভ করবেন এবং অভিযানে বেরিয়ে যাওয়া লোকেরা ফিরে আসার পর তাদের এ ব্যাপারে অবহিত করবেন। দাওয়াহর অগ্রভাগে থেকে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য একদল লোকের প্রয়োজন। যখন কেউ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে তারা সেটার মোকাবেলা করবেন। দেশের সরকার যখন কুফরের প্রচার করবে তখন কাউকে না কাউকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কাউকে না কাউকে রাফীদা[৮৬], খারেজি[৮৭] আর মুরজিয়াদের[৮৮] মতবাদের জবাব দিতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। কিছু মানুষ জুমুআর খুতবা দেবেন, কিছু মানুষ জামাতের ইমামতি করবেন, কেউ কেউ অর্জন করবেন জারহ ও তা'দীলের বিশদ জ্ঞান। সবার পক্ষে এই সবগুলো দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না। বরং বিস্তারিত বিশদ জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব পুরো উম্মাহর সবার ওপর চাপিয়ে দেয়া অসম্ভব।

---

৮৬ রাফীদা/আর-রাওয়াফিদ - চরমপন্থী শিআ। যারা আবু বাকর, উমার, উসমান رضي الله عنهم এর নেতৃত্ব স্বীকার করে না। অধিকাংশ সাহাবিকে অস্বীকার করে, এবং উম্মুহাতুল মুমিনীন رضي الله عنهن এর ওপর অপবাদ আরোপ করে।

৮৭ খারিজি/আল-খাওয়ারিজ – একটি বাতিল ফিরকা। এই ফিরকার বিভিন্ন শাখা-উপশাখা আছে। এদের সবার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এমন কোনো কিছুর কারণে মুসলিমদের কাফির ঘোষণা (তাকফির) করে, যার কারণে আহলুস সুন্নাহর মতে তাকফির করা যায় না। এটা কবিরা গুনাহ হতে পারে, সগিরাহ গুনাহ হতে পারে। কোনো ভালো আমলের জন্যও হতে পারে।

৮৮ মুরজিয়া – একটি বাতিল ফিরকা। মুরজিয়া' শব্দটি এসেছে 'ইরজা' থেকে—যার অর্থ হলো বিলম্বিত করা। মূলত মুরজিয়াদেরকে মুরজিয়া বলা হয় এ জন্য যে, তারা আমলকে ঈমান থেকে বিলম্ব বা বিচ্ছিন্ন করে। ইমান ও কুফরকে তারা কেবল মুখের কথা ও অন্তরের সাথে সম্পর্কিত করে। খারিজিদের মতো যুগে যুগে মুরজিয়াদেরও অনেক দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সময়েও এদের বিভিন্ন দল-উপদল বিদ্যমান।

www.banglakitab.weebly.com

দাওয়াহ প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব :

ইবনু কাসির ﷬ বলেছেন, বাতিলের মোকাবেলা, অন্যায়ে বাধা দেয়া আর সত্য প্রচারের জন্য উম্মাহর অগ্রভাগে একদল লোকের প্রয়োজন। আমাদের উত্তরের দ্বিতীয় অংশ আমরা পাব ইবনু কাসির ﷬-এর পরের কথাগুলোয়। তিনি বলেছেন, (আর) সাধ্য অনুযায়ী বাতিলের মোকাবেলা, অন্যায়ে বাধা দেয়া আর সত্যের প্রচার করা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফারযুল আইন হলো নিজের সাধ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী দাওয়াহ করা। ব্যক্তির জ্ঞানের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে এই দায়িত্বের তারতম্য হবে। তবে ইলম অনুযায়ী নিজের চারপাশের মানুষদের কাছে তাকে দাওয়াহ পৌঁছে দিতে হবে। যে সালাত পড়ে না তাকে সালাতের দাওয়াহ দিতে হবে। এ জন্য তো খতিব হবার প্রয়োজন নেই। যখন দেখবেন কেউ সালাত আদায় করছে না, তাকে বলুন সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক, তাই আপনাকে সালাত পড়তেই হবে। আপনি জানেন গীবত করা হারাম। কাউকে গীবত করতে দেখলে বলুন, গীবত করা হারাম, এটা বন্ধ করুন। সহিহ আল বুখারিতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

'প্রচার করো আমার পক্ষ থেকে, এক আয়াত হলেও।'[৮৯]

যদি শুধু একটি আয়াতও জানেন, তাহলে সেটিই প্রচার করুন। যদি একটি আয়াতের অর্থ পরিপূর্ণভাবে জানেন, তাহলে সেটাই পৌঁছে দিন মানুষের কাছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।' (সূরা আলি ইমরান, ১০৪)

وَلْتَكُن مِّنكُمْ

আরবি ভাষায় মিন (من) দ্বারা তা'বীর (تبعير) বোঝায়। মিন ব্যবহৃত হবার কারণে 'তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকুক'-এর অর্থ সামষ্টিক দায়িত্ব বা ফারযুল কিফায়াহ হিসেবে নেয়া যায়। অর্থাৎ একদল লোক থাকবে যারা বিস্তারিত ও গভীরভাবে ইলম অর্জন করবে। তবে আরবিতে মিন দ্বারা 'জিনস'ও বোঝায়। মিন লিন জিনস অর্থ মানবজাতি। অর্থাৎ এই আয়াত

৮৯ *সহিহুল বুখারি* : ৩৪৬১

www.banglakitab.weebly.com

দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকেও বোঝানো হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফারযুল আইন দাওয়াহর অর্থও এই আয়াত থেকে পাওয়া যায়।

সহিহ মুসলিমে আছে আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিব দ্বারা। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা।[৯০]

অর্থাৎ খারাপ কিছু দেখলে প্রত্যেক মুসলিমকে তা সংশোধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হাত, মুখ এবং অন্তর দ্বারা পরিবর্তন–প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আছে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নীতিমালা।

ব্যক্তি যেসব বিষয়ের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত–যেমন : নিজ সন্তান–সেগুলোর ক্ষেত্রে তাদের দাওয়াহ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তাঁরা আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে।' (সূরা আত-তাহরীম, ৬)

দাওয়াহ্ করা ছাড়া কীভাবে আমরা তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করব? কীভাবে তাদের রক্ষা করব জাহান্নাম থেকে? প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে দাওয়াহ্ করতে হবে, কেননা সে তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং কিয়ামতের দিন এই দায়িত্বের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারীকে দাওয়াহ্ করতে হবে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, আর পরিচিতদের মাঝে, কারণ তাদের ব্যাপারে হয়তো তাকে কিয়ামতের দিনে জিজ্ঞাসা করা হবে। এমন কিছু পরিস্থিতি থাকে যেগুলোর বেলায় দাওয়াহ্ না করলে আশঙ্কা থাকে জবাবদিহির মুখোমুখি হবার। মদ পরিবেশন করা হচ্ছে এমন জায়গায় কেউ গেলে তার দায়িত্ব হলো মদ হারাম এ কথা বলা। কমসে কম সেখান থেকে চলে আসা। সেখান থেকে চলে আসাও মন্দ কাজের বাধা দেয়ার একটি উপায়–তবে উত্তম হলো মুখে নিষেধ করা।

কাজেই আমরা বুঝতে পারলাম, সুনির্দিষ্ট ও একনিষ্ঠভাবে দাওয়াহর কাজ করা, বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের পর মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়া–এমন দাওয়াহ্ হলো ফারযুল কিফায়াহ্।

৯০ *সহিহ মুসলিম* : ১৮৬

www.banglakitab.weebly.com

খাওয়ারিজ, মুরজিয়া, রাওয়াফিদ্বের ব্যাপারে মানুষকে জানানো, জারহ ও তা'দিলের আলোচনা, এগুলো এ ধরনের দাওয়াহর অন্তর্ভুক্ত। আর পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, নিজের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াহ করা প্রতিটি ব্যক্তির ওপর বাধ্যতামূলক। এটা ফারযুল আইন।

পরিপূর্ণ ইলম অর্জনের আগে কি দাওয়াহ বন্ধ রাখা উচিত?

ইলম অর্জনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার কারণে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, দাওয়াহর কাজে বিরতি দিয়ে সেই সময়টা তারা ইলম অর্জনে কাজে লাগাবেন কি না?

এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো ইমাম আহমাদ ﷺ-এর কাছ থেকে। ইবনুল জাওযী ﷺ-এর বই *মানাকিবুল ইমাম আহমাদে* বর্ণিত আছে, ইমাম আহমাদ ﷺ-এর পুত্র সালিহ ﷺ বলেছেন, একবার এক লোক বাবার হাতে একটি দোয়াত দেখতে পেল। বাবাকে সে বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ, এত উঁচু মর্যাদার আসনে আপনি পৌঁছেছেন, আপনি মুসলিমদের ইমাম, আপনি আহলে সুন্নাহর ইমাম, আর কতদিন আপনি এই দোয়াত বহন করবেন? ইমাম আহমাদ ﷺ জবাব দিলেন,

مع المحبرة الى المقبرة

কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আস সাইগ ছিলেন একজন কামার। আস-সাইগ মানে কামার। তিনি বলেছেন, আমি আর আমার বাবা দোকানে বসে কাজ করছিলাম। বাবা দেখতে পেলেন ইমাম আহমাদ ﷺ জুতো হাতে করে আমাদের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জুব্বা টেনে ধরে বাবা তাকে থামালেন। বললেন, ইমাম আহমাদ! আপনার কি লজ্জা লাগে না? আর কতদিন আপনি এই কমবয়েসী যুবকদের কাছে গিয়ে শিখবেন? যাদের কাছে গিয়ে আপনি শিখছেন তারা হয় বয়সে আপনার চেয়ে ছোট অথবা তাদের জ্ঞান আপনার চাইতে কম। ইমাম আহমাদ ﷺ বললেন, আমি আমৃত্যু তাদের কাছে গিয়ে শিখব, কেবল মৃত্যু এলেই আমি থামব।

ইবনু আবদিল বার ﷺ-এর জামিয়ু বায়ানিল ইলম গ্রন্থে আছে, ইবনুল মুবারাক ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আর কতদিন আপনি ইলম অধ্যয়নে কাটাবেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত। আরেকবার তাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ ﷻ-এর সামনে দাঁড়াবার সময় যে জ্ঞানের আমার প্রয়োজন হবে এখনো আমি তা অর্জন করতে পারিনি।

কাজেই যদি জ্ঞান অর্জন করা শেষ করে দাওয়াহ শুরু করতে চান, তাহলে তা আর কখনো করা হবে না। এ জীবনে আর দাওয়াহ করতে পারবেন না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের জ্ঞান অনুযায়ী দাওয়াহ করে যেতে হবে।

www.banglakitab.weebly.com

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ইলম অর্জন আর দাওয়াহর জন্য সময় ভাগ করে নিতে হবে। অর্থাৎ ইলমের জন্য সময় দিতে গিয়ে দাওয়াহ করা বন্ধ করলে চলবে না; বরং দাওয়াহ দেয়ার জন্য আলাদা করে সময় বের করে নিতে হবে। আমি আলী তানতাওয়িকে (বর্তমান সময়ের একজন আলেম বা দা'ঈ) বলতে শুনেছি, পড়তে শেখার পর থেকে সত্তর বছরে এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন তিনি কমপক্ষে ১০০ পৃষ্ঠা পড়েননি। কেবল সফরের সময় এর ব্যতিক্রম হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় পড়েছেন দৈনিক ২০০ পৃষ্ঠা করে। যৌবনে পড়েছেন দৈনিক ৩০০ পৃষ্ঠা করে। প্রতিদিন তিনি দশ ঘণ্টা পড়তেন। তিনি কিছুটা রসিক মানুষ ছিলেন। বলতেন, গাধাও যদি দিনে ১০ ঘণ্টা পড়ে, তাহলে সেও কিছু না কিছু শিখে ফেলবে। চিন্তা করে দেখুন, দৈনিক ১০০ থেকে ৩০০ পৃষ্ঠা, প্রতিদিন দশ ঘণ্টা করে পড়া! সারা জীবনে কত পড়েছেন! আমাদের সবার উচিত এভাবে পড়া। ইলম অর্জন একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া।

আল্লাহ ﷻ রাসূল ﷺ-কে বলেন :

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

'এবং বলুন, হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।' (সূরা আত-ত্বহা, ১১৪)

এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আমাকে আরও জ্ঞান দান করুন। কতক্ষণ পর্যন্ত? কত দিন পর্যন্ত? এ দুআর মেয়াদ কখন শেষ হবে? আল্লাহর নবি ﷺ কখন এই দুআ করা বন্ধ করতে পারবেন?

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

কখনো না। আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ করে গেছেন। তাহলে আমাদের কথা চিন্তা করুন।

ইলম অর্জনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা দাওয়াহকে অবহেলা করব। কেউ যদি মনে করে সে মদীনা বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে বা কোনো শাইখের কাছে ইলম শিখবে, নিজের ইলম অর্জনের প্রক্রিয়া শেষ করে, পরিপূর্ণ ইলম অর্জন করার পরই কেবল দাওয়াহ আর শেখাতে শুরু করবে, তাহলে সে আলিম না। হয়তো আজকের শাইখদের অবস্থা এমন কিন্তু সত্যিকার শাইখরা মৃত্যু পর্যন্ত ইলম অর্জন জারি রাখতেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করার পর বরং তাঁদের জ্ঞানের চর্চা আরও বেশি বেড়ে যেত। আপনি যদি গ্র্যাজুয়েশান শেষ হবার পর, পড়া শেষ হবার পর দাওয়াহ শুরু করবেন বলে ঠিক করেন, আর আমৃত্যু পড়াশোনা করেন, তাহলে জেনে রাখুন আপনি কোনো দিন দাওয়াহ করতে পারবেন না। কারণ, এই ইলম অর্জনের কোনো শেষ নেই। দ্বীনের জ্ঞান এতই গভীর ও বিস্তৃত যে জ্ঞানার্জনের পাঠ চুকিয়ে ফেলবেন, এ অংশের ইতি টানবেন, এমন

www.banglakitab.weebly.com

কোনো সুযোগই নেই। তাই ইলম অর্জনের পাশাপাশি সুবিধামতো সময় বের করে অর্জিত ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া শুরু করুন। পাশাপাশি, দুটো দায়িত্বের কোনটার পেছনে কতটুকু সময় দিচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখুন। বিস্তারিত জ্ঞান না থাকলে একদম মৌলিক বিষয়গুলোই মানুষকে জানান। সব মুসলিমই তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জানে। কোনো কাফিরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে জানান। এই কালিমার কোনো একটি দিক সম্পর্কে জানান, অথবা আদব-আখলাকের কোনো একটি দিক নিয়ে দাওয়াহ করুন। যদি নিজের মুখে দাওয়াহ করতে ইতস্তত বোধ করেন বা না পারেন, তাহলে অন্যের মুখের কথা দিয়ে দাওয়াহ করুন। ইসলামি বই উপহার দিন। প্রচার করুন কোনো দারস বা লেকচারের অডিও বা ভিডিও। এতে অন্যের মুখের কথা দিয়ে দাওয়াহ হলেও আপনি তার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবেন। উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তিকে দা'ঈ হতে হবে, তবে সবাইকেই মিম্বারে দাঁড়িয়ে দাওয়াহ দিতে হবে না। প্রত্যেককে দাওয়াহর দায়িত্ব পালন করতে হবে নিজ সাধ্য, সময় ও জ্ঞানানুযায়ী। দাওয়াহর জন্য বের করে নিতে হবে কিছু সময়।

দাওয়াহ শুধু শাইখ বা আলিমদের একচ্ছত্র অধিকার না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে যুবকেরা দাওয়াহ না দিলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়া হলো জাহাজে থাকা যাত্রীদের মতো। ধরুন কোনো লোক জাহাজ ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হলো। এখন কেউ যদি বাধা না দেয়, তাহলে সবাই মারা যাবে। আর যদি সবাই মিলে জাহাজটিকে রক্ষা করে, তাহলে সবাই নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে।[৯১]

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে না জেনে কথা বলার বিপদ :

যদিও আমরা সবাইকে দাওয়াহর ব্যাপারে উৎসাহিত করছি তবে অবশ্যই আমাদের সবার নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। কোনো জ্ঞান ছাড়া কথা বলা, দাওয়াহ দেয়া এখন বিশ্বব্যাপী মহামারির মতো হয়ে গেছে। কেউ হয়তো বক্তা

৯১ নুমান ইবনু বাশির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদানকারী) এবং ওই সীমা লঙ্ঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হলো এমন এক সম্প্রদায়ের মতো, যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট জাহাজে লটারি করে কিছু লোক ওপরতলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণত পানির ভেতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদের ওপরতলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা ওপরতলায় যেতে লাগল। (ওপরতলার লোকদের ওপর পানি পড়লে তারা তাদের ওপরভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল্যে, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদের কষ্ট দিতে এসো না।') নিচতলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোনো স্থানে) ছিদ্র করে দিই, তাহলে (আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর ওপরতলার লোকদের কষ্টও দেবো না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি ওপরতলার লোকেরা তাদের নিজ ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যাবে। (ওপরতলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে ওপরতলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যাবে এবং সকলকেই বাঁচিয়ে দেবে।' (সহিহুল বুখারি : ২৪৯৩; তিরমিযি : ২১৭৩; আহমাদ : ১৭৮৯৭)

www.banglakitab.weebly.com

হিসেবে ভালো, কয়েকদিন হলো দাড়ি রাখছে আর মাথায় কুফিয়া বাঁধছে—হঠাৎ দেখা যায় সে এলাকার মসজিদে বক্তব্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। অথবা কিছু লেকচার ভিডিও করে ইউটিউবে আপলোড করা শুরু করেছে। তারপর কী হয়? যে সারা জীবন মেডিকেলে পড়েছে অথবা আইন বা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছে, কিংবা ব্যবসা করেছে, পাশাপাশি দ্বীনের জ্ঞানের টুকিটাকি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা সে রাখে—রাতারাতি এমন লোক শাইখ বনে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে একেকজন মুফতি বা আলিম। আত্মবিশ্বাসের সাথে সে উম্মাহর ভবিষ্যৎ ও উত্তরণের সাথে সম্পর্কিত এমন সব ব্যাপারে কথা বলতে করতে শুরু করে দিয়েছে, যেসব বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে খোদ সাহাবা ﷺ ও ইমামগণও পিছিয়ে যেতেন।

অনেক ক্ষেত্রেই নির্দোষভাবে ব্যাপারটা শুরু হয়। হয়তো সে ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু করে। মানুষকে শেখায়। হয়তো সে হাদিস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে। হয়তো দু-একটা ভালো খুতবা বা লেকচার সে দেয়। কাফিরদের কোনো এলাকায় গিয়ে হয়তো সে দাওয়াহ করে—এভাবে ব্যাপারটা শুরু হয়। কিন্তু অনেকে এসব ক্ষেত্রে দ্বীনের সীমারেখা সম্পর্কে সচেতন থাকে না। জানে না যে কখন, কোথায় থামতে হবে। দেখা যায় নিজ এলাকার মানুষের মাঝে লেকচার কিংবা খুতবা দেয়ার পর সে কয়েক দিনের দাড়ি মুখে ঘনঘন কুফিয়া পড়া শুরু করে দেয়। তারপর হয়তো সে হজে যায়। আর হজ থেকে ফেরার পর হয়ে যায় শাইখ বা মুফতি। কেউ হয়তো উমরাহ থেকে ফিরে, কয়েক দিন মদীনায় কাটিয়ে নিজেকে শাইখ ভাবতে শুরু করে। অথচ হজের জন্য সে তিন সপ্তাহ মদীনায় কাটিয়েছে। তিন সপ্তাহ! এই তিন সপ্তাহে সে কতটুকু কী শেখে?

মানুষের সমস্যা হলো, তারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন না। আজ আমরা 'কে শাইখ?' এটা জিজ্ঞেস করি না। বরং আমরা জিজ্ঞেস করি কে শাইখ না। আজ যেকোনো জায়গায়, যেকোনো পরিস্থিতে ইসলামি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেখুন। দেখুন কয়জন বলে—আল্লাহু 'আলাম, চলুন শাইখের কাছ থেকে জেনে আসি। আজ কেউ আলিমের কাছ থেকে জেনে আসার পরামর্শ দেয় না। এটা আজ খুব বিরল একটা ব্যাপার। তাবে'ঈ আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা ﷺ এক শ বিশজন আনসার ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা অন্য কারও কাছে পাঠিয়ে দিতেন, শেষপর্যন্ত দেখা যেত যে প্রশ্ন ঘুরেফিরে আবার প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরে এসেছে। এক শ বিশজনের কাছ থেকে ঘুরে প্রশ্ন আবার ফিরে আসতো প্রথমজনের কাছে। তাঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন না, যিনি হাদিস বর্ণনা করার সময় চাইতেন না যে, তাঁর বদলে অন্য কোনো মুসলিম ভাই এ দায়িত্ব নিক। এমন একজন ছিলেন না, যিনি ফতোয়া দেয়ার বেলায় মনে মনে কামনা করতেন না যে তাঁর বদলে অন্য কোনো ভাই এ কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাক। আজকের যুগে কি এটা চিন্তা করা যায়? দ্বীনের কোনো বিষয়ে জানার জন্য ১২০ জনের কাছে যাওয়ার কথা আজ চিন্তাই করা যায় না। কারও সামনে কিছু বলা হলে, সে নিজের মনমতো একটা জবাব দিয়ে দেবে। অথচ তাকে বলুন, আমার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেছে

www.banglakitab.weebly.com

কী করব? সে বলবে রিপেয়ারিং সেন্টারে নিয়ে যাও। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে আজ সবাই নিজেদের শাইখ ভাবে।

উমার ﵁ বলতেন, দ্বীনের কোনো বিষয়ে নিজের মতামত দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করো। উমার আর আলী ﵄ ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দ্বীনের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তাদের কাছে এলে, তাঁরা কখনো তড়িঘড়ি করে উত্তর দিতেন না। বরং অন্যান্য সাহাবি ﵃-দের ডেকে আলোচনা করতেন—হয়তো এ বিষয়ে এমন কোনো হাদিস কারও জানা আছে যা অন্যরা জানত না। আপনি কি মনে করেন, উমার বা আলী ﵄ আসলে প্রশ্নগুলোর উত্তর না জানার কারণে সাহাবি ﵃-দের ডেকে আনতেন? না, বরং তাদের ডাকতেন উত্তরের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হবার জন্য, ছোট্ট কোনো বিষয়ও যেন নজর এড়িয়ে না যায় তা নিশ্চিত হবার জন্য।

তাবে'ঈ আতা ইবনুস সাইব ﵀ বলেছেন, আমি এমন মানুষ দেখেছি কোনো বিষয়ে ফতোয়া চাইলে জবাব দেয়ার সময় তাঁরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। তাদের হাঁটু কাঁপত, শরীর প্রকম্পিত হতো। এখানে তিনি কাদের কথা বলছেন? তিনি সাহাবি ﵃-দের কথা বলছেন। তাঁদের এমন প্রতিক্রিয়া হতো, কারণ তারা আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করতেন। তাঁরা জানতেন যে, এই ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তাবে'ঈ আশ-শা'বী, হাসান আল বাসরী আর আবু হুসাইন ﵏ বলেছেন,

ان احدهم ليفتى فى المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر

> আজকাল তোমরা এমন সব বিষয়ে ফতোয়া দাও যেগুলো উমার ﵁-এর কাছে উপস্থাপন করা হলে মাশোয়ারা করতে তিনি বদরি সাহাবিদের উপস্থিত করতেন।[৯২]

আশ শা'বী, হাসান আল বাসরি ﵏ আজ থাকলে কী বলতেন? উম্মাহর প্রথম শতাব্দীর মানুষের ব্যাপারে যদি তারা এমন কথা বলেন, তাহলে আজকের লোকেদের ব্যাপারে তারা কী বলতেন? ওয়াল্লাহি, কুরআনের একটা আয়াতও ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, এমন লোকেরা আজ মুফতি হয়ে গেছে—সেটা তারা নিজেরা দাবি করুক কিংবা অন্যরা। মানুষ আজ এতটা অজ্ঞ, এতটা জাহিল যে ইসলামের রহিত হয়ে যাওয়া, মানসুখ হয়ে যাওয়া বিধান এনে এরা নিজেদের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে। ওয়াল্লাহি, কুরআনের একটা আয়াত শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে না এমন লোককে আমরা ফতোয়া দিতে শুনেছি। দেখেছি মানসুখ হয়ে যাওয়া বিধানকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে ফ্রি মিক্সিং-এর মতো ব্যাপারকে হালাল প্রমাণ করার চেষ্টা করতে।

ইমাম মালিক ﵀ বলতেন,

من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار ، وكيف

৯২ *ই'লামুল মুয়াক্কিয়িন* : ৪/২১৯

www.banglakitab.weebly.com

يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب

ইসলামের কোনো বিষয়ে নিয়ে কেউ কথা বলতে কিংবা ফতোয়া দিতে চাইলে, সে যেন আগে চিন্তা করে, আল্লাহ ﷻ-এর সামনে যখন দাঁড়াবে তখন কোন উত্তর তার জন্য উত্তম হবে। কোন উত্তর তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে যখন সে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে দাঁড়াবে। সে যেন উত্তর দেয়ার আগে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে, আর তারপরই যেন উত্তর দেয়।[১৩]

এক লোক ইমাম মালিক ﵀-কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু তিনি জবাব দেননি। লোকটি তখন বলল, আবু আব্দিল্লাহ্ অনুগ্রহ করে জবাব দিন। জবাবে ইমাম মালিক ﵀ বলেছিলেন, তুমি কি চাও আল্লাহ ﷻ-এর সামনে আমি তোমার কাজের জন্য দায়ী হই? আমি তোমাকে কিছু বলার পর তুমি যে কাজ করবে তার জন্য আমি দোষী হব আর তুমি আমার ওপর দোষ দিয়ে পার পেয়ে যাবে?

হাইসাম ইবনু জামিল বলেন, একবার ইমাম মালিক ﵀-কে আটচল্লিশটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বত্রিশটির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন আর বাকিগুলোর ব্যাপারে বলেছিলেন, 'আমি জানি না'। সারা দুনিয়াতে আজ আটচল্লিশটি প্রশ্ন করে দেখুন, কয়টার জবাব পান। পঞ্চাশটা প্রশ্ন করলে আজ পঞ্চাশটারই জবাব পাবেন। দশটা করলে দশটার জবাব পাবেন। আজ উম্মাহর এমনই দুরবস্থা।

একজন ব্যক্তি ইমাম মালিক ﵀-কে বললেন, আবু আব্দিল্লাহ আপনি যদি না জানেন, তাহলে আর কে জানবে বলুন? আপনিই তো আমাদের সময়ের মুফতি। ইমাম মালিক ﵀ বললেন, তুমি কি আমাকে আমার নিজের চেয়ে বেশি চেনো? তিনি যা বোঝাতে চাচ্ছেন তা হলো, 'তুমি কি মনে করছ আমি বিশেষ কেউ? আমি একজন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র আর আমি আমার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত।' যদি ইমাম মালিক ﵀ নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকেন, তাহলে এখনকার সময়ের মানুষদের কি আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত না? তিনি আরও বলেছিলেন, ইবনু উমার ﵄ যদি 'আমি জানি না' বলতে পারেন, তাহলে আমিও বলতে পারি। অহংকার, প্রতিপত্তি আর নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ধ্বংস করে ফেলে। এগুলো ইমাম মালিক ﵀-এর কথা। আর এ জিনিসগুলোর লোভেই মানুষ আজ 'আমি জানি না' বলে না। না জানার কথা স্বীকার করে না।

এখানে একটা কথা বলি। ফতোয়া দেয়ার আগে উমার ﵁ মাশোয়ারার জন্য বদরি সাহাবি ﵃-দের ডেকে আনতেন। কেবল তার কাছ থেকে ফতোয়া জানার জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, দূরদূরান্ত থেকে ভ্রমণ করে আসা লোকদের প্রশ্নের জবাবে ইমাম মালিক ﵀ বলতেন, 'আমি জানি না'। তার মানে কি তারা আসলেই এসব প্রশ্নের জবাব জানতেন না? তাদের কি জ্ঞানের কমতি ছিল? আমি সব সময় বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করি।

১৩ শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*: ১০/৩২৪ (দারু ইবনি আফফান)

www.banglakitab.weebly.com

ইমাম আশ-শাফে'ঈ ﷺ-কে ফতোয়া দেয়ার ইজাযাহ দেয়া হয়েছিল ১৫ বছর বয়সে। তার শাইখ ইবনু উয়াইনাহ ﷺ ১৫ বছর বয়সে তাঁকে বলেছিলেন তুমি এখন থেকে ফতোয়া দিতে পারো। শৈশব থেকে এই শাইখ তাকে পড়িয়েছিলেন। তিনিও ইমাম শাফে'ঈ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইতেন, হাদিসের ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মত জানতে চাইতেন। ইমাম শাফে'ঈ ﷺ-এর শিক্ষক মানুষকে বলতেন তোমরা আশ- শাফে'ঈর কাছ থেকে ফতোয়া নাও। ইমাম মালিক ﷺ ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব নেন ২১ বছর বয়সে। এ অবস্থায়ও তিনি বিভিন্ন শাইখের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আসলেই ফতোয়া দেয়ার যোগ্য? তাঁরা উল্টো ইমাম মালিক ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শাইখ যদি বলতেন তুমি ফতোয়া দিতে পারবে না, তাহলে কি তুমি বিরত হতে? তিনি জবাব দিলেন, নিশ্চয়।

ইবনুল জাওযী ﷺ-এর বিশিষ্ট দুজন শাইখের কথা আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি। এমন ফতোয়া দেয়া থেকেও তারা অনেক সময় বিরত থাকতেন যেগুলোর জবাব তাদের হালাকার আনাড়ি ছাত্ররাও দিতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখুন, এর মানে কি এই যে, তারা এসব বিষয়ে জানতেন না? গ্বাইব সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এসব প্রশ্নের জবাব তারা জানতেন। আমার ধারণা এসব বিষয়ে আলিমদের একাধিক মত অথবা একাধিক হাদিস থাকার কারণে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন না যে কোন মতটি সঠিক। তারা হয়তো ৯৯.৯৯% নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু শতভাগ নিশ্চিত না হওয়ায় তারা এই বিষয়গুলোতে ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে পিছিয়ে যেতেন। এই ইমামদের সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে এটাই আমার ধারণা।

অফিসের বস যদি কিছু কিছু বিষয়ের ভার আপনার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেন, তাহলে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনি এক শ বার চিন্তাভাবনা করবেন। অন্যদের মতামত জানতে চাইবেন। আপনার বসকে আপনি খুশি করতে চান, তাই সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনি বিভিন্নজনকে জিজ্ঞেস করবেন যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কি না, সেটা বুঝতে পারেন। আপনি যদি কোনো রাজা, প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টা হন আর তার পক্ষ থেকে কিছু কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই আপনি নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন যে আপনি যেই সিদ্ধান্তটি নিচ্ছেন তা ১০০% সঠিক। এসব ক্ষেত্রে আপনার দায়বদ্ধতা অফিসের বস বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। একইভাবে যে ব্যক্তি ফতোয়া দেন তার দায়বদ্ধতা স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-এর কাছে। কেননা, এই ব্যাপারে তাকে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে দাঁড়াতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে। ভুল হলে বসের কাছ থেকে আপনি পার পেতে পারেন। রেহাই পেতে পারেন রাজা বা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে? আসমান-জমিনের মালিকের কাছে থেকে কীভাবে রেহাই পাবেন?

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ নিষেধ করেছেন তাঁর ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত, অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলতে। আর এটি সবচেয়ে গুরুতর নিষেধাজ্ঞাগুলোর অন্যতম। ইবনুল

www.banglakitab.weebly.com

কাইয়্যিম ﷺ একে সর্বনিকৃষ্ট গুনাহর একটি হিসেবে গণ্য করতেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।' (সূরা আরাফ, ৩৩)

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ গুনাহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ফেলেছেন। এই আয়াতে তিনি চার শ্রেণির গুনাহর কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন ফাওয়াহিশের (কবীরা গুনাহ, যেমন যিনা ও ব্যভিচার) কথা, তারপর যুলুম, তারপর শিরক আর তারপর বলেছেন সর্বনিকৃষ্ট মাত্রার গুনাহর কথা—না জেনে আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে কথা বলা, না জেনে তাঁর ব্যাপারে কিছু আরোপ করা। আল্লাহ ﷻ শুরু করেছেন সবচেয়ে কমমাত্রার গুনাহ দিয়ে আর শেষ করেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্টমাত্রার গুনাহর কথা বলে।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বোলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।' (সূরা আন-নাহল, ১১৬)

আতীক ইবনু ইয়াকুব এবং ইবনু ওয়াহহাব ﷺ বলেছেন, ইমাম মালিক ﷺ-কে তারা বলতে শুনেছেন যে, সাহাবা ﷺ ও সালাফগণ কখনো 'হালাল' বা 'হারাম' বলতেন না। বরং তারা বলতেন, 'আমরা এটা পছন্দ করি' বা 'আমরা এটা অপছন্দ করি'। তাঁরা বলতেন, 'অমুক কাজ করা উচিত' বা 'অমুক কাজ করা উচিত না'। হালাল হারাম শব্দগুলো তারা ব্যবহার করতেন না, কারণ এই আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

www.banglakitab.weebly.com

'বলো, আচ্ছা নিজেই লক্ষ করো, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বলো, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছ?' (সূরা ইউনুস, ৫৯)

আজকের অনেক অজ্ঞ লোকেরা কেবল বই পড়ে শিখতে গিয়ে যখন দেখে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ কোনো বিষয়ে তার অপছন্দের কথা বলেছেন, তখন তারা বুঝতেও পারে না যে তিনি মূলত হারাম বুঝিয়েছেন। কেননা, ইমাম আহমাদ ﷺ 'হারাম' শব্দটি ব্যবহার করতেন না। আমি আগেও বলেছি, একা একা কোনো শিক্ষক ছাড়া পড়া, ইলম অর্জনের সঠিক উপায় না। আলিমদের মধ্যে অনেকেই 'হারাম' শব্দটি ব্যবহার করেননি। এ বিষয়টি অনেক ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ ﷻ-এর ভয়ে তাঁরা হারাম-হালাল বলা থেকে বিরত থাকতেন। তারা বলতেন 'এটা পছন্দনীয়', 'ওটা অপছন্দনীয়'। ইমাম মালিক ﷺ এমন অসংখ্য উদাহরণ এনেছেন যেখানে সালাফরা 'হারাম' বোঝাতে 'মাকরুহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাধারণভাবে এভাবে বলার প্রচলন ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

'আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে টেনে বের করে নেবেন না; বরং আলিমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বিনা ইলমেই ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষদেরও পথভ্রষ্ট করবে।'[৯৪]

فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

এরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট আর অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।

তাই সেই বিষয়গুলোর দাওয়াহ দিন যেগুলো আপনি সঠিকভাবে, নিশ্চিতভাবে জানেন। আর যে বিষয়ে জানেন না, তা নিয়ে দাওয়াহ করা থেকে বিরত থাকুন। এসব ব্যাপারে কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করলে বলে দিন যে আপনি জানেন না। কিংবা সময় নিয়ে সেই বিষয়ে গবেষণা করে, লেখাপড়া করে তাকে জানান। তবে তাই বলে দাওয়াহ বন্ধ করে দেবেন না। 'আমি কিছু জানি না তাই দাওয়াহ করব না' এমন বলবেন না। বরং যা জানেন তা অন্যকে জানান, আর যা জানেন না সেই বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

৯৪ *সহিহুল বুখারি* : ১০০; *সহিহ মুসলিম* : ৬৯৭১

www.banglakitab.weebly.com

দারস ৮

উসুল আস-সালাসাহর লেখক তিনটি মৌলনীতি নিয়ে আলোচনার আগে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এই চারটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক। প্রথমটি হলো ইলম–আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ আর দ্বীন সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে কবরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। দ্বিতীয়টি হলো এই জ্ঞান বা ইলমের ওপর আমল করা, তৃতীয়টি হলো দাওয়াহ ইলাল্লাহ বা এ ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

লেখক বলেছেন,

الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ

অর্থাৎ, পৌঁছে দেয়া, জানিয়ে দেয়া। কী পৌঁছে দিতে হবে?

গত দারসের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আমাদের আহ্বান করতে হবে ইলম অর্জন ও তার ওপর আমল করার দিকে।

দাওয়াহর অজুহাতে গুনাহয় লিপ্ত হবেন না :

কিছু মানুষ নিজেদের সাথে প্রতারণা করে। আল্লাহ ﷻ-এর সাথে প্রতারণা করা যায় না, তাই তারা আসলে নিজেদেরকেই প্রতারিত করে। নিজেদের গুনাহ আর ভুল অবস্থানগুলোকে তারা দাওয়াহর অজুহাতে জায়েজ করতে চায়। যেখানে মদ পরিবেশন করা হচ্ছে আপনি সেখানে থাকতে পারবেন না। মদের টেবিলে বসে আপনি দাবি করতে পারেন না যে, আপনি সেখানে দাওয়াহর জন্য বসে আছেন। উমার ﷺ-এর কাছে এমন একটি ঘটনার ব্যাপারে অভিযোগ এসেছিল। যারা মদ খেয়েছিল তাদের আগে যারা মদ খায়নি তিনি তাদের বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যখন বলল তারা সাওম পালন করছে, উমার ﷺ আগে সাওম পালনকারীদের শাস্তি দেবার আদেশ দিয়েছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

একজন মুসলিম ভাইয়ের কখনো উচিত না অমার্জিত, অশালীন পোশাক পরা নারীদের কাছে গিয়ে দাওয়াহ দেয়া বা একা একা নির্জনে কোনো বোনকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। এমন কাজ করা যাবে না এবং এটাকে দাওয়াহও বলা যাবে না। আজ এমন অনেকে আছে যাদের দেখে মনে হবে এরা মডেল হবার চেষ্টা করছে–টাইট জিন্স পরে, মাথায় কাপড় প্যাঁচিয়ে, হাতে লিফলেট নিয়ে এরা মানুষের সামনে যাচ্ছে আর বলছে, এটা দাওয়াহ! না, এমন করা যাবে না। বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করছি কারণ আজ এগুলো মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন : মুসলিমদের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের ব্যাপারগুলো আজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যেহেতু এ ধরনের কাজ যারা করছেন তারা সালাত আদায় করেন, তাই আমরা তাদের কাফির বলতে পারি না। কিন্তু জেনে রাখুন, এ রকম আচরণ কবীরা গুনাহ। বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে সব রকমের গানবাজনা থাকে। থাকে নিসাউন কাসিয়াতুন আরিয়াত[৯৫], নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, আর নারীদের এমন বেশভূষা যা দেখা গায়রে মাহরামের সম্পূর্ণ নাজায়েয। অথচ অনেকে এমন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, দিব্যি অবস্থান করছেন এমন পরিবেশে। আপাতদৃষ্টিতে বেশ ধার্মিক, দ্বীনদার ভাইদেরও এমন করতে দেখা যায়। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এখানে তিনি কী করছেন, কেন তিনি এমন একটা জায়গাতে স্বেচ্ছায় অবস্থান করছেন? উত্তর আসবে, দাওয়াহর খাতিরে। এটা প্রায়শই দেখা যায়। আমি বলছি না যে সবাই এ রকম কাজ করে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বিয়ের অনুষ্ঠানের ফিতনাময় পরিবেশে অবস্থানের জন্য দাওয়াহর অজুহাত দেয়া হচ্ছে। এ রকম পরিবেশে যাওয়া কেবল তখনই জায়েজ হবে যখন আপনি জানেন যে এসব হারাম কাজ থেকে তাদের আপনি বিরত রাখতে পারবেন। আর এটা হলো আমর বিল মারুফ আর নাহি আনিল মুনকার—সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের সর্বোত্তম পন্থা। যদি আপনি নিশ্চিত হন আপনার কথা শুনে তারা এসব বন্ধ করবে, তাহলে আপনার যাওয়া কেবল উচিতই নয়, বরং আপনাকে যেতে হবে এবং তাদের এসব কাজ থেকে বিরত করতে হবে। আর যদি আপনি জানেন যে তারা আপনার কথা শুনবে না, তাহলে আপনার এসব জায়গায় অবস্থান করা উচিত না।

চার মাযহাবের ফিকহের কিতাবাদি–*দুররুল মুখতার*, মালিকি মাযহাবের *আদ-দুসুকি*, আশ-

---

৯৫ এমন নারী, যে কাপড় পরেও উলঙ্গ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দুই প্রকার জাহান্নামী মানুষ আসবে, যাদের আমি আমার যুগে দেখতে পাচ্ছি না। এক প্রকার হচ্ছে, ওই সমস্ত ব্যক্তি, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো লাঠি থাকবে, তা দিয়ে তারা মানুষকে পেটাবে। আর দ্বিতীয় হলো, ওই সকল মহিলা যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে। তারা সাজসজ্জা করে পরপুরুষকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার খোপা (সাজসজ্জা ও ফ্যাশানের দরুন) উটের কুঁজের মতো এদিক-ওদিক হেলানো থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিটুকুও পাবে না। অথচ, জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচ শ বছর রাস্তার দূরত্ব থেকেও অনুভব করা যাবে।' (সহিহ মুসলিম : ৫৭০৪)

www.banglakitab.weebly.com

শিরাজির *আল মুহাযযাব*, ইবনু দ্বইয়্যান-এর *মুবদা* এবং ইবনু কুদামার *আল-মুগনি* খুলে দেখুন। দেখবেন বলা হয়েছে, কোনো মুনকার বা মন্দ কাজ থামানোর সামর্থ্য থাকলে তা করা উচিত, আর তা না হলে এমন কোনো জায়গায় অবস্থান করা উচিত না যেখানে গুনাহ্ হচ্ছে। আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হলেও না। আমি আলাদা করে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা উল্লেখ করলাম, কেননা অধিকাংশ আলিমের মত হলো একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ওয়াজিব। তাহলে দেখুন, যদিও নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ওয়াজিব, কিন্তু যখন সেটা এমন জায়গাতে হয় যেখানে প্রকাশ্যে গুনাহ্ ও ফাহিশা চলছে, তখন সেখানে যাওয়া আর ওয়াজিব থাকে না। যে কিতাবগুলোর কথা ওপরে বললাম সেগুলোতে বলা আছে এ রকম ক্ষেত্রে ওয়াজিব পরিবর্তিত হয়ে হারাম হয়ে যায়। অর্থাৎ আপনি যদি সেখানে গিয়ে গুনাহ বা ফাহিশা বন্ধ করতে না পারেন, তাহলে সেখানে যাওয়া আপনার জন্য হারাম।

আমাদের এমন অনেক ভূখণ্ড আছে, যেগুলো দখল হয়ে আছে আজ অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময়জুড়ে। এর মধ্যে এমনও ভূমি আছে, যেখানে অবস্থিত আমাদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। '...মুক্ত করো! মুক্ত করো!'–স্লোগান দেয়ার অনেকে আছে। মুক্ত করা নিয়ে তারা বিস্তর কথা বলে। কিন্তু সব কথা শেষ হবার পর, বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। প্রশ্ন করতে হয়, কেন উম্মাহর দুর্বল শরীর আজ এ নর্দমায় এসে ঠেকেছে? পবিত্র ভূমিকে ঘিরে যা হচ্ছে, কেন তা এত বছর ধরে চলছে? কেন লজ্জা আর অপমানের মধ্যে দিয়ে আমাদের এতগুলো বছর অতিক্রম করতে হচ্ছে? আমাদের উচিত চিন্তা করা, বিশ্লেষণ করা।

ধরুন একটি কোম্পানি লস করল। তখন কী হয়? কোম্পানির সিইও তার ম্যানেজার আর অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়ে মিটিংয়ে বসে। মিটিংয়ে সিইও সাধারণত ধরাবাঁধা কিছু প্রশ্ন করে :

কী করা যায়?

কোন স্ট্র্যাটিজি অনুসরণ করলে আগের মতো প্রফিট করা যাবে?

আমরা এখন যা করছি তার মধ্যে কী কী পরিবর্তন আনা দরকার?

মুসলিম-অমুসলিম সব জেনারেলরাই যুদ্ধে পরাজয়ের পর নিজেদের একটা ট্যাকটিকাল প্রশ্ন করে–আমরা এ যুদ্ধে কেন হারলাম?

এ হারের পেছনে কী কারণ ছিল?

একই রকমভাবে যখন ১.৬ বিলিয়নের মুসলিম উম্মাহ, ছয় কিংবা বড়জোর ১৬ মিলিয়নের একটি জাতির কাছে পরাজয়, লাঞ্ছনা আর অপমানের তিক্ততম স্বাদ অনুভব করে, তখন আমাদেরও প্রশ্ন করা দরকার :

কেন?

www.banglakitab.weebly.com

সাহাবি ﷺ-গণও পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের পরে এই পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে তারা নিজেদের প্রশ্ন করেছিলেন :

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল।' (সূরা আলি ইমরান, ১৬৫)

যেভাবে আমরা চিন্তা করছি কেন আজ আমরা অধঃপতনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছি, ঠিক তেমনিভাবে উহুদের পরাজয়ের পর মদীনা ফেরার পথে সাহাবি ﷺ-গণও প্রশ্ন করেছিলেন—কেন?

أَنَّىٰ هَٰذَا

কেন আমাদের সাথে এমনটা হলো?

কোন স্ট্র্যাটিজি অনুসরণ করলে আমরা হার এড়াতে পারব?

আমরা কেন হারলাম? কী কী কারণে?

মদীনায় পৌঁছানোর আগেই আল্লাহ ﷻ তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন।

قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ

'তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে।'

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

'তোমার রব বান্দাদের প্রতি কোনো যুলম করেন না।' (সূরা ফুসসিলাত, ৪৬)

নিজেকে যাচাই করে দেখুন। উপকরণের মাধ্যমে মুক্তি আসে না; বরং শয়তানের তৈরি উপকরণ অধঃপতন ডেকে আনে। শয়তানের তৈরি পদ্ধতি দিয়ে দখল হয়ে যাওয়া ভূখণ্ড মুক্ত করা সম্ভব না। শয়তানের তৈরি ব্যবস্থা মুক্তির উপায় না; বরং অধঃপতনের কারণ। আপনি কার কাছ থেকে বিজয় আশা করছেন? কোন বিজয় আশা করছেন? বিজয় কে দেবে?

www.banglakitab.weebly.com

পাপাচার ছড়িয়ে পড়লে সবার ওপরে এর প্রভাব পড়ে :

সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থাই এমন বা প্রত্যেকে গুনাহতে লিপ্ত, আমি সেটা বলছি না। আমি এটাও বলব না যে, সমাজের বেশির ভাগ মানুষ এসবে লিপ্ত; বরং আমি এমনভাবে বলব যে হয়তো বেশির ভাগ মানুষই এমন না। কিন্তু গুনাহ যখন জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায় তখন তা কোনো না কোনোভাবে সমাজের প্রতিটি মানুষকে প্রভাবিত করে। ফিলিস্তিন কিংবা আমাদের এখানে (অ্যামেরিকা) এমন কিছু শহর আছে যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। সেখানে এটা ব্যতিক্রম না, এগুলোই স্বাভাবিক রীতি। বরং কেউ যদি গান-বাজনা ছাড়া ইসলামি রীতি অনুসারে বিয়ে করতে চায়, তাহলে সে অস্বাভাবিক, অদ্ভুত, অসামাজিক ইত্যাদি নানা উপাধি পায়। এগুলো আজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি বারবার বলছি এবং বলব, সবাই যে এমন করছে তা না। বরং আমরা একটু বাড়িয়েই বলব যে, হয়তো অধিকাংশই এমন করছে না। কিন্তু এসব গুনাহ আজ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে, এটা বাস্তবতা।

উহুদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ﷺ-এর অধীনে ছিলেন পঞ্চাশজন সেনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ অমান্য করার নিয়ত বা উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। বরং তারা ছিলেন এমন সব মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধের একটি পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে নিজেদের অবস্থান থেকে তাঁরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা যেটাকে সঠিক মনে করেছিলেন, সেটাই করেছিলেন। সাহাবি ﷺ-দের সম্মান, মর্যাদা ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে, 'তারা ভুল করেছিলেন' এভাবে আমরা বলি না। বরং আমরা বলি উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে নিজেদের অবস্থান থেকে তাঁরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ﷺ বাকিদের বললেন, আমি পাহাড় থেকে নামব না, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কোনো অবস্থাতেই এই স্থান ত্যাগ না করতে। তাই এখান থেকে আমি সরব না। দেখুন কীভাবে সাত শ জন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পরাজিত হলেন, কারণ মাত্র পঞ্চাশজন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা সঠিক ছিল না। এ পঞ্চাশজনের মধ্যে অনেকে কিন্তু শেষপর্যন্ত পাহাড়ের ওপরে অবস্থান করেছিলেন। তাই সংখ্যাটা আসলে পঞ্চাশের চেয়ে কম। সেই সময়ের সম্পূর্ণ মুসলিম উম্মাহ পরাজিত হলো পঞ্চাশজনের চেয়েও কমজনের সিদ্ধান্তের কারণে। তাহলে গুনাহ আর অসৎ কাজ যখন ছড়িয়ে পড়ে, যখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায় তখন তো উম্মাহ পরাজিত আর লাঞ্ছিত হবেই। এটাই নিয়ম।

قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ

'তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে।'

আমি সজ্ঞানে, দায়িত্ব নিয়ে বলছি–ফিলিস্তিনে এমন কিছু শহর আছে যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠানে নির্লজ্জভাবে নারী-পুরুষের মেলামেশা হয় আর নারীরা এমন সব অশালীন পোশাক পড়ে যা

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের শত্রুদের (ইহুদি) সংস্কৃতিকেও হার মানাবে। আমি এই শহরগুলোর নাম আর উল্লেখ করলাম না।

সুনান আত-তিরমিযির একটি সহিহ হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই উম্মাহর মাঝে 'মাসখ' ঘটবে।

মাসখ কী?

মাসখের সংজ্ঞায় আল মানাওয়ি বলেছেন,

'মাসখ হলো, চেহারাকে বিকৃত করে দেয়া, অথবা অন্তরকে বিকৃত করে দেয়া।'[৯৬]

উম্মাহর মধ্যে একসময় মাসখ ঘটবে শুনে সাহাবি رضي الله عنهم-গণ জিজ্ঞেস করলেন এটি কোন সময়ে ঘটবে? তার আগে আসুন মাসখ নিয়ে আরেকটু বিস্তারিতভাবে জানা যাক।

মাসখ হলো মানুষকে অন্য কোনো কিছুতে রূপান্তর করে দেয়া। যেমন : এটা হতে পারে মানুষকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেয়া, যেমন অন্য হাদিসের বর্ণনায় এসেছে। যদিও এই হাদিসে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি তবুও হতে পারে যে মানুষকে বানর কিংবা শূকর বানিয়ে দেয়া হবে। আবার মাসখ দ্বারা এটাও বোঝানো হতে পারে যে, মানুষের মন-মানসিকতা বদলে দেয়া হবে। হতে পারে আপনি কারও সাথে কথা বলছেন, যে বাহ্যিকভাবে মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু তার মানসিকতা মোটেই মানুষের মতো না। আপনি তাকে বোঝাচ্ছেন, ভাই, আল্লাহর কসম এটা তো হারাম কাজ–কিন্তু সে কিছুই বুঝছে না। আপনার কথা আর তার বুঝের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তাই এই হাদিস দিয়ে শারীরিক রূপান্তর কিংবা মানসিকতার পরিবর্তন দুটোকেই বোঝানো হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, خسْفٌ و مسْخٌ খাসফ ও মাসখ হবে। খাসফ, অর্থাৎ ভূমিকম্প হবে, ভূপৃষ্ঠে ফাটল ধরবে আর তা অনেক মানুষকে গ্রাস করে নেবে। এটা হলো খাসফ।

তৃতীয় যে বিষয়টির কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তা হলো, কাযফ। কাযফ হলো আকাশ থেকে প্রস্তরবৃষ্টি–যেমনটি আবরাহা আর তার হস্তীবাহিনীর ওপর হয়েছিল। সাহাবি رضي الله عنهم-গণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কখন এগুলো সংঘটিত হবে? তিনি ﷺ জবাব দিলেন, যখন কায়নাত আর মা'আযিফ ছড়িয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إذا ظهرتِ

অর্থাৎ, যখন এগুলোর আবির্ভাব ঘটবে। যখন এগুলো দেখা দেবে। যাহারাত বলতে কিন্তু ব্যাপক প্রচলনের চেয়ে কম মাত্রা বোঝানো হয়।

৯৬ মানাওয়ি, *ফাইযুল কাদির* : ৩/২১১ (দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত)

www.banglakitab.weebly.com

কায়নাত আর মা'আযিফ কী? কায়নাত হলো বিনোদনকারী আর সংগীতশিল্পী যারা হারামের দিকে অনুপ্রাণিত করে, আর মা'আযিফ হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। আবু আমীর বা আবু মালিক থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে :

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

'আমার উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু লোক আসবে যারা যিনা, রেশম, মদ, গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।'[৯৭]

এখানে কাফিরদের কথা বলা হচ্ছে না। মুসলিমদের কথা বলা হচ্ছে। এই উম্মাহর মধ্যে কিছু মানুষ থাকবে যারা যিনা ও ব্যভিচারকে হালাল মনে করবে, হালাল মনে করবে মদ খাওয়া, বাদ্যযন্ত্র আর পুরুষদের রেশম পরাকে। হয় তারা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করবে যে এগুলো হালাল অথবা সরাসরি মুখে এগুলোকে হালাল বলবে। আর আজকের দিনে এমন অনেক উদাহরণ দেখা যাচ্ছে।

আবার অনেক হাদিসে রাতারাতি শাস্তি আসার বর্ণনা এসেছে। কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক বেদুইন তাদের কাছে কিছু জিনিস চাইবে। কী চাইবে, হাদিসে সেটা উল্লেখ করা হয়নি। হয়তো-বা সে কিছু কিনতে চাইবে বা অন্য কিছু। এই লোকগুলো গুনাহতে ডুবে থাকবে। ব্যবসায়িক লেনদেন বা অন্য যে জিনিস বেদুইন চাইবে, সেটার জবাবে তারা বলবে, তুমি আগামীকাল এসো, যা চাইছ পাবে। কিন্তু পরের দিন ঘুম থেকে উঠে এই লোকেরা দেখবে যে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছে। এই হাদিসে এটাই বোঝানো হচ্ছে, এ ধরনের লোকেদের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর আযাব কতটা দ্রুত আসতে পারে। এরা মুসলিম উম্মাহরই অংশ। আল্লাহ ﷻ এদের বানর ও শূকরে পরিণত করবেন আর কিয়ামত পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকবে।[৯৮] যখন তারা হারাম বিষয়গুলোকে হালাল মনে করতে শুরু করবে, যার মধ্যে আছে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও এগুলোকে হালাল মনে করা, তখন আল্লাহ ﷻ নাযিল করবেন আকস্মিক আর ত্বরিত শাস্তি। আজ তাকিয়ে দেখুন বিশ্বের সব জাতির মধ্যে মুসলিম উম্মাহই সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে? ছয় বা ষোলো মিলিয়ন ইহুদি যখন ১.৬ বিলিয়নের জাতিকে পদাবনত করে তখন সেটাকে ঐতিহাসিক মাত্রার পরাজয় বলতেই হয়।

দেখুন হাদিসে বলা হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও একে হালাল মনে করার কারণে কিছু মুসলিম বানর ও শূকরে পরিণত হবে। আবার আমাদের শত্রু ইহুদিদের ব্যাপারে কুরআনে বলা আছে :

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

৯৭ *সহিহুল বুখারি* : ৫২৬৮; বুলুগুল মারাম : ৫৪০
৯৮ *সহিহুল বুখারি*, কিতাবুল আশরিবাহ (তা'লিকান, হাদিস নং : ৫৫৯০।

www.banglakitab.weebly.com

'বলুন, আমি তোমাদের বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্য পথ থেকেও অনেক দূরে।' (সূরা মায়িদা, ৬০)

এই আয়াতে মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে বলা হচ্ছে না, আজ যারা আমাদের শত্রু, সেই ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে। ওপরে উল্লিখিত হাদিস দুটিতে এই উম্মাহ সম্পর্কে আর এই আয়াতে আমাদের শত্রুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দেয়ার ব্যাপারটি দুই দিকের লোকদের সাথেই ঘটবে। আর একদল বানর ও শূকরের যখন আরেকদল বানর আর শূকরের সাথে যুদ্ধ করে, তখন যারা বেশি শক্তিশালী তারাই তো জিতবে।

আজ মহামারির মতো এই গুনাহগুলো ছড়িয়ে গেছে, প্রচলিত হয়ে গেছে। এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এগুলো এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আপনি কাউকে গিয়ে বলতেও পারবেন না যে এগুলো হারাম। ওয়াল্লাহি! এখানে এমন কিছু ক্লাব আছে যেখানে কফি খেতে খেতে মানুষ গীবতসহ আরও নানা হারাম কাজে সময় কাটায়, আর এসবের মধ্যেই ইসলামি লেকচার দেয়ার জন্য বিভিন্ন বক্তাকে আমন্ত্রণ করে আনে। আমন্ত্রণ করার আগে তারা বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বক্তার মতামত জেনে নেয়। যদি সে একে হারাম বলে, তাহলে আর তাকে আমন্ত্রণ করা হয় না। ওয়াল্লাহি! এগুলো এখানে ঘটে আর আমরা অনেকেই এগুলো জানি। যখন গুনাহ আর ফাহিশা এভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহ ﷻ সবাইকে দায়ী করেন। যারা গুনাহর কাজে লিপ্ত হয় আর যারা এগুলো থেকে বিরত থাকে—সবাইকেই দোষী বিবেচনা করা হয়। আর এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আমাদের আজকের অপমানজনক অবস্থা আর লাঞ্ছনাময় পরাজয়ের পেছনে বড় ভূমিকা আছে এসব অবৈধ উৎসব-অনুষ্ঠান আর ফাহিশার।

দাওয়াহর সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে :

ভালো আমল করা, বিভিন্ন হালাকায় উপস্থিত হওয়া, দ্বীনের ব্যাপারে আন্তরিক ভাইদেরও অনেক সময় এ ধরনের ফাহিশাপূর্ণ অনুষ্ঠানে যেতে দেখা যায়। প্রায়ই এমনটা ঘটে। এটা দুঃখজনক ও খুবই বিরক্তিকর। কেন আপনি এমন পরিবেশে গেলেন? কোন অজুহাতে? তাদের অজুহাত হলো—দাওয়াহর জন্য। কেন আপনি এই পাপের মাঝে অবস্থান করলেন? উত্তর হলো—দাওয়াহ। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি ওখানে দাওয়াহ করেই ফিরে এসেছেন? উত্তর আসে, না। আপনি কি ওখানে গিয়ে তাদের গুনাহ থেকে বিরত করেছেন? না। এমনকি ওখানে হালাল-হারামের ব্যাপারে একটা কথাও বলেছেন? না। আসলে, আপনি মনে করছেন, যেহেতু আপনার দাড়ি আছে, যেহেতু বেশভূষায় আপনাকে দেখে দ্বীনদার মনে

www.banglakitab.weebly.com

হয় আর আপনি আপনার হিজাব পরা স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই আপনার উপস্থিতিই অন্যদের জন্য দাওয়াহ। এটা শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কিছু না।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

'বলুন, আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।' (সূরা আল-কাহফ, ১০৩-১০৪)

এমন অনেক লোক আছে যারা সৎকর্ম মনে করে আসলে মন্দ কাজ করছে। যেমন : এখানে তারা ভাবছে যে তারা দাওয়াহ করছে, কিন্তু যা তারা করছে সেটা আসলে খারাপ। কাজেই দাওয়াহ দেয়ার অজুহাতে এসব জায়গায় যাবেন না। আপনি যদি মনে করেন, এসব লোকের ওপর আপনার প্রভাব খাটবে, আপনার কথা শুনে তারা এসব গুনাহ থেকে বিরত হবে, কেবল তখনই যাবেন। আর তা না হলে এসব জায়গা থেকে দূরে থাকুন। তাদের থামাতে পারলে যাবেন, না হয় যাবেন না। সৎ কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গুনাহ করা ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে হতে হবে সমাজের সংখ্যালঘু, বিচ্ছিন্ন। তাদের অনুসরণীয় বা আদর্শ মনে করলে হবে না। আজকাল কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে করার জন্য অনেক ভাইকে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। দেখা যায় কনে নিজেই নানা আচার-প্রথা অনুযায়ী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চায়। কিছু আচার-প্রথা কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায় না, আমরা সেগুলোকে নিয়ে আপত্তি করছি না। কিন্তু কুরআন আর সুন্নাহ-বিরোধী যেসব আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ঐতিহ্য বা প্রথা আছে, কোনোভাবেই সেগুলোকে গ্রহণ করা যাবে না। এমন সবকিছু আমাদের পায়ের নিচে—সেটা যেই রীতি, ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিই হোক না কেন। সবকিছুর ওপর প্রাধান্য পাবে কুরআন ও সুন্নাহ। যে ভাইবোনরা আজ কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে বিয়ে করার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করছেন, তারা হলেন সংখ্যালঘু, সমাজচ্যুত, বিচ্ছিন্ন। যারা গুনাহ আর ফাহিশা করার পক্ষে তারা না। ব্যাপকভাবে প্রচলন বলতে আমি এ অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছি। তাই দাওয়াহর অজুহাতে এসবে শামিল হবেন না।

একই জিনিস খাটে সেসব বোনদের বেলায় যারা সঠিকভাবে হিজাব পালন না করলেও ইউনিভার্সিটিতে টেবিলে সবার সামনে বসে লিফলেট বিলি করছেন। যদি তার কাছে জানতে চান সে কী করছে? সে বলবে, দাওয়াহ দিচ্ছে।

দাওয়াহ? এভাবে?

এটা তো দাওয়ার সঠিক পন্থা না।

দাওয়াহর সঠিক পন্থা জানতে হবে। দাওয়াহ দিতে গিয়ে নিজে গুনাহয় লিপ্ত হওয়া যাবে না।

www.banglakitab.weebly.com

অবস্থান করা যাবে না প্রকাশ্য গুনাহ আর ফাহিশার পরিবেশে। ব্যতিক্রম হলো, যখন কেউ সুনিশ্চিতভাবে সেটা থামাতে সেখানে যাচ্ছে।

একই কথা প্রযোজ্য ওইসব লোকদের জন্য, যারা ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় স্লোগান আর প্ল্যাটফর্মের অধীনে কাজ করতে যায়। তারা দাবি করে এটা দাওয়াহ। আপনি কেন ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে এসেছেন? তাদের অজুহাত হলো, ভাই দাওয়াহর কারণে। এরা আহলে কিতাব, তাদের দাওয়াহ দেয়া আমাদের দায়িত্ব।

দাওয়াহ আর ইন্টারফেইথ এক না। দুটো আলাদা জিনিস। সবাই দাওয়াহর পক্ষে, কেউ এর বিরোধিতা করবে না। আর ইন্টারফেইথ হলো মৌলিকভাবে কুফর, এর যে মৌলিক ভিত্তি ও নীতি তা হলো নির্জলা কুফরের নীতি।[৯৯] যদি আপনি এটা না জানেন, তাহলে আপনার উচিত এ নিয়ে আরও পড়াশুনা করা। ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন ইত্যাদি শুধু কুফর না; বরং কুফরের ওপরে কুফর। আপনি এই কুফর ইন্টারফেইথের ব্যানারের অধীনে, ইন্টারফেইথের মঞ্চে গিয়ে বক্তব্য দেবেন, কিংবা এমন কোনো সংগঠনের অংশ হবেন, আর তারপর বলবেন–আমি তো দাওয়াহর জন্য সেখানে গিয়েছিলাম? এটা গ্রহণযোগ্য না। দাওয়াহ করতে হলে দাওয়াহর ব্যানার নিয়ে যান। দরকার হলে কোনো নিরপেক্ষ, নিউট্রাল ব্যানারের অধীনে যান। কিন্তু ইন্টারফেইথের ব্যানারে না।

এই সব বলার উদ্দেশ্য হলো, দাওয়াহর নামে যেন আপনি গুনাহগারদের সাথে মেলামেশা না করেন। মুসলিমদের প্রতি উপহাস করা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত উল্লেখ করেছিলাম :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

'আর কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে

৯৯ **ইন্টারফেইথ বা ইন্টারফেইথ ডায়ালগ** : আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপ। এ-জাতীয় কার্যকলাপকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের মুখস্থ বুলি প্রচলিত থাকলেও আদতে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, সম্প্রীতি ও সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হলো, 'সকল ধর্ম সমান', 'সকল ধর্ম সঠিক', 'সকল পথই একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়', 'সকল ধর্ম এক'–এমন একটি দর্শনের প্রচার। এটি নির্জলা কুফর ও শিরক এবং বর্তমানের ইন্টারফেইথ আন্দোলন মূলত ফ্রিম্যাসনিক 'এক ধর্ম, এক বিশ্ব' এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, ইসলাম ছাড়া আর কোনো সঠিক ধর্ম নেই। ঈমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক, মুসলিম ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না। আলিমদের মতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপের এ আহ্বান হলো মূলত রিদ্দার আহ্বান। এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন - https://islamqa.info/en/10213 এবং লাজনাহ আদ দাইমাহর ফাতওয়া নম্বর ১৭,৩০০

www.banglakitab.weebly.com

যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফেরদের একই জায়গায় সমবেত করবেন।' (সূরা আন-নিসা, ১৪০)

তারা যখন ঠাট্টা-তামাশা, উপহাস করে তখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে না, কেন? আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

তাদের মাঝে থাকলে আপনিও তাদের তাদের মতো হয়ে যাবেন।

এ কথা শুধু উপহাস না, বরং অন্য সব গুনাহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দাওয়াহর প্রমাণপঞ্জি :

মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করুন ইলমের সাথে

আল্লাহ ﷻ বলেন :

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

'বলে দিন, এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে-সুঝে দাওয়াহ দিই। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (সূরা ইউসুফ, ১০৮)

আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলছেন, 'বলুন, এই আমার পথ, আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াহ দিই।' এই দাওয়াহর জন্যই আমাদের পাঠানো হয়েছে। আমরা দাওয়াহর পক্ষে, আমরা দাওয়াহকে সমর্থন করি, আমরা দাওয়াহর বিরোধী না–কিন্তু দাওয়াহর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে, যেগুলো অনুসরণ করতে হবে।

أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

আমি আল্লাহ ﷻ-এর দিকে বুঝে-শুনে দাওয়াহ দিই।

আজ আপনারা সবাই এই দারসে অংশগ্রহণ করছেন, কেন? কারণ, আপনারা ইলমের মাধ্যমে এই শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান।

أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى

অর্থাৎ, আমি এবং আমার অনুসারীরা বুঝে-সুঝে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর একত্বের দিকে আহ্বান করি।

www.banglakitab.weebly.com

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেছেন, নবি মুহাম্মাদ ﷺ যার প্রতি আহ্বান করেছেন, ইলমের সাথে ওই একই জিনিসের প্রতি আহ্বান করা ব্যতীত—আপনি তাঁর প্রকৃত অনুসারী হতে পারবেন না। এটা কুরআনের নিষেধাজ্ঞা।

أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

আমি আল্লাহর দিকে বুঝে-শুনে দাওয়াহ দিই।

যেখানেই থাকুন না কেন, একজন দা'ঈ হিসেবে আপনি মানুষের সামনে এই শিক্ষা ও দাওয়াহ উপস্থাপন করবেন। আপনার কাজ বীজ বপন করা, বাকিটা আল্লাহ ﷻ-এর ওপর ছেড়ে দিন।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'যে আল্লাহর দিকে দাওয়াহ দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?' (সূরা ফুসসিলাত, ৩৩)

দাওয়াহ আমাদের গর্ব :

বড় কোনো ফার্ম বা কর্পোরেশন কাউকে চাকরির প্রস্তাব দিলে আগ্রহভরে সে তা লুফে নেয়। সে প্রশিক্ষণ নেয়, যথাসম্ভব পড়াশোনা করে, চেষ্টা করে নিজের ফিল্ডে আরও দক্ষতা অর্জনের। এই উচ্চপদের চাকরির জন্য যা যা দরকার, তার সবই সে করে। ঠিক তেমনি, দাওয়াহও আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া একটি অফার। কোনো প্রেসিডেন্ট কিংবা কর্পোরেশনের জব না, এটা আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া চাকরি। এটা হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে অফার এবং এর মাধ্যমে আপনি রাসূলদের চাকরি করবেন :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.....

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।' (সূরা আলি ইমরান, ১১০)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ

তোমরাই সর্বোত্তম। তোমরাই সর্বোত্তম ছিলে, আছো এবং ভবিষ্যতেও তোমরাই হবে মানবজাতির মধ্যে উত্থিত সর্বোত্তম জাতি—এটাই 'কুনতুম' (كُنتُمْ) এর অর্থ। আমরা হলাম সর্বোত্তম উম্মাহ, আমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। আমাদের দেয়া হয়েছে মানবজাতির নেতৃত্ব। কেন? আমরা আরব এই জন্য? কালো, এই জন্য? আমাদের

www.banglakitab.weebly.com

মধ্যে তো সাদা-কালো, আরব-অনারব, উপমহাদেশীয় সবাই আছে। তাহলে কেন আমরা অন্যান্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি কি জাতিগত কোনো কিছু? জাতীয়তাবাদ কিংবা বর্ণের ওপর ভিত্তি করে কি আল্লাহ ﷻ আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ্ আখ্যা দিয়েছেন? না, আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বলা হয়েছে তাওহিদের দাওয়াহ বহন করা এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালনের কারণে।

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ

তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ্ হবার কারণ এটাই। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ কারণ আমরা মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করি। আমরা দাওয়াহর উম্মাহ্, আমরা মানুষের মাঝে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দিই; আর এ জন্যই আল্লাহ ﷻ আমাদের অন্যান্য জাতির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন, এই দাওয়াহ বহন ও পৌঁছে দেয়ার কারণে সম্মানিত করেছেন। তাওহিদের দাওয়াহ আমাদের সম্মানের উৎস। জাতীয়তাবাদ বা বর্ণ-পরিচয়ের কারণে আমরা সম্মানিত না।

قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّـهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

'বলুন, আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-জিন, ২২-২৩)

আল্লাহ ﷻ নবি ﷺ-কে বলছেন, বলুন, আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই, তবে তাঁর আযাব থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এ কথা নবি ﷺ-কে বলতে বলা হচ্ছে তাঁর নিজের ব্যাপারে, কিন্তু এটা আমাদের সবার ওপর প্রযোজ্য। এমন কে আছে যে আমাদের রক্ষা করবে আল্লাহ ﷻ-এর আযাব থেকে?

إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّـهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا

আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। (সূরা আল-জিন, ২২)

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِسَالَاتِهِ

কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। (সূরা আল-জিন, ২৩)

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ-এর এই আযাব থেকে রক্ষা করার কেউই নেই। এ কথা বিশ্বাস করা আবশ্যক এবং এমন কোনো মুমিন নেই, যে এ কথা অস্বীকার করে। আল্লাহ ﷻ আযাব দিতে চাইলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তবে কিছুসংখ্যক আলিম বলেছেন, এ আয়াত প্রমাণ করে যে, তাওহিদের বাণী প্রচার করা, অর্থাৎ দাওয়াহ, আল্লাহ ﷻ-এর আযাব থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ ﷻ-এর আযাব থেকে রক্ষা পাবার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে দাওয়াহ। দাওয়াহর কারণেই আমরা সম্মানিত, দাওয়াহ আমাদের গর্ব।

উঠুন, সতর্ক করুন :

নুবুওয়্যাতের প্রথমদিকে আল্লাহ ﷻ মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেন :

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ

'হে বস্ত্রাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন।' (সূরা আল-মুদ্দাসসির, ১-২)

এখানে 'উঠুন, সতর্ক করুন' এর অর্থ দাওয়াহ, অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ। ওয়াল্লাহি, যখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠলেন এবং সেই থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন না। যদি আপনি একটি আয়াত জানেন কিংবা একটি হাদিস জানেন, যদি শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মূল তত্ত্ব জানা থাকে, আপনি এগুলোর দাওয়াহ দিন। দৃঢ়ভাবে যতটুকুই জানেন, সেটার দাওয়াহ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।[১০০]

যদি একটি আয়াত জানা থাকে, সেটাই প্রচার করুন। যদি আপনার কোনো আয়াত কিংবা হাদিস জানা নাও থাকে, যদি শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ইলম জানা থাকে (এটা আপনাদের সবারই জানা।), তাহলে বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর দাওয়াহ দিন। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই দাওয়াহ দিন। আপনি যদি কিছুই না জানেন, তবে লিফলেট, ব্রোশোর কিংবা সিডি বিতরণ করুন, লিংক দিয়ে দিন। কিছুদিন আগে কিছু কিশোর-তরুণ আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। আমি তাঁদের বললাম, যখন আমি তাদের বয়েসী ছিলাম তখন ফেইসবুক টুইটার এসব থাকলে, ওয়েবসাইট বানানো এখনকার মতো এত সহজ হলে, দাওয়াহর জন্য এতদিনে আমার এক হাজার সাইট থাকত। *মুসনাদু আহমাদ* ও *সুনানুত তিরমিযি*তে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে নবি মুহাম্মাদ ﷺ

---

১০০ *সহিহুল বুখারি:* ৩৪৬১

www.banglakitab.weebly.com

আপনার চেহারা উজ্জ্বল হবার জন্য দুয়া করেছেন। নবি ﷺ এ দুআ বিশেষভাবে তাদের জন্য করেছেন, যারা কোনো হাদিস শোনার পর অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ সে ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনে একে ধারণ করে (অর্থাৎ এর মর্ম বোঝে এবং এর ইলম রাখে)।'[১০১] এর অর্থ হলো, প্রথমে এ শিক্ষাকে সে ধারণ করে, আত্মস্থ ও উপলব্ধি করে–তারপর একে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। *সহিহ মুসলিমসহ* অন্যান্য হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরাইরা ও ইবনু মাসউদ رضي الله عنهما একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে হিদায়াতের দিকে দাওয়াহ দেয়, সে তার অনুসরণকারীদের সমান সাওয়াব পাবে, অথচ অনুসরণকারীদের সাওয়াব বিন্দুমাত্রও কমবে না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে গোমরাহির দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসরণকারীদের মতোই গুনাহগার হবে, অথচ তাদের গুনাহ বিন্দুমাত্রও কমবে না।[১০২] তাই, আমি যদি এক শ জনকে গোমরাহ করি–লা সামাহাল্লাহ, লা কাদারাল্লাহ–তবে তাদের সবার পাপ আমার ওপর এসে বর্তাবে।

একজন মানুষকে হিদায়াতের ওপর আনার মূল্য :

সহিহ বুখারি ও *মুসলিমে* বর্ণিত হয়েছে, খাইবারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের পতাকা দিয়েছিলেন আলী رضي الله عنه-কে। আলী رضي الله عنه-এর চোখে অসুখ হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর চোখে ফুঁ দেয়ার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে যুদ্ধের পতাকা এবং কিছু উপদেশ দেন। দেখুন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আলী رضي الله عنه-কে কী উপদেশ দিয়েছেন–তাদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছার পর ধৈর্যধারণ করবে। তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করবে এবং ইসলামি বিধানে ওদের ওপর যেসব দায়িত্ব বর্তায় সেগুলো সম্পর্কে জানিয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহর কসম! আল্লাহ ﷻ যদি তোমার মাধ্যমে মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন, তাহলে তোমার জন্য তা লাল উটের মালিক হবার চেয়েও অনেক উত্তম।[১০৩]

কাউকে ইসলামের দিকে ফেরানো, সালাত শুরু করানো (এবং এর অর্থ পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করা), মদ কিংবা কবীরা গুনাহ ছাড়ানো–এ সবগুলো হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। লাল রঙের উট ছিল আরবদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। লাল উটের মালিক হওয়া হলো আমাদের সময়ে গ্যারেজভর্তি সবচেয়ে দামি স্পোর্টসকারের মালিক হবার মতো। যারা আল্লাহর রাসূলের ক্ষতি করেছিল এখন তিনি তাদের দোরগোড়ায়। বিজয়ের আর অল্প কিছু সময় বাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা তুলে দিলেন আলী رضي الله عنه-এর হাতে। তিনি ﷺ জানেন, আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছায় শত্রু পরাজিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে এই শত্রু তাঁর ক্ষতি করে আসছে।

১০১ *মুসনাদু আহমাদ*: ৪০১২, *সুনানুত তিরমিযি*: ২৬০০, *ইবনু মাজাহ*: ২৩২
১০২ *সহিহ মুসলিম*: ৬৯৮০
১০৩ *সহিহুল বুখারি* : ৩৭০১; *সহিহ মুসলিম* : ৬৩৭৬

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে। রক্তের বন্যা চাইলে তিনি আলী ﷺ-কে এই কথাগুলো বলতেন না। রক্তপাতের জন্য যদি তিনি উদ্‌গ্রীব হতেন, তাহলে এই উপদেশ দিতেন না। আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছায় রাসূল ﷺ বিজয় আসন্ন, সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে—এমন অবস্থায়ও প্রাধান্য পেয়েছিল তাঁর উদ্বেগ। তিনি ﷺ বলেছিলেন—আলী শান্ত হও, আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন, তাহলে তোমার জন্য তা লাল রঙের উটের মালিক হবার চেয়েও অনেক উত্তম।

উহুদ ও তাইফের দিবস :

বুখারি ও *মুসলিমের* বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূল ﷺ-কে আ'ইশা ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, উহুদের চেয়েও কঠিন কোনো বিপদের সম্মুখীন কি আপনি হয়েছিলেন?[১০৪] উহুদের ঘটনা আ'ইশা ﷺ-এর মনে ছিল। তিনি দেখেছিলেন সেইদিন কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যেতে হয়েছিল। তাই তিনি জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর নবি, উহুদের চেয়েও কঠিন কোনো বিপদের সম্মুখীন কি আপনি হয়েছেন? এর চেয়ে খারাপ আর কোনো সময় কি আপনার জীবনে এসেছে?' নবি ﷺ উত্তর দিলেন, 'তোমার গোত্রের লোকেরা আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছে। আ'ইশা ﷺ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোত্র একই গোত্র, কুরাইশ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে বললেন, তোমার গোত্রের লোকেরা আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছে। আর আকাবাহ্‌র দিনটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। আকাবাহ্‌র দিবস বলা হয় তাইফের দিনকে। সেই দিন রাসূল ﷺ ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে তাইফে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাইফের লোকেরা তাকে প্রত্যাখ্যান করে, আর তাঁর বিরুদ্ধে তাইফের শিশুদের লেলিয়ে দেয়।

আ'ইশা ﷺ নির্দিষ্টভাবে উহুদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কারণ ওই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কী হয়েছিল, তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। তাই আ'ইশা ﷺ ভেবেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দীর্ঘ তেইশ বছরের দাওয়াহ-জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন হলো উহুদের দিন। তাই তিনি নির্দিষ্ট করে উহুদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। কী হয়েছিল উহুদের দিন? আ'ইশা ﷺ কী দেখেছেন সেদিন?

তিনি দেখেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মাথায় আঘাতের ছাপ। তিনি দেখেছেন, অস্ত্রের আঘাতে ভেঙে যাওয়া পবিত্র দাঁত, দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া শিরস্ত্রাণ। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জখমে ফাতিমা ﷺ-কে মাদুর পুড়ানো ছাই লাগাতে দেখেছেন।[১০৫] এতকিছু সত্ত্বেও কেন উহুদ রাসূল ﷺ-এর দাওয়াহ-জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন না? এই যুদ্ধে তিনি সত্তরজন প্রিয় সাহাবিকে হারিয়েছিলেন যাদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। উহুদের দিন শহিদ হয়েছিলেন

---

১০৪ *সহিহুল বুখারি* : ৩২৩১; *সহিহ মুসলিম* : ৪৭৫৪

১০৫ জখমের রক্তপ্রবাহ থামানোর জন্য সে সময়ে প্রচলিত একপ্রকার চিকিৎসা।

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর চাচা হামযা ﷺ। চাচার লাশ দেখে ছোট শিশুর মতো কেঁদেছিলেন আমার নবিজি ﷺ। তবুও কেন উহুদ তাঁর জীবনের কঠিনতম সময় না?

স্ত্রী আ'ইশা ﷺ-এর ব্যাপারে মুনাফিকদের মিথ্যা গুজব রটানোর তীব্র মর্মবেদনাময় দিনগুলো কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জীবনের কঠিনতম সময় হলো না? একজন পুরুষের জন্য এ ধরনের ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর এবং কষ্টের। আজ হয়তো অনেকে এর ওজন বুঝতে পারে না, কারণ তারা আসলে প্রকৃত পুরুষ না। একজন সত্যিকারের পুরুষ কখনো তার স্ত্রী অথবা পরিবারের নারীদের অমর্যাদা সহ্য করতে পারে না। মুনাফিকের দল রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীকে নিয়ে মিথ্যা রটাচ্ছিল, ভুলবশত কয়েকজন সাহাবিও এতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পার করেছেন দুঃসহ সময়। তবুও কেন এই দিনগুলো তাঁর জীবনের কঠিনতম সময় না? মক্কার মুশরিকরা একদিন তাঁর পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল। তারপর হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল একে অপরের গায়ে। সেই দিনটি কেন তাঁর ﷺ কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হলো না? একদিন তারা জামা ধরে ওরা এমনভাবে শ্বাসরুদ্ধ করেছিল যে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, হাঁটু ভেঙে পড়ে গিয়েছিলেন কাবার কাছে; সেই দিনটি কেন তাঁর ﷺ জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন হলো না? যে কয়েক বছর কুরাইশরা তাঁকে অপদস্থ করেছিল, সেদিনগুলো কেন তাঁর জীবনের কঠিনতম সময় না? কেন তাইফের দিন? তাইফের দিনের বিশেষত্ব কী?

তাইফের ঘটনা পড়লে আপনি দেখবেন, এই দিন রাসূল ﷺ-কে দৈহিক নির্যাতন করা হলেও আমার এতক্ষণ যে ঘটনাগুলোর কথা বললাম, সেগুলোর তুলনায় শারীরিক নির্যাতনের দিক দিয়ে এটি ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম কষ্টের। তাঁর ওপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মিথ্যে গুজব রটনা করা হয়েছিল এবং আরও অনেক ঘটনা তাঁর সাথে ঘটেছিল। তাইফের দিন ঘটা দৈহিক নির্যাতনের চেয়ে এ সবকিছুই ছিল অনেক বেশি কষ্টের। আপাতভাবে তাইফের ঘটনা এগুলোর চেয়ে কম কষ্টদায়ক। উহুদ আর তাইফের ঘটনার কি তুলনা হয়? উহুদে অনেক সাহাবি শহিদ হয়েছিলেন, নির্মভাবে শহিদ করা হয়েছিল তাঁর চাচাকেও। তিনি নিজে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তবু রাসূল ﷺ কেন তাইফের দিনকেই বেছে নিলেন? কেন আ'ইশা ﷺ-কে বললেন, এই দিন তাঁর জীবনের কঠিনতম দিন?

আ'ইশা ﷺ হয়তো বুঝিয়ে থাকবেন–হে আল্লাহর রাসূল, যে দিনটিতে আপনি সবচেয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন সেই দিনটিই কি আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন? হয়তো তিনি নির্যাতনের দিক থেকে সবচেয়ে কঠিন দিনের কথা জানতে চেয়েছিলেন। আর তাই উহুদের কথা বলেছিলেন। আবার দেখুন, উহুদের দিন শহিদ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্তরজন সাহাবি, শহিদ করা হলো তাঁর চাচাকে । চাচার লাশ দেখে তিনি অঝোরে কেঁদেছেন—শারীরিক ব্যাপারটা থাক, মানসিক আঘাত হিসেবে ধরলেও এ ছিল শোকের

www.banglakitab.weebly.com

প্রচণ্ডতায় বিধ্বস্ত হবার মতো এক দিন। এ জন্যই হয়তো আ'ইশা ﷺ উহুদের কথা বলেছিলেন।

যখন আপনি সীরাহ্ পড়বেন এবং পাশাপাশি সীরাহ্র অন্তর্নিহিত শিক্ষা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন–তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উত্তরের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন। অনেক আশা নিয়ে তিনি তাইফ গিয়েছিলেন। তাইফের পাহাড়ে ওঠার সময় তার আশা ছিল তাইফবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে আর তাইফ হবে ইসলামি খিলাফতের প্রথম শহর। আ'ইশা ﷺ-কে দেয়া উত্তরের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বোঝাচ্ছেন–আমার মাথার জখম, আমার দাঁতে পাওয়া আঘাত, এগুলোর কষ্ট বড় না। আমার সাহাবিদের মৃত্যুও না, কারণ ইন শা আল্লাহ্ জান্নাতে আমাদের দেখা হবে। সবচেয়ে তীব্র কষ্ট হলো আল্লাহ ﷻ-এর একত্ববাদের দাওয়াহ প্রত্যাখ্যাত হতে দেখা। নবিজি তাইফে গিয়েছিলেন আশায় বুক বেঁধে, কিন্তু তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তীব্র কষ্ট নিয়ে। এটা ছিল তার দাওয়াতি জীবনের সবচেয়ে কষ্টের দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বোঝাচ্ছেন, বাকি সবকিছু আমি সহ্য করতে পারব–সে আমার ওপর আসা আঘাত, জখম, বা যা কিছু হোক–কিন্তু তাওহিদের দাওয়াহ প্রত্যাখ্যাত হতে দেখার কষ্ট বিধ্বস্ত করে দেয়ার মতো। আর তাই তিনি বলেছিলেন, এ দিনটি ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে কঠিন দিন।

সত্যের দাওয়াহ দিতে গিয়ে যখন তিনি প্রত্যাখ্যাত হতেন, কষ্ট পেতেন, তখন তাঁকে শান্ত করার জন্য আল্লাহ ﷻ নাযিল করতেন কুরআনের আয়াত। আল্লাহ ﷻ তাঁর নবির অন্তর দেখতেন, তিনি দেখতেন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য তাঁর নবির অন্তরে কষ্ট, তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত। কারণ, দাওয়াহ-ই ছিল তাঁর জীবন। দাওয়াহ ছিল তাঁর হৃদয়, তাঁর আত্মা। দাওয়াহ প্রবাহিত হতো তাঁর শিরা-উপশিরায়। আর প্রত্যেক মুসলিম ও দা'ঈরও এমনটাই হওয়া উচিত। দাওয়াহকে আপনার নিজ রক্ত-মাংসের মতো মনে করতে হবে। একজন হকপন্থী দা'ঈ যখন দাওয়াহ করা থেকে বঞ্চিত হন, তখন মাটির ওপরে থাকার চেয়ে মাটির নিচে থাকাটাই তাঁর কাছে উত্তম মনে হয়। একজন সত্যিকার দা'ঈ, প্রত্যেক সত্যিকারের মুসলিমের অনুভূতি এমনই হয়। আজ আমরা বলি দা'ঈদের এমন হয়, কিন্তু এটা তো প্রত্যেক সত্যিকারের মুসলিমের অবস্থা, কারণ দাওয়াহ প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের অংশ।

বড় আশা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাইফে গিয়েছিলেন। অন্যান্য দুর্যোগের দিনগুলোর শারীরিক আঘাতের চেয়ে ওই দিনের শারীরিক আঘাত কম হওয়া সত্ত্বেও তাইফের দিনটিই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন। কারণ, তায়িফবাসী তাঁর দাওয়াহ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ ﷻ তাঁর নবি ﷺ-কে শান্ত হতে বলেছেন। আল্লাহ ﷻ তাঁকে বললেন :

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ......

www.banglakitab.weebly.com

'সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না।' (সূরা আল-ফাতির, ৮)

আরেক আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁকে এই বলে শান্ত হতে বললেন যে :

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

'যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।' (সূরা কাহফ, ৬)

আল্লাহ যেন তাঁকে বলছেন–হে নবি, তাদের পেছনে ছুটে চলতে চলতে আপনি নিজে মর্মবেদনায় ভুগছেন, শান্ত হোন।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

'আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।' (সূরা আন-নাহল, ১২৭)

আল্লাহ ﷻ তাঁর নবিকে সবর করতে বলছেন। কিন্তু কেন? তারা তাঁকে আঘাত করেছে, তাই? তাঁর ক্ষতি করেছে, এই জন্য? না। আল্লাহ ﷻ তাঁকে বলছেন :

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ.....

তাদের (মূর্তিপূজারি, মুশরিক) জন্য দুঃখ করবেন না।

তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যথিত হয়েছেন। আর আল্লাহ ﷻ তাঁকে শান্ত হতে বলছেন। একজন প্রকৃত ঈমানদারের কাছে দ্বীনের শিক্ষা ও এর দাওয়াহ নিজের জীবনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ; গুরুত্বপূর্ণ নিজ পরিবার, সম্পদ, সম্মানের চেয়েও। দাওয়াহ এবং তাওহিদের বার্তা প্রচার করা সব সময় মুমিনের কাছে অগ্রাধিকার পায়।

শ্রোতার জ্ঞান ও অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াহ :

যাদের দাওয়াহ দিচ্ছেন তাদের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা আপনার জন্য খুব জরুরি। *বুখারি* ও *মুসলিমে* বর্ণিত হয়েছে যে, মুয়ায رضي الله عنه-কে ইয়েমেনে আমির হিসেবে পাঠানোর সময় তাঁকে বিদায় জানাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার বাইরে এসেছিলেন। এ সময় তিনি ﷺ মুয়ায رضي الله عنه-কে নাসীহাহ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তুমি আহলুল কিতাবদের কাছে যাচ্ছ। রাসূল ﷺ এ কথাটি কেন বললেন? কারণ, মদীনার উপকণ্ঠে অল্প কিছু ইহুদি থাকলেও মুয়ায رضي الله عنه অধিকাংশ সময় মূর্তি-পূজারিদের দেখেছেন। আর মূর্তি-পূজারিদের সাথে

www.banglakitab.weebly.com

আহলুল কিতাবদের চিন্তা ও অবস্থার পার্থক্য আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই মুয়ায -কে বোঝাতে চাইলেন যে, তুমি সব সময় যে মুশরিক মূর্তি-পূজারিদের দেখে এসেছ তাদের দাওয়াহ করা আর আহলুল কিতাবদের দাওয়াহ করার মাঝে পার্থক্য আছে।

একইভাবে আপনারও বুঝতে হবে, কারা আপনার শ্রোতা। বুঝতে হবে আপনি কাদের উদ্দেশে কথা বলছেন, কাদের দাওয়াহ দিচ্ছেন। আমাকে যখন বক্তব্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় তখন আমার জন্য জানা জরুরি যে, আমি কি যুবকের উদ্দেশে কথা বলব নাকি তাদের চাচার বয়েসীদের উদ্দেশে। আপনি কি সাধারণের সামনে কথা বলছেন নাকি শিক্ষিত লোকদের সামনে—দাওয়াহর স্বার্থেই এসব আপনাকে জানতে হবে। কারণ, আপনাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে আপনার কথাগুলো শ্রোতাদের উপযোগী করার।

আমি প্রথমবারের মতো *উসুল আস-সালাসাহ* মুখস্থ করা শুরু করি মদীনাতে। তখন আমি ক্লাস টুয়ের ছাত্র। আমি পড়তাম 'মাদরাসাতু উবাই ইবনু কাব লি তাহফিযিল কুরআনিল কারিম' নামে একটি মাদরাসায়। অন্যান্য সরকারি স্কুলের মতো হলেও এখানে আলাদাভাবে জোর দেয়া হতো কুরআনের ওপর। মদীনাতে এটা ছিল এ ধরনের প্রথম স্কুল। এই স্কুলের কারিকুলাম এমন ছিল যে, অল্প বয়সেই উসুল আস-সালাসাহর কিছু অংশ কিংবা পুরোটা মুখস্থ করতে হতো। এখন পশ্চিমারা কারিকুলাম পরিবর্তনের জন্য সৌদির ওপর চাপ দিচ্ছে, এসবের মাঝে স্কুলের কারিকুলাম আজও আগের মতো আছে কি না জানি না। যা হোক, সেই দিনগুলোতে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় আমাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যেতেন বাবা। গাড়িতে বাবাকে *উসুল আস-সালাসাহ* মুখস্থ পড়ে শোনাতাম। আমি বাবাকে শোনাতাম আর তিনি বলতেন, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যা শিখছেন আমারটা হুবহু তা-ই। এখনো আমার এটা মনে আছে। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, বাবা যা শিখছেন, আমিও তাই শিখছি! আমি ক্লাস টুতে পড়ি আর বাবা পড়েন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে, অথচ আমরা দুজন একই জিনিস পড়ছি!

বাবা বলতেন, একই বই হলেও তাঁরা পড়তেন আমাদের চেয়ে আরও গভীর ও বিস্তারিতভাবে। আসলে ক্লাস টুতে 'মার রাব্বুকা ওয়ামা দিনুকা' এবং রাসূল ﷺ ও এ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় সহজভাবে অল্প অল্প করে আমাদের শেখানো হয়েছিল। *উসুল আস-সালাসাহ* আমরা বাচ্চাদের পড়াই, আবার দা'ঈদেরও পড়াই। আমরা এর চেয়ে ছোট এবং বড়দেরও পড়াই। প্রত্যেককে তাঁর জ্ঞান ও বুঝের অবস্থা অনুযায়ী পড়ানো হয়। যাতে তারা তাদের মতো করে বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারে। আমার দারসে কেউ কেউ নোট করে, কেউ কেউ আমার অধিকাংশ কথা মুখস্থ করে, এরা আগামী দিনের দা'ঈ ইন শা আল্লাহ। আমি দারসে যেভাবে পড়াই, সর্বসাধারণের সামনে লেকচারে নিশ্চয় সেভাবে বলব না।

*সহিহ বুখারি*তে আলী -এর একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। আলী বলেছেন,

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ

www.banglakitab.weebly.com

মানুষের সাথে কথা বলো তার অবস্থা অনুযায়ী। তুমি কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হোক?[১০৬]

আলী ﷺ শ্রোতার বুঝ অনুযায়ী কথা বলতে বলছেন। এমনও হতে পারে যে, কোনো বিষয় মানুষের সামনে তাদের বুঝ অনুযায়ী যথাযথভাবে উপস্থাপন না করার কারণে তারা বিষয়টি অস্বীকার করে বসবে বা কাফির হয়ে যাবে। আমরা কেউই চাই না যে এমন হোক। *সহিহ মুসলিমে* ইবনু মাসউদ ﷺ-এর একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً

তুমি কথা বলার সময় লোকেদের বোধগম্য করে বলবে, না হয় এটা তাদের অনেকের জন্য ফিতনাহ হয়ে দাঁড়াবে।[১০৭]

বোধগম্য না হবার কারণে হক ইলমের দাওয়াহও অনেক সময় ফিতনাহ হয়ে দেখা দিতে পারে। দেখুন ইবনু আব্বাস ﷺ কেমন করে শ্রোতার উপযোগী করে কথা বলেছেন। এক লোক ইবনু আব্বাস ﷺ-এর কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'হত্যাকারীর জন্য কি কোনো তাওবাহ আছে?' ইবনু আব্বাস ﷺ জবাব দিলেন, 'অবশ্যই তাওবাহর দরজা খোলা আছে।' কিছুক্ষণ পর আরেকজন লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'হত্যাকারীর জন্য কি তাওবাহ আছে?' এবার তিনি বললেন, 'না, নেই।' প্রশ্নকারীরা ছিল পথচারী, তারা ফাতওয়া নিয়ে নিজ গন্তব্যে চলে যেত। ইবনু আব্বাস ﷺ-এর ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'ইবনু আব্বাস, আপনি দুজনকে দুভাবে উত্তর দিলেন? প্রথমজন জানতে চাইলো, হত্যাকারীর জন্য তাওবাহ আছে কি না। আপনি বললেন, আছে। আবার একই প্রশ্নের জবাবে দ্বিতীয়জনকে বললেন, নেই। কেন?'

ইবনু আব্বাস ﷺ বললেন, 'প্রথম ব্যক্তির চোখে আমি তাওবাহর অশ্রু দেখেছি। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, সে মর্মবেদনায় ভুগছে। তার চোখে পানি।' প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন প্রশ্নকর্তা কেমন ধরনের লোক। তারপর প্রশ্নকর্তার অবস্থা অনুযায়ী হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি বললেন, 'আমি তার চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ লক্ষ করলাম, যেন সে কাউকে হত্যা করতে যাবে।' এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি থেকে আলাদা। তাই তিনি না-বোধক উত্তর দিলেন যাতে করে সে কাউকে হত্যা না করে।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলামি শারীয়াহয় কাউকে হত্যা করা হারাম, এ ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ নেই। কিন্তু এই হারাম হবার ব্যাপারটা কীভাবে বোঝানো হবে, কীভাবে প্রচার করা হবে, সেটা একটা ভিন্ন প্রশ্ন। যা হোক, ইবনু আব্বাস ﷺ এখানে মিথ্যা বলেননি।

---

১০৬ *সহিহুল বুখারি* : ১২৭

১০৭ *সহিহ মুসলিম* : ১৪

www.banglakitab.weebly.com

এ ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। তিনি ফাতওয়ার দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতারণা করেননি। *তাফসির আস-সাআলিবি*তে ইমাম আস-সাআলিবি বলেন,

وروى عن بعض العلماء انهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف احيانا فيطلقون أن لا تقبل توبته منهم ابن شهاب وابن عباس

> কিছু আলিম দুইটি মতের কঠিন মতটি ব্যবহার করতেন যাতে লোকেদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা পাপ থেকে বিরত থাকে। ইবনু শিহাব ﷺ ও ইবনু আব্বাস ﷺ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।[১০৮]

কাজেই ইবনু আব্বাস ﷺ মিথ্যে বলেননি। একজন মানুষকে হত্যা থেকে বিরত রাখতে তিনি কঠিন মতটি বলেছেন। এই মতটিও কিন্তু প্রমাণিত এবং বিভিন্ন কিতাবে আছে। প্রশ্ন হলো, এ ব্যাপারে এটাই কি শক্তিশালী মত? না, অবশ্যই এটি শক্তিশালী মত না। কিন্তু শক্তিশালী মত না হওয়া সত্ত্বেও ইবনু আব্বাস ﷺ এই মতটি ব্যবহার করেছেন ওই ব্যক্তিকে হত্যা থেকে বিরত রাখতে।

কিতাব মুখস্থ করা সহজ, কিন্তু এই ইলম দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মতো আলিম আজ বিরল। আদাবুল ইফতা বিষয়ে পড়লে দেখবেন, একজন মুফতি প্রয়োজনে দুটো মতের মধ্যে কঠিন মতকে বেছে নিতে পারেন, যদি প্রশ্নকারীর অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তিনি মনে করেন এতে কল্যাণ আছে। তবে এটা কোনো ছেলেখেলা না। অনেকে বলে আলিমরা ফাতওয়া নিয়ে খেলে, এ কথাটা ভুল। নিজের পছন্দমতো ফাতওয়া দেয়া যায় না। ইবনু আব্বাস ﷺ বানিয়ে বানিয়ে ফাতওয়া দেননি। চোখের সামনে ঘটা কোনো কিছুর ওপর ভিত্তি করেও আপনি পছন্দমতো ফাতওয়া বানাতে পারবেন না। আপনি বড়জোর, ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মতো যদি কাউকে হত্যা থেকে বিরত রাখতে, দুটো মত থেকে কঠিন মতটিকে গ্রহণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আপনি নিজের খেয়ালখুশি মতো বানিয়ে বানিয়ে ফাতওয়া দিচ্ছেন না। আপনি কঠিন মতটা গ্রহণ করছেন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে, কাউকে কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য।

এসব কথার মূল পয়েন্ট হলো, কাদের সাথে কথা বলছেন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। তাঁদের চিন্তা ও বুঝের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। দাওয়াহ ও ইলম উপস্থাপন করতে হবে বোধগম্যভাবে। কখনো হয়তো আপনাকে নারীদের উদ্দেশে কথা বলতে হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে কিছু কিছু ব্যাপারে পুরুষ আর নারীদের বোঝানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনাকে কথা বলতে হবে কখনো যুবকদের আর কখনো বৃদ্ধদের সামনে। আপনি কোথায়, কাদের সাথে কথা বলছেন, এটা কথা বলার আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে। শ্রোতারা কোন ধরনের লোক? তারা যুবক নাকি বৃদ্ধ? তারা কি ফাসিক

---

১০৮ *তাফসিরুস সাআলিবি*: ১/৪০১

www.banglakitab.weebly.com

নাকি দ্বীনদার? এ সবকিছুই বিবেচনা করতে হবে। কখনো আপনার শ্রোতারা হবে উদ্ধত, কখনো বিনয়ী। কখনো আপনি কথা বলবেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটদের সাথে, আবার কখনো কারখানার কর্মী বা খেটে খাওয়া মানুষের সাথে। কখনো আপনার শ্রোতা হবে নেতা গোছের কেউ, আবার অন্য সময় আপনি কথা বলবেন সাধারণ মানুষের মাঝে। মাঝে মাঝে আপনি এমন মানুষের সামনে বক্তব্য রাখবেন যারা শান্ত-সুস্থির হয়ে বসতে এবং বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে আগ্রহী। হয়তো তারা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবে, হয়তো তাঁদের সন্তুষ্ট করতে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করতে হবে। আবার অনেক সময় হয়তো রাগী আর অসভ্য প্রকৃতির লোকও থাকবে, যারা কোনো কিছুই মানতে রাজি না। যাদের সামনে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা বুখারি-মুসলিমের সহিহ হাদিস উপস্থাপন করলেও তারা মেনে নেবে না। তিন-চারটা কিতাব আগাগোড়া পড়েছে এমন তালিবুল ইলমের সামনে যেভাবে কথা বলবেন, হাল আমলের সাধারণ পশ্চিমা তরুণদের সামনে আপনি সেভাবে কথা বলতে পারবেন না। কিছু মানুষ তারগিবে (ترغيب) অনুপ্রাণিত হয়, কিছু মানুষ অনুপ্রাণিত হয় তারহিবে[১০৯] (ترهيب)। আবার কিছু মানুষ তারগিব-তারহিব দুটোতেই উৎসাহিত হয়। অধিকাংশ মানুষ আসলে এ ধরনের হয়ে থাকে।

আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার শ্রোতা কারা। একজন সফল দা'ঈ সবাইকে একই জিনিসের দাওয়াহ দেন, একই জিনিসের দিকে আহ্বান করেন, কিন্তু শ্রোতার বুঝ অনুযায়ী তিনি তাঁর দাওয়াহকে উপযোগী করে তোলেন। দাওয়াহর বিষয়বস্তু একই, এ ক্ষেত্রে আপস করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু যাদের দাওয়াহ দিচ্ছেন তাদের কাছে একে কার্যকরভাবে তুলে ধরতে হবে। এ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। দাওয়াহর জন্য ইলম যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি শ্রোতার উপযোগী করে তা উপস্থাপন করাও।

---

১০৯ **তারগিব** : উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা। **তারহিব** : ভীতি প্রদর্শন করা, সতর্ক করা, কঠোরতা আরোপ করা।

www.banglakitab.weebly.com

দারস ৯

দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হিকমাহর :

দাওয়াহর ভিত্তি বানাতে হবে ক্ষমা ও মমতাকে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো। (সূরা আন-নাহল, ১২৫)

দাওয়াহ হবে সর্বোত্তম আচরণের সাথে

দাওয়াহর জন্য আপনাকে দয়াশীল হতে হবে। দাওয়াহর ভিত্তি হলো নম্র ও ক্ষমাশীল হওয়া, বিনয়ের সাথে সর্বোত্তম ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলা। দাওয়াহর জন্য সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী শব্দটিকে বেছে নিতে হবে । দাওয়াহ হলো সর্বোত্তম আচরণ ও ভাষার মাধ্যমে, সর্বোত্তম উপায়ে মানুষকে আহ্বান করা। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে।' (সূরা আল-বাকারাহ, ৮৩)

হুসনা মানে সর্বোত্তম, সব পদ্ধতির উত্তম পদ্ধতি।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ

'আল্লাহর রাহমাহই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে। কাজেই

www.banglakitab.weebly.com

আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের পরামর্শ করুন।' (সূরা আলি ইমরান, ১৫৯)

আল্লাহ ﷻ এখানে তাঁর নবি ﷺ-কে বলছেন, যদি আপনি তাদের প্রতি কঠোর-কর্কশ হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। আপনাকে পরিত্যাগ করে নিজেদের পথ ধরত।

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

'তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।'

অর্থাৎ, যাদের দাওয়াহ করছেন তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। কেন? ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ নিয়ে কথা বলার সময় আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তাঁদের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, কারণ তারা আপনার ছাত্র, আর আপনি তাদের বাবার মতো।

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

'কাজেকর্মে তাদের পরামর্শ করুন।'

যদি তাঁদের সিদ্ধান্ত শেষপর্যন্ত গ্রহণ নাও করেন, তবু তাদের প্রতি দয়ার অংশ হিসেবে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

উত্তমপন্থা ব্যতীত তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে (একেবারেই) নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। (সূরা আল-আনকাবুত, ৪৬)

কোনো বিষয় যদি তর্কে গড়ায় তখনো আহলুল কিতাবের সাথে তর্ক করতে হবে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। শ্রেষ্ঠ আখলাক ও সুন্দরতম ভাষার মাধ্যমে। যদি তর্কের ক্ষেত্রেই এ নিয়মগুলো মেনে চলতে হয়, তাহলে চিন্তা করুন দাওয়াহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন হতে পারে?

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো। (সূরা আন-নাহল, ১২৫)

খোদ রাসূল ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছিল উত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াহ পৌঁছে দেয়ার জন্য। আল্লাহ ﷻ তাঁকে বলছেন, যদি আপনি কর্কশ হতেন, তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এমন হলে, দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

www.banglakitab.weebly.com

হিকমাহর অর্থ ইসলামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া না

দাওয়াহর ক্ষেত্রে হিকমাহ অবলম্বন করা মানে এই না যে, আপনি ইসলামের মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে আপস করবেন। মডার্নিস্টদের কাছে দাওয়াহ মানেই ইসলামের মূলনীতির ব্যাপারে ছাড় দেয়া। এদের কাছে দাওয়াহর সংজ্ঞাই এটা। বিক্রি হয়ে যাওয়া এসব বিভ্রান্তদের কাছে হিকমাহ হলো সবকিছুতে ছাড় দেয়া, আর কাফিররা যা কিছু শুনতে চায় সেটা বলা। হিকমাহর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে *মাদারিজুস সালিকিনে* ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেছেন,

فالحكمة إذا فعل ما ينبغي على الوجه الذى ينبغي فى الوقت الذى ينبغي

'হিকমাহ' হলো–উপযুক্ত কাজটি, উপযুক্ত পদ্ধতিতে, উপযুক্ত সময়ে আদায় করা।[১১০]

মানুষের বুঝ অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলা আর কথাবার্তায় সদয় আচরণ বজায় রাখা, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। একটি হলো, আপনি এমনভাবে কথা বলবেন যা আপনার শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য হয়। আরেকটি হচ্ছে, আপনি তাদের সাথে কথা বলবেন দয়া ও বিচক্ষণতার সাথে। আর ইসলামের ব্যাপারে আপস করা, ছাড় দেয়া হলো এ দুটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আরেকটি বিষয়। এই পার্থক্যগুলো বোঝা জরুরি। দাওয়াহর সময় আপনি মানুষের সাথে তাদের বুঝ অনুযায়ী কথা বলবেন, তাদের প্রতি সদয় হবেন, এটা ভালো কথা। কিন্তু তার মানে এই না যে আপনি ইসলামের ব্যাপারে আপস করবেন। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে *সহিহ বুখারি*, *মুসলিম* ও *মুসনাদ আল-বাযযার*-এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ মুয়ায ﵁-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন, মানুষের জন্য সহজ করো, কঠিন কোরো না।

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

সহজ করো, কঠিন কোরো না; সুসংবাদ শোনাও, নিরাশ কোরো না।[১১১]

এর অর্থ কী? যেমন : সালাতকে সহজ করো। হ্যাঁ, সালাতকে সহজ করুন, কিন্তু সহজ করার মানে কি সালাত না পড়লে কোনো সমস্যা নেই, এমন বলা? সহজ করার মানে কি আপনি মানুষকে বলে বেড়াবেন যে, তারা যখন ইচ্ছে তখন সালাত আদায় করতে পারবে? অথবা কাজ থেকে ফিরে এসে দিনের সব নামায একেবারে ইশার পর আদায় করা যাবে? হাদিসে সহজ করার কথা এসেছে, কিন্তু সহজ করা বলতে এ ধরনের কিছুকে বোঝায় না। তাহলে সালাতকে সহজ করবেন কীভাবে? সফরের সময় একসাথে দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করা যায়, কসর করা যায়, এগুলো মানুষকে জানান। এটাই হলো সহজ করা। মানুষকে জানান শারীয়াহর রুখসাতের (সুবিধা বা ছাড়) ব্যাপারে। এভাবে সহজ করুন। কেউ যদি অসুস্থ হলে

১১০ *মাদারিজুস সালিকিন* : ২/২৭৯
১১১ *সহিহুল বুখারি* : ৬৯

www.banglakitab.weebly.com

তাকে জানান যে অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা বাধ্যতামূলক না। অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে, বসে আদায় করতে পারবে। যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসতেও না পারেন, তাহলে সালাত আদায় করবেন শুয়ে। যদি তাও না পারেন, তাহলে চোখের ইশারায়। মানুষকে এ ব্যাপারগুলো জানান। এভাবে সহজ করুন। তাঁদের জানিয়ে দিন সফরের সময় রোযা রাখা বাধ্যতামূলক না। রোযার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সর্বোত্তম হলো সাহরি দেরি করা আর ইফতার তাড়াতাড়ি করা। কিন্তু কেন? এতে করে রোযা বেশি দীর্ঘ হয় না, ফলে রোযা রাখা সহজ হয়। দ্বীনকে এভাবে সহজ করুন, মর্ডানিস্টদের নতুন বিকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী না।

মানুষকে জানান যে দুটো হালালের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তুলনামূলকভাবে সহজটিকেই বেছে নিতেন। কাজেই একই রকম পরিস্থিতিতে আমরা যেন বিষয়গুলো কঠিন না করে ফেলি। তবে মনে রাখতে হবে এ নীতি প্রযোজ্য দুটো হালাল জিনিসের মধ্যে। দ্বীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, বিকিয়ে যাওয়া মডার্নিস্টরা এই নীতির অর্থকে আজ পাল্টে ফেলেছে। তারা এর অর্থ করেছে হালাল আর হারামের মধ্য থেকে 'সহজটাকে' বেছে নেয়া! অর্থাৎ, আপনার সামনে একটি হারাম এবং একটি হালাল আছে, সহজ বলে আপনি হারামকে বেছে নেবেন। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, হজে গাড়ি করে কিংবা হেঁটে যাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আপনি বেছে নিতে পারেন যেকোনো একটাকে। এ সুযোগ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থাকলে তিনি সম্ভবত গাড়িতে চড়ে যাওয়াকে বেছে নিতেন, যেহেতু দুটোর মধ্যে এটা সহজ। আর আমরা জানি রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা গিয়েছিলেন বাহনে চড়ে। কিন্তু তার মানে অর্থ এই না যে হালাল ও হারামের মধ্য থেকে হারাম বেছে নেয়ার সুযোগ আছে কারণ হারাম কাজটা সহজ। এই নীতি প্রযোজ্য দুটো হালালের মধ্য থেকে কোনো একটি বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে।

হাদিসের প্রথম অংশে ব্যাপারটি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا

রাসূল ﷺ দুটো নির্দেশের মাঝে তুলনামূলক সহজটি বেছে নিতেন।[১১২]

এখানে শুধু দুটো বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার কথা এসেছে। নির্দিষ্ট করে হালাল-হারামের উল্লেখ এ অংশে আসেনি। কিন্তু হাদিসের শেষের অংশের দিকে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন আসলে এখানে দুটো হালালের মধ্য থেকে সহজটিকে বেছে নেয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে। আপনার সামনে একটি হারাম এবং একটি হালাল আছে, সহজ বলে আপনি হারামটি বেছে নেবেন, হাদিস কিন্তু তা বলে না। হাদিসের শেষ অংশ এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে :

فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

যদি এতে কোনো পাপের সম্ভাবনা থাকত, রাসূল ﷺ সবার আগে এ থেকে দূরে থাকতেন।

১১২ *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৬০; *সহিহ মুসলিম* : ৬১৯০

www.banglakitab.weebly.com

অথচ অনেকেই হাদিসের এই অংশটি বলে না। হাদিসে বলা হচ্ছে যদি এতে কোনো পাপের সম্ভাবনা থাকত, রাসূল ﷺ সবার আগে এ থেকে দূরে থাকতেন।

দ্বীনকে সহজ করা মানে ইচ্ছেমতো হারামকে হালাল বানানো না। আজকাল দ্বীনকে সহজ করার নামে অনেকে হারামকে হালাল বানিয়ে দিচ্ছে। ফাতওয়া দেয়া হচ্ছে। এদের দলিল কী? কিসের ভিত্তিতে এসব দেওয়া হচ্ছে? দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াসিররু ওয়ালা তু'আসসিরু 'সহজ করো, কঠিন কোরো না।' আজ যেমন অনেকে বলছে, পাশ্চাত্যে সুদ হালাল। কেন? ওই যে, 'সহজ করো, কঠিন কোরো না।' ইয়াসসিরু ওয়া লা তু'আসসিরু। কাফিরদের কাছে মদ বিক্রিও এদের কাছে হালাল। এই হাদিসের ব্যাপারে ভুল বুঝের কারণে মানুষ আজ এসব বিষয়ে চরম ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়েছে।

অথচ হাদিসের অর্থ কী? ধরুন, আগে আপনি সালাত আদায় করতে পারতেন দাঁড়িয়ে, এখন পারছেন না। তাহলে বসে সালাত আদায় করুন। সফরের সময় সালাত কসর করুন। সফরে থাকলে কিংবা বেশি অসুস্থ হলে আপনার সাওম কাযা করার সুযোগ আছে। কিন্তু আজ কীভাবে এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে? কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে? দেখবেন এখন কিছু টুপি বেরিয়েছে। মডার্নিস্টদের অনেকে হিজাব হিসেবে মহিলাদের এই টুপি পরতে পরামর্শ দেয়। একটা ছোট টুপিকে এরা হিজাব বলছে, কেন? কারণ, এ মহিলারা অ্যামেরিকাতে থাকেন, আর তাদের বাসে চড়তে হতে পারে। তো হাদিস তো আছেই, 'সহজ করো, কঠিন কোরো না।' ব্যস! পশ্চিমে বসবাস করা মুসলিমদের ওপর যেহেতু পশ্চিমা সরকার ও লোকজন বেশি নজর রাখে, তাই পশ্চিমা মুসলিমরা এসব কাজ করতে পারবে। হাদিস আছে, 'সহজ করো, কঠিন কোরো না!' কেউ কেউ তো আরও একধাপ এগিয়ে বলে যে, হিজাব বাদ। হিজাব ছাড়াই থাকো, হিজাবের একদম দরকার নেই। কারণ, ইয়াসিররু ওয়ালা তু'আসসিরু। 'সহজ করো, কঠিন কোরো না!'

দাওয়াহর ক্ষেত্রে রাহমাহ

দাওয়াহর মূল ভিত্তি হচ্ছে উদারতা এবং দ্বীনকে সহজ করে উপস্থাপন করা। আপনি রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নির্দিষ্ট একটি লাইন বা সীমার ভেতরে চালান, চিহ্ন বা সীমানার বাইরে চলে যান না। আপনার সামনে দুটো লাইন আছে, এ দুটো লাইনের ভেতরে থেকে যেভাবে সহজ হয় সেভাবে আপনি গাড়ি চালাবেন। একইভাবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে আপনি সহজ করবেন এবং বিনয়ী হবেন শারীয়াহর নির্ধারিত সীমারেখার ভেতরে থেকে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো। (সূরা আন-নাহল, ১২৫)

www.banglakitab.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন মহিলাটি একটি কবরের কাছে বসে কান্না করছে। তিনি মহিলাটিকে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সাওয়াব প্রত্যাশা ও সবর করতে বললেন। জবাবে মহিলাটি বলল,

إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي

সরো আমার কাছ থেকে, আমার মতো তো তোমার ওপর বিপদ আসেনি![১১৩]

চিন্তা করুন! মহিলাটি রাসূল ﷺ-কে ধমকের সুরে কথা বলল! অন্য কোনো দা'ঈ কী বলত? হয়তো রেগে গিয়ে মহিলাকে বলত, আমাকে এসব বলছ? তোমার সাহস কত! জানো আমি কে? আমি একজন শাইখ, তুমি জানো আমি কতগুলো লেকচার দিয়েছি? আমার লেখা কতগুলো বই আছে তুমি জানো? অথচ রাসূল ﷺ কিছু বললেন না, স্বাভাবিকভাবে চলে গেলেন। পরে সাহাবি ؓ-দের কাছ থেকে তাঁর পরিচয় জানতে পেরে মহিলা দ্রুত রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। রাসূল ﷺ তাঁর সাথে সদয় আচরণ করলেন এবং বললেন,

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

আরে, আঘাতের শুরুতে সবর করাই তো হলো প্রকৃত সবর।

মহিলার জবাব শুনে রাসূল ﷺ রেগে যাননি, কারণ তিনি মহিলার মানসিক অবস্থা বুঝেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সন্তানহারা মায়ের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে। এ উদাহরণটি পরের পয়েন্ট নিয়ে আলোচনার সময় মাথায় রাখবেন।

মুসনাদ আহমাদে আবু উমামাহ ؓ থেকে বর্ণিত আছে, এক যুবক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে যিনা করার অনুমতি চাইলো। সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন।' আজকের আলিমদের সাথে যদি এই ঘটনা ঘটত, তবে কী হতো, আল্লাহ ﷻ ভালো জানেন। তারা হয়তো তাঁকে ফাসিক আখ্যা দিতেন, তার সম্পর্কে নানান কথা বলতেন। অথচ যুবকের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হওয়া সাহাবি ؓ-দের রাসূল ﷺ শান্ত করলেন। সাহাবি ؓ-গণ এ প্রশ্ন শুনে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন—কীভাবে এই লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এমন প্রশ্ন করতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مَهْ مَهْ

শান্ত হও, শান্ত হও।

সাহাবি ؓ-গণ রাসূল ﷺ-এর একান্ত অনুগত ছিলেন। এ কথা শোনামাত্র তাঁরা নীরব হয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ লোকটিকে তাঁর কাছে ডাকলেন। লোকটি বসেছিল হালাকার শেষপ্রান্তে,

১১৩ *সহিহুল বুখারি* : ১২৮৩

www.banglakitab.weebly.com

যাতে প্রশ্নের উত্তর শুনেই যেন চলে যেতে পারে। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে এনে নিজের পাশে বসালেন, তার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁকে বোঝালেন দলিল ও যুক্তি দিয়ে, উদাহরণ ও হিকমাহর সাথে। শুরুতে তাঁকে কোনো আয়াত বা হাদিস শোনালেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রথমে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন, কারণ যুবকেরা সাধারণত বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে। এ জন্যই যুবকদের কাছে দাওয়াহ করা সবচেয়ে সহজ, যেহেতু তাঁরা চিন্তা করে, নিজের বিচার-বিবেচনা ব্যবহার করে। বৃদ্ধদের ধারা তারা আঁকড়ে থাকে না। তিনি ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি কি নিজ মায়ের জন্য তা পছন্দ করো?' সে বলল, 'না।' রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে লোকেরাও তো তাদের মায়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।' তারপর তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার বোনের জন্য তা পছন্দ করো?' সে বলল, 'না, কে আছে নিজ বোনের ব্যাপারে তা মেনে নেবে?' রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে লোকেরাও তো তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না।' তারপর তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার ফুপুর জন্য তা পছন্দ করো?' সে বলল, 'না, কে আছে তা নিজ ফুফুর ব্যাপারে মেনে নেবে?' তিনি বললেন, 'তাহলে লোকেরাও তো তাদের ফুপুদের জন্য তা মেনে নিতে পারে না।' তারপর তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার খালার জন্য তা পছন্দ করো?' এভাবে তিনি একের পর এক উদাহরণ দিয়ে যেতে লাগলেন। ইচ্ছে করলে একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি থেমে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি এতগুলো উদাহরণ দিলেন যাতে করে যুবকটি চিন্তা করতে পারে। তারপর তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তার বুকে হাত রেখে দুআ করলেন। তিনি বললেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

> 'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, তার অন্তরকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখুন।'[১১৪]

এ যুবকটি পরে বলেছিল, 'ওয়াল্লাহি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আসার পর আমার কাছে আর কোনো কিছু যিনার চেয়ে বেশি ঘৃণ্য ছিল না। । এ ঘটনার পর সে আর যিনার ধারেকাছেও যায়নি। সে এর কাছেও যায়নি এমনকি তার মনে আর কখনো যিনা করার আকাঙ্ক্ষাও জাগেনি। খুব অল্প কিছু কথা তার মনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, এটাই হচ্ছে হিকমাহ।

বুখারি ও মুসলিমে এক বেদুইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদে এসেছিল। ছোটবেলায় আমি যখন মদীনাতে গিয়েছিলাম, তখন মাসজিদ আন-নববীর আয়তন ছিল খুব ছোট। মাত্র পনেরো থেকে বিশ মিনিটে পুরো মদীনা (মূল অংশ) পায়ে হেঁটে ঘুরে আসা যেত। তাহলে চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় মাসজিদ কতটা ছোট ছিল। মরুভূমি থেকে এসে আর কোনো জায়গা না পেয়ে ক্লান্তশ্রান্ত বেদুইন শেষমেশ মাসজিদের এক কোণে বসে পড়ল প্রস্রাব করতে। আজকের কোনো মাসজিদে এ ঘটনা ঘটলে কী হবে?

---

১১৪ *মুসনাদু আহমাদ*: ২২২১১

www.banglakitab.weebly.com

সবাই তাকে জুতোপেটা করবে, গণপিটুনি দেয়া হবে, হয়তো পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেয়া হবে এবং তাকে জেল খাটতে হবে। এতে হয়তো সে তার দ্বীনই পরিবর্তন করে ফেলবে কিংবা এর চেয়ে খারাপ কিছুও ঘটতে পারে। সাহাবি ﵃-গণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের বললেন, 'তার কাজে বাধা দিয়ো না।'

এই হাদিসের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনু হাজার ﵀ বলেছেন, 'এ ঘটনা থেকে দাওয়াহর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিকমাহর গভীরতা প্রমাণিত হয়। যদি সাহাবি ﵃-গণ লোকটিকে বাধা দিতেন, তাহলে প্রস্রাব লোকটির সারা গায়ে ছড়িয়ে যেত। কারণ, তাকে থামতে বলা হলে প্রথমে সে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু প্রস্রাব করা অবস্থায় যদি সে থামতে না পারে, তাহলে প্রস্রাব ছড়াবে তার কাপড়ে ও মাসজিদে। আর সে যদি প্রস্রাব থামাতেও পারে, তাহলে সেটা হবে তার জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর।' যা হোক, বেদুইনের কাজ শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবি ﵃-দের তা পরিষ্কারের নিয়ম শেখালেন এবং এ ঘটনা আমাদের জন্য একটি শিক্ষায় পরিণত হলো। আমরা জানতে পারলাম, এভাবে কার্পেট বা অন্য কোনো কিছু নোংরা হলে কীভাবে সেটা পরিষ্কার করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বেদুইনকে কাছে ডাকলেন। সংশোধন না করে এ রকম কিছু তিনি ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি সমাধান ও সংশোধন করতেন হিকমাহর সাথে। বেদুইন লোকটিকে পাশে বসিয়ে এমন দয়া ও হিকমাহর সাথে বোঝালেন যা কেবল তাঁর ﷺ পক্ষেই সম্ভব ছিল। এমনকি বেদুইনটি বিদায় নেয়ার সময় বলল, 'হে আল্লাহ, শান্তি বর্ষণ করো শুধু আমার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাও শুধরে দিলেন, বললেন, 'আল্লাহ ﷻ-এর দয়া অপরিসীম, একে কেবল তোমার আর আমার মাঝে সীমাবদ্ধ কোরো না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মানুষকে সংশোধন করেছেন, কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা অবলম্বন করতেন, ফলে সবাই তা মেনে নিত, এগুলো তাদের বোধগম্য হতো।

*বুখারি*তে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার ইবনু আবি সালামাহ ﵁-কে এত সুন্দরভাবে খাবারের আদব শিখিয়েছিলেন যে তিনি তা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন। আরও সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে মক্কা বিজয়ের ঘটনায়। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় দশ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট সেনাদল। তাঁরা ঘিরে রেখেছিলেন সমগ্র মক্কাবাসীকে। প্রায় দুই দশক ধরে মক্কার এই লোকেরা সম্ভাব্য সব উপায়ে চেষ্টা করেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষতি করার। এরাই তাঁর পরিবার-পরিজনদের ক্ষতি করেছিল, হত্যা করেছিল তাঁর প্রিয় সাহাবিদের। আজ তারা তাঁর দয়ার মুখাপেক্ষী। আজ মক্কাবাসীকে ঘিরে আছে তাঁর ﷺ অনুগত দশ হাজার সশস্ত্র সেনা। একটি ইশারা, একটিমাত্র কথাতেই দুনিয়ার বুক থেকে তিনি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন। অথচ তিনি যখন তাদের উদ্দেশে বক্তব্য শুরু করলেন, প্রথমে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের কী ধারণা, আজ আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব?' তারা কী বলল?

www.banglakitab.weebly.com

'আপনি মহানুভব ব্যক্তি, মহানুভব ব্যক্তির সন্তান।'

অর্থাৎ, আপনি আমাদের মাফ করে দেবেন। মূলত তারা এর দ্বারা বুঝিয়েছিল যে, আপনি মহানুভব, আপনার পিতা মহানুভব, সুতরাং আপনি নিশ্চয় আমাদের ক্ষমা করবেন। কারণ, উদার-মহানুভব চরিত্রের অধিকারী কেউ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ক্ষমার পথ অবলম্বন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে কথাই বললেন, যা ইউসুফ ﷵ বলেছিলেন :

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

'আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ, ৯২)

اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

যাও, তোমরা মুক্ত।[১১৫]

দেখুন, এসব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কী গভীর হিকমাহ অবলম্বন করেছিলেন। এমন বহু উদাহরণ আছে।

সহিহ মুসলিমের একটি ঘটনা। মুয়াউইয়া ইবনুল হাকাম আস-সালামি ؓ সালাত আদায় করছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে। হঠাৎ হাঁচি দিলেন আরেক সাহাবি। মুয়াউইয়া ؓ সালাতের মধ্যেই হাঁচি দেয়া লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। ইনি মুআবিয়াহ ইবনু আবি সুফিয়ান ؓ নন আরেকজন সাহাবি। হাদিসের বর্ণনা থেকে মনে হয় প্রত্যুত্তরে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম (يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) না বলার কারণে মুয়াউইয়া ؓ মর্মাহত হলেন। কোনো উত্তর না আসায়, সালাতের মধ্যেই তিনি বারবার ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে যাচ্ছিলেন। এতে অন্যান্য সাহাবিদের মধ্যে অনেকে এতটাই বিরক্ত হলেন যে কেউ কেউ হাত দিয়ে নিজ উরুতে আঘাত করে শব্দ করলেন যেন তিনি চুপ হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারলেন, ব্যথিত হয়ে চুপ হয়ে গেলেন। তিনি কেন বারবার ইয়ারহামুকাল্লাহ বলছিলেন? এর কারণ হতে পারে যে, তিনি চাচ্ছিলেন যিনি হাঁচি দিয়েছিলেন তিনি যেন তার উদ্দেশ্যে 'ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম' বলেন। যখন তিনি দেখলেন, সাহাবিরা বিরক্ত হয়ে উরুতে আঘাত করছেন, তিনি চুপ করে গেলেন।

কোনো ভুল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটাকে পাশ কাটিয়ে যেতেন না। তিনি বলতেন না যে হিকমাহ হলো পাশ কাটিয়ে যাওয়া। সালাত শেষে তিনি মুয়াউইয়া ؓ-কে কাছে ডাকলেন। তাঁকে নসীহাহ করলেন, বোঝালেন সালাতের সময় এমন করা যায় না। তাঁকে সালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানালেন। মুয়াউইয়া ؓ বলেছেন—ওয়াল্লাহি, তিনি আমার প্রতি একটুও ঘৃণা প্রকাশ করেননি। ওয়াল্লাহি, তিনি আমাকে মারেননি, কোনো কড়া কথা বলেননি।

---

১১৫ ইবনু হিশাম, *সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*: ২/৪১২

www.banglakitab.weebly.com

অত্যন্ত নম্রতা ও দয়ার সাথে তিনি আমাকে বলেছেন, এটা সালাত, আমরা সালাতের মাঝে এ ধরনের কোনো কথা বলতে পারব না। এখানে কেবল তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে। কোমলতার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভুল শুধরে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ রকম ব্যবহার পাবার পরপর মুয়াউইয়া ইবনুল হাকাম رضي الله عنه মন খুলে তাঁর সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। ইসলাম গ্রহণের আগেকার জীবনের অনেক বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্ন করলেন নিজের জাহিলি জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এ সব ছিল পথভ্রষ্টতা।

শিক্ষণীয় বিষয় হলো, মুয়াউইয়া رضي الله عنه-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ এত উদারতা ও হিকমাহপূর্ণ ছিল যে, মুয়াউইয়া رضي الله عنه-এর কাছে মনে হয়েছিল যে তাঁর ﷺ কাছে মন খুলে কথা বলা যায়, প্রশ্ন করা যায় যেকোনো বিষয়ে। উম্মাহ হিসেবে এর সুফল আমরা ভোগ করছি। কারণ, ইনি ছিলেন সেই সাহাবি, যিনি তাঁর দাসীকে চড় মারার পর অনুতপ্ত হয়ে বিচারের জন্য দাসীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন মাসজিদে তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোর আচরণ করলে মুয়াউইয়া رضي الله عنه হয়তো আর কখনো তাঁকে কিছু বলার সাহস করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দাসীকে নিয়ে এসে বলতে পারতেন না, আমি তাকে মেরেছি, এখন আমার কী করা উচিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণের কারণে তিনি পরে এসে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন—'আল্লাহ কোথায়?' এটি একটি বিখ্যাত হাদিস, আপনারা সবাই জানেন। দাসীটি আরবি বলতে পারত না, কিন্তু সে প্রশ্ন ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তরে সে আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ইশারা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁকে মুক্ত করে দাও।[১১৬]

---

১১৬ সহিহ মুসলিম, সহিহ ইবনু হিব্বান, মুসনাদু আহমাদ, সুনানুন নাসায়ি, সুনানুল বাইহাকি, সুনানু আবি দাউদ, মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ, মুশকিলুল আসার লিত-তাহাবি, মু'জামুত তাবারানিসহ হাদিসের আরও বহু কিতাবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। সহিহ মুসলিমের শব্দাবলি নিম্নরূপ :

মুয়াউইয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত,

قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ «ائْتِنِي بِهَا». فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا «أَيْنَ اللَّهُ». قَالَتْ فِي السَّمَاءِ.قَالَ «مَنْ أَنَا». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

তিনি বলেন, আমার এক দাসী ছিল। সে উহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ এলাকায় আমার বকরীপাল চরাত। একদিন আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে দেখলাম পাল থেকে বাঘে একটি বকরী নিয়ে গিছে। আমিও তো অন্যান্য আদমসন্তানের মতো একজন মানুষ। তাদের মতো আমিও রেগে গেলাম ও দাসীকে আঘাত করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম (এবং সব কথা বললাম)। কেননা, বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুতর মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তাকে মুক্ত করে দেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুতরাং আমি তাকে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাজির করলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, (বলো তো) আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশে। তিনি বললেন, (বলো তো) আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তাকে মুক্ত করে দাও, সে একজন মুমিনাহ নারী। [বর্ণনা নং : ১২২৭]

www.banglakitab.weebly.com

প্রথমবার মুয়াউইয়া ﷺ-এর সংশোধনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি উদার না হতেন, তিনি যদি তাঁকে চুপ কতে বলতেন, এমন কিছু বলতেন যা অন্য সাহাবিদের সামনে তাঁকে বিব্রত করত, যদি তাকে জামাতে আসতে নিষেধ করতেন কিংবা কোনো কঠোর কথা শুনিয়ে দিতেন, তাহলে আর কোনো দিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিঃসংকোচে আসতে পারতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণের মাধুর্য মুয়াউইয়া ﷺ-এর অন্তরকে স্বস্তি দিয়েছিল, প্রশান্ত করেছিল। তার কাছে মনে হয়েছিল যেকোনো বিষয় নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতে পারবেন। এ প্রশ্নের ফলাফল হিসেবেই আমরা পেয়েছি 'আল্লাহ কোথায়?'এ প্রশ্নের ব্যাপারে সুন্নাহর সবচেয়ে শক্তিশালী দলিলগুলোর একটি।

আল্লাহ ﷻ দাওয়াহর ব্যাপারে মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামকে উপদেশ দিলেন :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

'এবং তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হতে পারে সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।' (সূরা আত-ত্বহা, ৪৪)

হিকমাহ অবলম্বনে এর চেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে? দাওয়াহতে হিকমাহ ও নম্রতা অবলম্বনের সর্বোচ্চ উদাহরণ এই আয়াতটি। আল্লাহ তাঁর দুজন বিশিষ্ট রাসূলকে বলছেন তাঁরা যেন ফিরাউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসির ﵀ বলেছেন, এই আয়াতের মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা নিহিত। ফিরাউন পৌঁছে গিয়েছিল ঔদ্ধত্যের শিখরে, উপনীত হয়েছিল অহংকারের শেষ সীমায়। সে পরিণত হয়েছিল পৃথিবীতে অহংকার, ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘনের মূর্ত প্রতীকে। অথচ এই ফিরাউনের ব্যাপারেও আল্লাহ তাঁর বিশিষ্ট রাসূলদের আদেশ দিলেন, তারা যেন তার সাথে নম্র আচরণ করেন। এমন এক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ ﷻ তাঁদের নম্রতা অবলম্বন করতে বললেন, যে নিজেকে রব দাবি করেছিল। সে বলেছিল :

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব।' (সূরা আন-নাযিয়াত, ২৪)

যদি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পালনকর্তা দাবি করা উদ্ধত ফিরাউনের সাথে আল্লাহ ﷻ নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন, তাহলে যারা আল্লাহ ﷻ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ পালনকর্তা হিসাবে স্বীকার করে, তাদের সাথে কথা বলার সময় কী পরিমাণ সহানুভূতি, দয়া, নম্রতা ও হিকমাহ অবলম্বন করা প্রয়োজন? ভাবুন।

আব্বাসীয় খিলাফাহর সময়কার কথা। খলিফা আল-মামুনের কাছে এসে অত্যন্ত কড়া ভাষায় এক লোক তিরস্কার করতে শুরু করল। আল-মামুন বিচক্ষণ ছিলেন, কথাবার্তায় প্রজ্ঞা অবলম্বন করতেন। তিনি বললেন, তোমার চেয়ে উত্তম এক ব্যক্তিকে আল্লাহ আমার

www.banglakitab.weebly.com

চেয়েও নিকৃষ্ট এক লোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ﷻ মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا

'এবং তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।' (সূরা আত-ত্বহা, ৪৪)

বুখারিতে আছে, ইবনু মাসউদ ﷺ বলেছেন, আমার এখনো এমনভাবে মনে আছে, যেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিজের চোখের সামনে দেখছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেকার সময়ের এক রাসূলের নির্যাতনের কাহিনি বলছিলেন—তার কওম তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাত। রক্তাক্ত অবস্থায়ও তিনি বলতেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

হে আল্লাহ, আমার জাতির লোকেরা অজ্ঞ, আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন।[১১৭]

চিন্তা করুন, একজন রাসূলের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। রক্ত মুছতে মুছতে তিনি বলছেন, 'হে আল্লাহ, আমার জাতির লোকেরা অজ্ঞ, আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন।'

এই হলো দাওয়াহ ইলাল্লাহ। এ পথের কষ্টগুলো আপনাকে বরণ করে নিতে হবে। কখনো লাঞ্ছিত হবেন। মেনে নিতে হবে। এ সবকিছুই দাওয়াহর অংশ। মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াহর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো নম্রতা ও হিকমাহ অবলম্বন। আমাদের নবি ﷺ যেন মমতা ও কোমলতার আধার, তিনি ছিলেন উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী; ছিলেন দয়া ও ভালোবাসার কূলহীন সমুদ্র। তাঁর কোনো কথার ব্যাপারে 'কেন তিনি এ কথাটা বলেছিলেন?', 'কেন ওভাবে বলেছিলেন?' এ ধরনের কোনো প্রশ্ন কেউ তুলতে পারবে না। এই হলেন আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ—দয়ার নির্ঝরিণী।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

'এবং আমি আপনাকে আলামিনের (মানুষ, ইনসান ও যা কিছু আছে) জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, ১০৭)

তিনি ছিলেন মানবজাতির প্রতি রাহমাহস্বরূপ। শুধু মানবজাতি না; তিনি ছিলেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য রাহমাহস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। 'আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি; মানুষ, জিন; মুমিন, কাফির ও এই মহাবিশ্ব সবকিছুর জন্য তিনি ছিলেন রাহমাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো ভুলের সাথে আপস করেননি, ভুলগুলোকে এড়িয়ে যাননি। যখনই কোনো ভুল হয়েছে শুধরে দিয়েছেন। কিন্তু ভুল সংশোধনের জন্য তিনি সবচেয়ে সৌজন্যপূর্ণ, যথোপযুক্ত ও সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করতেন।

১১৭ *সহিহুল বুখারি* : ৩৪৭৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ৪৩৩১

www.banglakitab.weebly.com

বনি ইসরাইলের এক মুমিন মহিলার[১১৮] পতিতাবৃত্তির গুনাহ আল্লাহ ﷻ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কেন? কারণ, মহিলাটি একটি কুকুরের প্রতি দয়া দেখিয়েছিল। নিজে পিপাসার্ত হবার কারণে সে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় একটি কুকুরের কষ্ট অনুভব করতে পেরেছিল। তৃষ্ণার্ত কুকুরটিকে পানি পান করিয়েছিল নিজের জুতো ভরে। একটি কুকুরের প্রতি দয়া করার কারণে তার পতিতাবৃত্তিসহ অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ ﷻ ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে জান্নাত দান করলেন। কাজেই আপনার দাওয়াহয় মমতা থাকতে হবে, দাওয়াহ মানেই রাহমাহ। কুকুরের প্রতি দয়ার কারণে যদি আল্লাহ ﷻ একজন পতিতার কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাত দান করেন, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহয় বিশ্বাসী একজন বান্দার প্রতি দয়ার প্রতিদান কত বিশাল হবে একবার কল্পনা করুন। কল্পনা করুন, সমগ্র মানবজাতির ওপর দয়ার প্রতিদান কেমন হবে।

দাওয়াহ একটি শিল্প, যার সম্পর্ক মানুষের অন্তরের সাথে। একজন দা'ঈর কাজ মানুষের অন্তর নিয়ে। এ শিল্পের নিয়মগুলো আপনাকে জানতে হবে। কখনো এমনও হতে পারে, আপনি ন্যায়পরায়ণ বান্দাদের কাছে দাওয়াহ করছেন এবং তাঁদের সামনে সত্যকে উপস্থাপন করছেন, কিন্তু আপনার উপস্থাপনার কারণে সাধারণ লোকেরা হককে বাতিল মনে করছে। এ ব্যাপারে সতর্ক হোন। আপনি হকের ওপর আছেন, হকের দিকেই আহ্বান করছেন, কিন্তু আপনার পদ্ধতি বাতিল হবার কারণে সাধারণ মানুষ হককে বাতিল মনে করছে। আপনি ভুল পদ্ধতির অনুসরণ করছেন। এ ব্যাপারে সতর্ক হোন। আবার এমন কিছু বিদআতি ও মর্ডানিস্ট দা'ঈদের দেখবেন যাদের মুখে সব সময় কৃত্রিম রেডিমেড হাসি লেগে থাকে। বিশেষ কথা, মর্ডানিস্টরা বিষাক্ত কথা আর মেকি হাসিতে খুব পারদর্শী। মুখে রেডিমেড হাসি নিয়ে নোংরা, বিকিয়ে যাওয়া ও কলুষিত এক 'ইসলাম' এরা ফেরি করে বেড়ায়। তাদের হাসি যেমন মেকি, তেমনি তাদের সস্তা মতাদর্শও মেকি। হয়তো আপনি এটা ধরতে পারবেন। কিন্তু তাদের আকর্ষণীয় উপস্থাপনার কারণে অনেক সাধারণ, অজ্ঞ লোক বাতিলকে হক মনে করতে শুরু করে। একজন দা'ঈ হিসেবে আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমরা শয়তানদের কাছে দাওয়াহ নিয়ে যাচ্ছি না। শয়তানদের দাওয়াহ দিতে আমরা আদিষ্টও হইনি। আবার আমরা যাদের দাওয়াহ দিচ্ছি তারা ফেরেশতাও না, অনুভূতিহীন পাথরও না। আমরা মানুষ নিয়ে কাজ করছি, মানুষের অন্তর নিয়ে কাজ করছি। এতে ভালো ও মন্দ দুটোই আছে। মানুষের মাঝে নিষ্ঠাবান মুত্তাকি যেমন আছে, তেমনি নির্ভেজাল ফাজিরিনও আছে। কাদের নিয়ে কাজ করছেন আপনাকে জানতে হবে।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

১১৮ এই মহিলা মুমিনাহ ছিলেন। বর্তমানের অনেক মর্ডানিস্ট এ বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বর্তমানের কাফিরদের ক্ষেত্রে এই হাদিস প্রয়োগের চেষ্টা করে।

www.banglakitab.weebly.com

'শপথ প্রাণের (আদম কিংবা আত্মা কিংবা কোনো ব্যক্তি) এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর, তারপর তিনি তাকে সত্য ও মিথ্যার জ্ঞান প্রদান করলেন।'(সূরা আশ-শামস, ৭-৮)

অর্থাৎ, আপনি (মুত্তাকিন ও ফুজ্জার) উভয় শ্রেণির মানুষ পাবেন, তাই হিকমাহ ও দয়ার সাথে দাওয়াহ পৌঁছে দিন। আপনার কাজ মানুষের হৃদয় নিয়ে, অন্তরাত্মা নিয়ে, তাই হিকমাহর সাথে কাজ করুন।

কঠোরতাও হিকমাহর অন্তর্ভুক্ত

আমরা দাওয়াহয় দয়া ও হিকমাহ অবলম্বন এবং দাওয়াহর মূলনীতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এবার আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেটাকে প্রথমে আগেকার আলোচনার বিপরীত মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এটা সেই একই আলোচনার ধারাবাহিকতা। দাওয়াহ একদিকে যেমন কোমল ও হিকমাহপূর্ণ হতে হয়, একইভাবে হিকমাহর কারণে কখনো কখনো একজন দা'ঈর আচরণে কঠোরতা প্রকাশ পায়। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে দাওয়াহর খাতিরে কখনো কখনো কঠোরতা অবলম্বনের দরকার হয়। দাওয়াহর ক্ষেত্রে হিকমাহ, নম্রতা ও সর্বোত্তম আচরণ অবলম্বনের ব্যাপারে যেসব উদাহরণ আমরা এনেছি, সেগুলোর বেশির ভাগ থেকেই এবং অন্যান্য আরও উদাহরণ থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, দাওয়াহর ক্ষেত্রে অনেক সময় কঠোরতাও অবলম্বন করতে হয়। যেখানে কঠোরতা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ দাওয়াহর-ই একটি বৈশিষ্ট্য।

চলুন, মুসা ﷺ-কে যখন ফিরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল সেই ঘটনায় ফিরে যাই। আল্লাহ ﷻ বলছেন :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

'এবং তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হতে পারে সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।' (সূরা আত-ত্বহা, ৪৪)

অধিকাংশ মানুষ আলোচনার সময় এতটুকু বলেন। শেষ অংশটুকু তারা বলতে চান না। যখন ফিরাউন যখন উদ্ধত ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল, সে মুসা ﷺ-কে বলল :

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا

'হে মুসা, আমি তো মনে করি, তুমি জাদুগ্রস্ত।' (সূরা আল-ইসরা, ১০১)

উদ্ধত, দাম্ভিক ফিরাউন মুসা ﷺ-কে তাচ্ছিল্য আর বিদ্রুপ করছিল। মুসা ﷺ তখন কী বললেন? আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

'এবং তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হতে পারে সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।' (সূরা আত-ত্বহা, ৪৪)

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ তাঁকে বলেছেন হিকমাহ অবলম্বন করতে, নম্রতার সাথে তাকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করতে। কিন্তু ফিরাউনের এ কথার পর মুসা ﷺ কী বললেন? মুসা ﷺ উত্তর দিলেন :

وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

'এবং হে ফিরাউন, আমি তো দেখছি, তুমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছ (সমস্ত কল্যাণ থেকে দূরে সরে গিয়েছ)!' (সূরা আল-ইসরা, ১০২)

এখানে মাসবুরা (مَثْبُورًا) অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত, শাস্তিপ্রাপ্ত ও অভিশপ্ত। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'মাসবুরা' অর্থ অভিশপ্ত, মালউন, ملعون। মুসা ﷺ এখানে ফিরাউনকে বলছেন, 'তুমি অভিশপ্ত।' এটা ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মত। অন্যান্য মুফাসসিরিনের মতে মাসবুরা মানে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত। যেমন : মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, মাসবুরা মানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। অর্থাৎ, মুসা ﷺ ফিরাউনকে বলছেন, তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত হতে যাচ্ছ। আল-ফাররার মতে মাসবুরা মানে—এমন কেউ, যার মাঝে ভালো কোনো কিছু আর অবশিষ্ট নেই। লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ ফিরাউনের প্রতি মুসা ﷺ-কে নরম হতে বলেছিলেন, তবে দাওয়াহর হিকমাহর আরও একটি দিক আছে, যা অস্বীকার যাবে না।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো কোমলতার। সাধারণভাবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে নম্রতা, কোমলতা ও মমতার। দাওয়াহর মূল ভিত্তি ও মূলনীতি হলো নম্রতা, সবার কাছে সর্বোত্তম উপায়ে এ বার্তা পৌঁছে দেয়া। কিন্তু কঠোরতাও দাওয়াহর অন্তর্ভুক্ত। ব্যতিক্রম হলেও দাওয়াহর ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বনও ইসলামের অংশ। একমাত্র বিভ্রান্ত মর্ডানিস্ট ও তাদের অনুসারীরা এ সত্যকে অস্বীকার করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাওয়াহয় নম্রতা অবলম্বন করা হয়। আমাদের সামনে ফিরাউন ও মুসা ﷺ-এর ঘটনা আছে, নমরুদ ও ইব্রাহীম ﷺ-এর ঘটনা আছে, দুই বাগানবিশিষ্ট ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের ঘটনা আছে, আছে কারুন ও তার লোকেদের উদাহরণ। কুরআন ও হাদিসজুড়ে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। কিছু কিছু গল্প আগাগোড়া উদারতার আবার কিছু গল্পে প্রকাশ পেয়েছে কঠোরতা। আবার অনেক ক্ষেত্রে উদারতা ও কঠোরতার সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন : ফিরাউনের কাহিনি। মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালাম শুরুতে ফিরাউনের সাথে নম্রতা ও উত্তম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু শেষে মুসা ﷺ ফিরাউনকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

'এবং হে ফিরাউন, আমি তো দেখছি, তুমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছ (সমস্ত কল্যাণ থেকে দূরে সরে গিয়েছ)!' (সূরা আল-ইসরা, ১০২)

কেন তিনি এ কথা বললেন? কারণ, হিকমাহ মানেই উদারতা না। উদারতা দাওয়াহর মূলনীতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদারতাই নিয়ম। কিন্তু উদারতা দ্বারা হিকমাহকে সংজ্ঞায়িত করা

www.banglakitab.weebly.com

যাবে না। হিকমাহ হলো সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে, সঠিক কাজটি করা।

যে ব্যক্তি কালিমাতুশ শাহাদাহ (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) বিশ্বাস করে না, সে কাফির। কাফির মানে কাফিরই। আমি জানি না এটা নিয়ে সবার এত সমস্যা কেন। কয়েক দশক ধরে আমি এটা বোঝার চেষ্টা করছি কিন্তু আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। কাফিরকে কাফির বলতে সমস্যা কোথায়? কাফিররা তো আমাদের কাফির বলে। 'যিশু আল্লাহর পুত্র', এ কথা বিশ্বাস না করলে খ্রিষ্টানদের কাছে আপনি একজন অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসী মানে কাফির। তাহলে কাউকে কাফির বলতে সমস্যা কোথায়? আসলেই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। সমগ্র দুই শ্রেণিতে মানবজাতি বিভক্ত–মুমিন ও কাফির। অথচ উম্মাহর বিকিয়ে যাওয়া বিভ্রান্ত প্রতারকরা আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের মাঝে কেউ হয় কাফির আর কেউ হয় মুমিন।' (সূরা আত-তাগাবুন, ২)

মুমিন ও কাফির–মানবজাতি এই দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত। এই দুইয়ের মাঝে তৃতীয় কোনো শ্রেণি নেই। যখনই কেউ আপনাকে তৃতীয় কোনো কিছুর কথা বলবে, আপনি ধরে নেবেন সে হয় কোনো মূর্খ, নয়তো তার আকিদাহয় ত্রুটি আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা হয়ে থাকে।

অবিশ্বাসীরা কাফির, কিন্তু তাই বলে দাওয়াহর সময় আপনি কোনো খ্রিষ্টান বা ইহুদিকে বলতে যাবেন না—তুমি তো অবিশ্বাসী। আপনি তাকে গিয়ে বলবেন না—তুমি ইসলামে বিশ্বাস করো না, তুমি অবিশ্বাসী, তুমি কাফির। আপনি বলবেন না—এই! এই কাফির, এখানে আসো, আমি তোমাকে ইসলাম শেখাব। এটা দাওয়াহর সঠিক পদ্ধতি না। হ্যাঁ, সে অবশ্যই কাফির, কিন্তু এভাবে তো দাওয়াহ হয় না। তার কাফির হবার বিষয়টি নিয়ে তার সাথে তর্কে জড়াবেন না। সে যে কাফির, দাওয়াহ দেয়ার সময়ে তাকে এটা বলতে যাবেন না। আর তাকে এটা বলার কোনো দরকারও নেই। কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সে কাফির। এমনকি বিদআতিদের মাঝেও যারা জানতে আগ্রহী, যাদের সঠিক পথে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে, তাদের সাথেও নম্রতা অবলম্বন করতে হবে। আবার অনেকে আছে বিদআতের ব্যাপারে উদ্ধত ও একগুঁয়ে। সগর্বে, সদম্ভে তারা বিদআতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে বেড়ায়। যখন কেউ এমন স্তরে পৌঁছে যায়, নিজ জিহ্বাকেও সংযত করে না, তখন তার সাথে কঠোর হওয়া যেতে পারে। এদের মাঝে এমন অনেকে আছে যারা আল্লাহ ﷻ-এর শত্রুদের খুশি করার জন্য বর্তমান ও পূর্বসূরি নেককার ব্যক্তিদের ব্যাপারে, আল্লাহ ﷻ-এর অনুগত সত্যপন্থী বান্দাদের ব্যাপারে লাগামহীন কথাবার্তা বলে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। হ্যাঁ, বিদআতিদের সাথেও

www.banglakitab.weebly.com

কঠোর হওয়া যাবে, তবে তা অবশ্যই নির্ভর করবে অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের ওপর। যদি কেউ শিখতে চায়, আয়াত, হাদিস ও সালাফদের কথা মেনে নেয়, তবে তার সাথে কঠোরতার কী প্রয়োজন? এ ধরনের প্রতিটি পরিস্থিতি নিয়ে একজন দা'ঈর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, জানা দরকার খুঁটিনাটি। কখন কঠোর হতে হবে আর কখন উদার হওয়া যাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, আমরা সেই বিস্তারিত আলোচনায় এখন যাব না। তবে সব সময় মনে রাখতে হবে, দুটোই কিন্তু ইসলামে আছে।

এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য একটি প্রাথমিক রূপরেখা দেয়া। দাওয়াহর ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের অবস্থান হবে কোমলতার। কেবল কিছু ব্যতিক্রমের বেলায় কঠোরতার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তাই বলে সৎ কাজে উৎসাহ ও মন্দকে প্রতিহত করার জন্য কঠোরতা অবলম্বনকে কখনো অস্বীকার করা যাবে না। দাওয়াহর ক্ষেত্রে উদারতা ও নরমপন্থা অনুসরণের দলিল হিসেবে লোকে ফিরাউনের কাহিনির পাশাপাশি নূহ ﷺ-এর ঘটনাও উল্লেখ করে। তারা আপনাকে বলবে, নূহ ﷺ দাওয়াহ দিয়েছেন সাড়ে নয় শ বছর ধরে। এই সাড়ে নয় শ বছর ধরে তিনি কেবল দাওয়াহই দিয়ে গেছেন। তাই আমাদেরও তাঁর মতো ধৈর্যশীল ও নরম হতে হবে, আর কেবল দাওয়াহ আর দাওয়াহ চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

'আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।' (সূরা আল-আনকাবুত, ১৪)

নূহ ﷺ সাড়ে নয় শ বছর তার সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াহ করেছিলেন। দাওয়াহর ব্যাপারে তিনি নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করেছিলেন, এ সবই সত্য। কিন্তু ফিরাউনের কাহিনির মতো এখানেও অন্য একটি দিক আছে।

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

'আর হে আমার জাতি, আমি তো এ জন্য তোমাদের কাছে কোনো ধনসম্পদ চাচ্ছি না; আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। আর আমি তো বিশ্বাসীদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা নিজেদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। উপরন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।' (সূরা হুদ, ২৯)

নূহ ﷺ দীর্ঘদিন মমতার সাথে তাঁর কওমকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু আয়াতের শেষ অংশটিও লক্ষ করতে হবে। তিনি সাড়ে নয় শ বছর দাওয়াহ দিয়েছিলেন এটা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তাই বলে আমরা এই দাওয়াহর অন্য দিককে ভুলে যেতে পারি না। তার কওম

www.banglakitab.weebly.com

যখন বিশ্বাসীদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করছিল, তখন তিনি তাদের সম্বোধন করলেন নির্বোধ সম্প্রদায় বলে।

'নিশ্চয়ই তারা নিজেদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। উপরন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।' (সূরা হূদ, ২৯)

তিনি তাঁর কওমকে নির্বোধ সম্প্রদায় বললেন। অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ শব্দ ব্যবহার করলেন। ঠিক যেমন মুসা ﷺ ফিরাউনের সাথে নরম পন্থা দেখিয়েছিলেন, আবার তিনিই তাকে মাসবুরা বলেছিলেন; একইভাবে নুহ ﷺ-ও সাড়ে নয় শ বছর দয়া ও নম্রতার সাথে দাওয়াহ দিয়েছিলেন, কিন্তু একপর্যায়ে তিনি তাদের সম্বোধন করেছিলেন নির্বোধ সম্প্রদায় বলে।

ইব্রাহীম ﷺ-ও তাঁর কওম ও বাবার প্রতি সদয় আচরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বাবাকে বলেছিলেন :

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ۝ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا

'হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত কোরো না। নিশ্চয়ই শয়তান পরম দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করি, পরম দয়াময়ের আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে।' (সূরা মারইয়াম, ৪৪-৪৫)

বাবাকে 'ইয়া আবাতি' বলা খুবই মিষ্টি ডাক। এই ডাকের মাঝে আবেগ, ভালোবাসা, বিনয় ও শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর বাবার প্রতি সদয় ছিলেন, তাঁকে সত্যের পথে আনার চেষ্টা করছিলেন। বছরের পর বছর দাওয়াহ প্রদানে সবচেয়ে উত্তম উপায়ে মমতার দাওয়াহ করছিলেন, কিন্তু একসময় তিনিই তাঁর কওমের উদ্দেশে বলেছিলেন :

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'ধিক তোমাদের এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের! তবে কি তোমরা বুঝবে না?' (সূরা আল-আম্বিয়া, ৬৭)

উফফ (أف) শব্দটি এসেছে দুটো কিরাতে। প্রথমটি কিরাতে এসেছে উফফা (أُفَّ) হিসেবে, অর্থাৎ 'ফা' এর ওপরে ফাতাহ (যবর)। অন্য কিরাতে তানবিনের সাথে কাসরা (যের) যুক্ত হয়ে এসেছে, অর্থাৎ উফফিন (أُفٍّ) । দুটি ক্ষেত্রেই এর অর্থ দাঁড়ায় আল-কারাহিয়্যাহ ওয়াল-ইহতিকার (الكراهية والاحتقار) যার মানে হলো, অপছন্দ ও ঘৃণা।

'উফফ'–আমি ঘৃণা করি। লাকুম–তোমাদের। ইহতিকার অর্থ ঘৃণাভরে ত্যাগ করা। তাঁর দাওয়াহর একটি পর্যায়ে ইব্রাহীম ﷺ তার সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর হন। তিনি বলেন, ধিক তোমাদের ওপর! বাংলায় এর অনুবাদ করা হয়েছে ধিক, কিন্তু আরবিতে 'উফফ' এর মাধ্যমে

www.banglakitab.weebly.com

প্রকাশ পায়, কারাহিয়্যাহ ও ইহ্‌তিখার অর্থাৎ অপছন্দ ও ঘৃণা। এ অপছন্দ ও ঘৃণা কাদের প্রতি? তারা ও তাদের উপাস্যদের প্রতি।

'তবে কি তোমরা বুঝবে না?'

এটা কি দাওয়াহর ক্ষেত্রে কঠোরতা নয়? অবশ্যই। কঠোরতা দাওয়াহর-ই একটি অংশ। *মুসনাদে আহমাদের* একটি বর্ণনা আছে এবং এর কিছু অংশ *বুখারি-মুসলিমে* এসেছে। বর্ণনাটি হলো সুবাইয়াহ বিনতুল হারিস বিধবা হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। ইসলামি ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে বাচ্চা জন্ম দেয়ার ফলে তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে গেছে, যেহেতু তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং তার গর্ভের সন্তানের জন্ম হয়ে গেছে। অন্যান্য বিধবাদের মতো তাই তাকে আর চার মাস দশ দিন পূরণ করতে হবে না। চাইলে তিনি এখন বিয়ে করতে পারেন। একদিন আবু সানাবিল তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সুবাইয়াহর কাছ থেকে বা অন্য কোনোভাবে জানতে পেরেছিলেন যে সুবাইয়াহর সন্তান হয়েছে এবং তিনি বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আবু সানাবিল তাঁকে বললেন, পুরো চার মাস দশ দিন আপনাকে পূরণ করতে হবে। সুবাইয়াহ তার নিজের মতকে সঠিক মনে করলেন, আসলেও তা-ই ছিল। তার মত ছিল অন্তঃসত্ত্বা নারীর স্বামী মারা গেলে ওই নারীর জন্য ইদ্দত হলো তার সন্তান জন্মদানের সময় পর্যন্ত। আবু সানাবিল বললেন, না, আপনাকে চার মাস দশ দিন পূরণ করতে হবে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারের মতে, আবু সানাবিল তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু সুবাইয়াহ তাকে প্রত্যাখ্যান করায় আবু সানাবিল ইচ্ছে করে ইদ্দাতকাল বাড়িয়ে বলেছিলেন।[১১৯]

সুবাইয়াহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী বললেন? মনে রাখুন ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মাসজিদের কোনায় প্রসাব করা এক বেদুইনকে মমতাভরে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যিনা করতে ইচ্ছুক যুবককে কাছে ডেকে বুকে হাত রেখে বুঝিয়েছিলেন। এই একই ব্যক্তি ﷺ সুবাইয়াহ-এর কথার জবাবে বলেন,

كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ

আবু সানাবিল মিথ্যে বলেছে।[১২০]

আরেক বর্ণনায় এসেছে,

لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي

আবু সানাবিল যে রকম বলছে, ব্যাপারটা এমন নয়। তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। তুমি চাইলে এখন বিয়ে করতে পারো।

১১৯ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে সহিহুল বুখারির কিতাবুল মাগাযিতে (হাদিস নং : ৩৯৯০), সহিহ মুসলিমের কিতাবুত তালাকে (হাদিস নং :৩৭৯৫)। এ ছাড়াও সুনান ও মুসনাদের কিতাবাদিতে শাব্দিক ভিন্নতা-সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

১২০ *মুসনাদুশ শাফে'ঈ* : ৭৮২

www.banglakitab.weebly.com

নবি ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি মুক্ত, তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে, চাইলে বিয়ে করতে পারো। মাসজিদের কোনায় প্রস্রাব করা এক বেদুইনের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সদয় আচরণ করেছিলেন, তাকে আপন করে নিয়েছিলেন। অথচ সেই একই রাসূলুল্লাহ ﷺ আজ এক ব্যক্তির ব্যাপারে বললেন, সে মিথ্যাবাদী। কেন? কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন এই পরিস্থিতিতে এই ব্যক্তির ওপর কঠোর হওয়া দরকার। *মুসলিম, আবু দাউদ* ও *আন-নাসায়ি*তে এসেছে, এক ব্যক্তি বক্তব্য দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। সব খুতবাহর শুরুতে আমরা বলি যে,

مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى

'যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে-ই তো সুপথ পায়। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে, সে-ই তো বিভ্রান্ত হয়।'

কিন্তু, ومن يعصهما অর্থাৎ, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে' বলার পরিবর্তে তিনি বললেন, 'যে তাঁদের অবাধ্যতা করবে'।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথায় জবাবে বললেন,

«بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ. قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ»

তুমি তো একজন মন্দ খতিব! ('তাঁদের' পরিবর্তে) বলো যে, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে'।

কত সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখুন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কারণে তাকে মন্দ খতিব বললেন, 'তাঁদের' না বলে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল' বলতে বললেন। এই সামান্য ভুলের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি কঠোরতা দেখালেন, কারণ ওই ব্যক্তির এবং ওই পরিস্থিতির জন্য এটাই ছিল হিকমাহ।

অন্য বর্ণনায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قُمْ - أَوِ اذْهَبْ

ওঠো, বের হয় যাও।[১২১]

আর আমি প্রথমে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছি, সেখানে তিনি বলেছেন, بِئْسَ الْخَطِيبُ মন্দ খতিব।

জনসম্মুখে বক্তব্য দেয়ার সময় এ ধরনের কথা, বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে, যে কাউকে বিপর্যস্ত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। হয়তো এ ঘটনার পর আর কোনো দিন সে

১২১ *মুস্তাদরাক হাকিম*: ১০৬৫; *সুনান আবি দাউদ*: ১১০১

www.banglakitab.weebly.com

লোকসম্মুখে খুতবাহ না-ও দিতে পারে। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে তার সাথে এমন আচরণ করাই ছিল হিকমাহ। খুতবাহ দেয়ার সময়ে খতিব হিসেবে কিংবা জুমুআর সালাতে মুক্তাদি হিসেবে হাত ওঠানোর নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত সহিহ মুসলিমের হাদিসের উল্লেখ আমি আগেই করেছি। উমারাহ ইবনু রুআইবাহ ﷺ দেখলেন, বনু উমাইয়াহর এক নেতা মিম্বারে দাঁড়িয়ে হাত উত্তোলন করছে। উমারাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ ওই দুই হাতকে লাঞ্ছিত করুক, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনারে দাঁড়িয়ে কখনো এর বেশি করেননি (অর্থাৎ কেবল আঙুল ওঠাতেন)।' রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করার সময় আঙুল উঁচিয়ে ধরতেন। এখানে উমারাহ ﷺ অত্যন্ত কঠিন কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন—আল্লাহ ওই দুই হাতকে লাঞ্ছিত করুন। এই পরিস্থিতিতে কঠোর হওয়াই তাঁর কাছে সমীচীন মনে হয়েছে।

আবু আইয়্যুব ﷺ গেলেন সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমারের বিয়ের অনুষ্ঠানে। সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ছিলেন উমার ﷺ-এর নাতি। আবু আইয়্যুব ﷺ দেখলেন সালিমের ঘরের দেয়াল রঙিন পর্দা দ্বারা আবৃত। তিনি সালিমকে বললেন, এভাবে দেয়াল আবৃত করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করতেন কিন্তু তোমার ঘরের দেয়ালগুলো দেখছি পর্দা দিয়ে ঢাকা। উত্তরে সালিম বললেন, আপনি তো এখনকার নারীদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন, তারা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব গেড়ে বসেছে। তিনি অজুহাত দিতে শুরু করলেন, যেভাবে এখন অনেকে দেয়। আবু আইয়্যুব ﷺ বসতে অস্বীকৃতি জানালেন, অনুষ্ঠান থেকে চলে গেলেন।[১২২] অধিকাংশ আলিমের মত হচ্ছে, বিয়ের দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব, কিন্তু রঙিন পর্দা দিয়ে দেয়াল ঢেকে রাখার কারণে তিনি বিয়ের আসর থেকে চলে গেলেন। ভুল শোধরানোর জন্য বিয়ের অনুষ্ঠান ফেলে চলে আসাটা কিন্তু কঠোর আচরণ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আবু আইয়্যুব ﷺ ছিলেন বিখ্যাত সাহাবিদের একজন।

ইবনু উমার ﷺ একবার জানাযায় গেলেন। জানাযার সুন্নাহ হলো দ্রুত হাঁটা। খাটলি বহন করার সময়ে আপনি আর-রামিল করবেন। দ্রুত পায়ে হাঁটাকে আরবিতে আর-রামিল (الرمل) বলা হয়। ইবনু উমার ﷺ লোকদের বলছিলেন যে, লাশ আমাদের কাঁধে, কাজেই দ্রুত হাঁটতে হবে। তিনি বললেন, যদি তোমরা দ্রুত পা না চালাও, আর-রামিল না করো, তবে আমি আর এখানে থাকব না, চলে যাব। আস্তে হাঁটার কারণে জানাযা ছেড়ে চলে যাবার কথা বলা, নিঃসন্দেহে কঠোরতা। কিন্তু কেন তিনি এমন করেছিলেন? কারণ, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মনে হয়েছিল তাদের সাথে এমনই আচরণ করা উচিত।

চলুন, উল্লিখিত শেষ দুটো পয়েন্ট থেকে সারসংক্ষেপ বের করা যাক। দাওয়াহ এবং আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনি ওয়াল মুনকার-এর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো উদারতা, যথাসম্ভব কোমল হওয়া। এ ব্যাপারে বেশ কিছু আয়াত ও কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে কখনো কখনো কঠোরও হতে হয়। বিষয়টিকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না, এটা দাওয়াহর হিকমার অংশ। কিন্তু মর্ডানিস্ট ও সমমনারা একে অস্বীকার করতে খুব পছন্দ

১২২ তাবারানি, *মু'জামুল কাবির* : ৩৮৫৩; আসকালানি, *ফাতহুল বারি* : ২৫/৪৫৪

www.banglakitab.weebly.com

করে। কখন, কোথায়, কোন পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে, কোন ধরনের লোকের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, তা নির্ভর করে ওই ঘটনা, সংশ্লিষ্ট মানুষ ও প্রেক্ষাপটের ওপর। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনেক লম্বা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাওয়াহর মূলনীতি হবে উদারতা ও দয়া।

মুদারাহ ও মুদাহানাহর মধ্যে পার্থক্য :

মুদারাহ (مُدَارَاة) হলো দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে ত্যাগ করা। দাওয়াহ করার সময় হয়তো আপনাকে অপমান করা হবে, কিন্তু সেটা আপনাকে মেনে নিতে হবে। অপমান সত্ত্বেও কথা বলার সময় সবচেয়ে ভালো শব্দটিকে বেছে নিতে হবে। নিজের গর্ব ও আত্মাভিমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নিজের সাথে লড়াই করে। আঘাত সহ্য করতে হবে, এসবের মোকাবেলা করতে হবে সুন্দর আখলাক দিয়ে। দাওয়াহ করতে গিয়ে অনেক সময় এমন পরিস্থিতিতে আপনি পড়বেন যেখানে তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে সুন্দর কথা বলতে হবে। এ সবই মুদারাহ এবং মুদারাহর এমন অনেক উপায় আছে।

আর অন্য একটি ব্যাপার আছে যা করা যাবে না, যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে, আর তা হলো–মুদাহানাহ (مُدَاهَنَة)। আমরা অনেকে এ সম্পর্কে জানি না। মুদাহানাহ আর মুদারাহ সম্পূর্ণ বিপরীত। মুদারাহ হলো দ্বীনের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করা, আর মুদাহানাহ হলো দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে বিসর্জন দেয়া। মনে রাখবেন, কোনো অবস্থাতেই আমরা ইসলামের ব্যাপারে আপস করতে পারি না। যার সাথে কথা বলছি, যাকে দাওয়াহ দিচ্ছি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করতে বা এর বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে আমরা পারি না। কোনো সরকার, নেতা কিংবা পশ্চিমা বিশ্বের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারি না। কোনো অবস্থায় এটা করা যাবে না। এমন করাই মুদাহানাহ। আমরা মুদাহানাহ করি না; বরং মুদারাহ করি। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

'তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।' (সূরা আল-কালাম, ৯)

দ্বীন ও দা'ঈর উদাহরণ হলো পাত্র ও পানির মতো। পানি যদি কাপে রাখেন, তাহলে কাপের আকার ধারণ করবে। যদি ফুলদানিতে রাখেন, তাহলে ধারণ করবে ফুলদানির আকার। যখন যে পাত্রে রাখা হয় পানি সেটার আকার ধারণ করে। পানি প্রয়োজন অনুযায়ী বদলায়। কিন্তু পাত্র–কাপ ও ফুলদানি–মজবুত। দ্বীনের মূলনীতিগুলো ঠিক এমনই। এগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না, এগুলো নিয়ে দর কষাকষিতে যাওয়া যায় না। কিন্তু পানি আকার বদলে নেয়। মানুষের সাথে আমাদের আচরণের ব্যাপারটা হবে এই পানির মতো। আচরণের ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে সবচেয়ে কোমল ও উত্তম পদ্ধতি, সর্বোত্তম আদব। তবে দ্বীনের মূলনীতিগুলো থাকবে অপরিবর্তিত।

www.banglakitab.weebly.com

সালাফদের দাওয়াহর উদাহরণ :

দাওয়াহর ক্ষেত্রে সালাফ আস-সালিহিনের উদাহরণ দেখুন। ইসলাম গ্রহণ করার পর কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবু বকর ﷺ তাঁর দাওয়াহর মাধ্যমে পাঁচজন সাহাবিকে ইসলাম কবুল করালেন। এই পাঁচজন ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির অন্তর্ভুক্ত—উসমান ইবনু আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস এবং তালহা ইবনু উবায়দিল্লাহ ﷺ। ইসলাম প্রচারের পুরস্কার আর ফযিলত সম্পর্কে এ সময় আবু বকর ﷺ-এর কতটুকুই বা ধারণা ছিল? এ সময় তিনি শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' জানতেন, আর এই কালিমার দিকেই দাওয়াহ দিচ্ছিলেন। ইসলামের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর দাওয়াহয় আশায়ারা মুবাশ্শারার অন্তর্ভুক্ত পাঁচজন সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদের ইসলামে আনার পুরস্কার ও ফযিলত-সংক্রান্ত নানা হাদিস এখন আমরা জানি, কিন্তু এটা ছিল ইসলামের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়। এই হাদিসগুলো সম্ভবত তখন ছিল না কিন্তু আবু বকর ﷺ উপলব্ধি করেছিলেন ইসলামই তাঁর জীবন ও লক্ষ্য। ইসলাম জীবন ও লক্ষ্যে পরিণত হলে আপনি অবশ্যই এ নিয়ে কথা বলবেন। একে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, এর দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন। এই বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আবু বকর আস-সিদ্দিক ﷺ অন্যদের আহ্বান করেছিলেন এই সত্য দ্বীনের দিকে। আর এ কারণেই পুরো উম্মাহর ঈমানের চেয়ে আবু বকর ﷺ-এর ঈমান বেশি, কারণ আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছায় আমাদের পূর্বপুরুষদের তিনি ইসলামে এনেছিলেন। আসলে আমাদের সবার ইসলামের পেছনে তাঁরই অবদান, বড় বড় সাহাবিদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে অবদান তাঁরই।

আবু বকর ﷺ-এর দাওয়াহয় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এই উম্মাহর বিখ্যাত পূর্বপুরুষগণ। আর আবু বকর ﷺ ইসলাম কবুল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াহর কারণে। তিনি দাওয়াত কবুল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বার্তার প্রতি তাঁর অগাধ সমর্থন ও বিশ্বাসের কারণে। এ কারণেই আবু বকর ﷺ এত বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ঈমানও ছিল বেশি, তাঁর দ্বীনও ছিল উত্তম। তাঁর দাওয়াহয় ইসলাম কবুল করেছিলেন উসমান ﷺ। পরবর্তীকালে উসমান ﷺ ইসলামের তৃতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। উম্মাহর জন্য উসমান ﷺ এত বেশি কল্যাণকর কাজ করে গিয়েছেন যে, বলতে গেলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাবে। এই সব সওয়াবের ভাগীদার কে হবে? উসমান ﷺ এই সাওয়াব পাবেন আর যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু বকর ﷺ-এর দাওয়াহয় তাই সমপরিমাণ সাওয়াব আবু বকর ﷺ-ও পাবেন।

আবদুর রহমান ইবনু আউফ ﷺ ও তাঁর অবদানের দিকে তাকান। আপনারা সবাই জানেন দ্বীন ইসলামের কল্যাণে আব্দুর রহমান ইবনু আওফ ﷺ-এর অসংখ্য অমূল্য অবদান আছে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু বকর ﷺ-এর দাওয়াহয়। মদীনা থেকে ইসলামকে ইরাক ও পারস্যের ছড়িয়ে দেয়া সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু

www.banglakitab.weebly.com

বকর ﷺ-এর দাওয়াহয়। সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﷺ যেসব স্থানে ইসলামের আলো পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেখানকার কোটি কোটি মুসলিমের সাওয়াব তাঁর আমলনামায় যুক্ত হচ্ছে। এবং এই সব সাওয়াব যুক্ত হচ্ছে আবু বকর ﷺ-এর আমলনামায়। হাদিসে আছে :

« مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ »

যে ব্যক্তি কাউকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, তবে সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।[১২৩]

দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে পাঁচজন তাঁর মাধ্যমে ইসলাম কবুল করেছিলেন। তিনি বিলাল ﷺ-কেও ইসলামে প্রবেশ করিয়েছিলেন। চিন্তা করে দেখুন, বিলাল ﷺ-এর মর্যাদা, ত্যাগ ও অর্জন কত ব্যাপক। বিলাল ﷺ-এর যত সাওয়াব আবু বকর ﷺ-ও তার সমান সওয়াবের অধিকারী হবেন। কবরে তাঁর আমলনামায় এসব সাওয়াব যুক্ত হচ্ছে।

তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাওসি ﷺ ছিলেন তাঁর গোত্রের নেতা। মক্কা আসার পর কুরাইশরা তাঁকে বারবার সতর্ক করে দিলো যেন তিনি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে না যান। তারা জানত তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন কবুল করলে তবে দেখাদেখি তাঁর গোত্রও ইসলাম কবুল করবে। তাঁর সাথে কুরাইশদের চুক্তি ছিল, ব্যবসা ছিল। তারা চাচ্ছিল না চুক্তিতে কোনো ফাটল ধরুক বা এর ওপর কোনো প্রভাব পড়ুক। কিন্তু তুফাইল ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনি বেশ দীর্ঘ। আমরা এখানে সেই আলোচনায় যাচ্ছি না, কিন্তু দেখুন ইসলাম কবুল করার পর তিনি কী করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি নিষ্ক্রিয় সন্তুষ্টিতে ডুবে যাননি। তিনি বলেননি, অমুক গোত্রের নেতা হয়েও আমি ইসলাম কবুল করেছি। ব্যস, এই তো যথেষ্ট! এটি একটি সর্বজনবিদিত ও সাধারণ উপলব্ধির ব্যাপার যে, আপনি যখন সত্যিকার অর্থে কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হবেন তখন আপনি সবার মাঝে একে ছড়িয়ে দিতে চাইবেন। তাই ইসলাম গ্রহণ করামাত্রই তিনি ছুটে গেলেন তাঁর বাবা ও নিজ গোত্রের কাছে। তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। তাঁর বাবা তাঁকে বললেন,

'তোমার দ্বীন-ই আমার দ্বীন।'[১২৪]

তারপর তিনি গেলেন তার পরিবারের কাছে। একে একে তারাও ইসলাম কবুল করে নিল। তাঁর দাওয়াহর কারণে তাঁর গোত্রের যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তাঁদের একজন ছিলেন আবু হুরাইরা ﷺ। হাদিসের ভান্ডার, বহু ফযিলতের অধিকারী, আবু হুরাইরা ﷺ। হাদিস পড়তে গেলে কতবার তাঁর নাম উচ্চারণ করতে হয়? যতবার আবু হুরাইরা ﷺ-এর কাছ থেকে বর্ণিত হাদিস আমরা পড়ি, আমরা বলি 'রাদিয়াল্লাহু আনহু'। এভাবে যতবার আবু হুরাইরা ﷺ-এর জন্য দুআ করা হচ্ছে ততবার দুআ যোগ হচ্ছে তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাওসি ﷺ-এর জন্যও। তাঁর গোত্রের নাম ছিল দাওস, তাদের ইসলামের পথে আনতে

১২৩ *সহিহ মুসলিম* : ৫০০৭
১২৪ যাহাবি, *সিয়ারু আলামিন নুবালাহ* : ১/৩৪৬

www.banglakitab.weebly.com

তাঁকে বেশ কঠিন সময় পার করতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার গোত্রের লোকদের জন্য দুআ করুন, আমার ইচ্ছা আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন,

اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا

‘হে আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দিন।’[১২৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও, দাওয়াহ দিতে থাকো।’ তিনি ফিরে গিয়ে আবারও তাদের মাঝে দাওয়াহ করতে শুরু করলেন, এবার তারা খুব সহজেই দাওয়াহ কবুল করে নিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন তাঁর গোত্রের প্রায় আশি অথবা নব্বইটি দলসহ। তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে কালিমা শাহাদাহ পাঠ করল, তাঁকে বাইয়াহ্ দিলো। সেদিন থেকে শুরু করে মক্কা বিজয়ের শেষ বছরগুলো পর্যন্ত তুফাইল رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেই থেকে গেলেন।

দাওস গোত্রের বসবাস ছিল আজকের দক্ষিণ সৌদিতে। বর্তমানে সেখানে বসবাস করা গোত্রগুলো মূলত যাহরান নামে পরিচিত, আর তাদের পাশেই হলো গামিদ গোত্র। যাহরান ও গামিদ গোত্রের শত শত আলিম আজ আমাদের মাঝে আছেন। ক্বারি সাদ আল-গামিদিকে আপনারা প্রায় সবাই চেনেন। আত-তুফাইল رضي الله عنه যে শহরে ছিলেন, তার পার্শ্ববর্তী শহরেই তিনি বাস করেন। আত-তুফাইল رضي الله عنه এখন কবরে শায়িত, কিন্তু প্রায় তেরো শতাব্দী পরেও তিনি এই বিখ্যাত ক্বারি এবং গামিদ ও জাহরান গোত্রের শত শত আলিমের জন্য সাওয়াবের অধিকারী হচ্ছেন। তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাওসি رضي الله عنه কবরে শায়িত থেকে সাওয়াব পাচ্ছেন, আবার এই একই পরিমাণ সাওয়াব কার আমলনামায় যুক্ত হচ্ছে? অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলনামায় যুক্ত হচ্ছে। কল্যাণময় দাওয়াহর ফযিলত ও পুরস্কারের বিষয়টি একটি চেইন রিঅ্যাকশানের মতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নাপিতের দোকানে গেলেন, তাকে দাওয়াহ দিলেন। এর ফলে ছয়জন কিশোর ইসলাম কবুল করল। পরের বছর এই ছয়জন কিশোর সাথে করে নিয়ে এল আরও বারোজনকে। বারোজন পরের বছর সঙ্গে নিয়ে এল তিহাত্তরজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে। তার পরের বছর তাঁদের ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য মুসআব ইবনু উমাইর رضي الله عنه-কে رضي الله عنه পাঠানো হলো মদীনাতে। কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মুসআব رضي الله عنه বার্তা পাঠালেন, মদীনা ইসলাম কবুল করেছে, আপনি এখানে চলে আসতে পারেন। পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নাপিতের দোকানের ছয়জন কিশোরের দাওয়াহ গ্রহণ করার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপিতের দোকানেও গিয়েও দাওয়াহ পৌঁছে দিয়েছিলেন, যার ফসল ছিল ইসলাম মদীনা পর্যন্ত প্রসার লাভ করা। সেই দিনের সেই কিশোরেরা উপলব্ধি করেছিলেন তাদের অবশ্যই

১২৫ *সহিহুল বুখারি* : ২৯৩৭; *সহিহ মুসলিম* : ৬৬১১

www.banglakitab.weebly.com

এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক গোপন বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাওহিদের এই বার্তাকে তাঁরা আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। সংকল্প করেছিলেন এই দাওয়াহ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার।

আফ্রিকাতে ইসলামের বীজ বোনা হয়েছিল আবিসিনিয়ায়, জাফর ইবনু আবি তালিব ﵁-এর দাওয়াহর মাধ্যমে। তিনি সেখানে হিজরত করেছিলেন। ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন নাজ্জাশির কাছে। এভাবেই আফ্রিকায় ইসলামের সূচনা। তার মানে আফ্রিকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রায় সব মুসলিমের সাওয়াব জাফর ইবনু আবি তালিব ﵁-এর আমলনামাতে লেখা হবে। ইয়েমেনে ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে গিয়েছিলেন আবু মুসা আল-আশআরি ও মুয়ায ইবনু জাবাল ﵄। এখানে আমরা যাদের নাম বললাম, জাফর ইবনু আবি তালিব, মুয়ায ইবনু জাবাল ﵄-সহ তাঁরা সবাই ছিলেন তরুণ, তাঁদের সবার বয়স ছিল ২০-এর ঘরে।

সূরা ইয়াসিনে বর্ণিত সেই মুমিনের কথা আপনাদের প্রায় সবারই জানা আছে। ইয়াসিনের কমবেশি ষোলোটি আয়াতে তাঁর ঘটনার কথা এসেছে। তিনি কে ছিলেন, যাকে নিয়ে কুরআনের ষোলোটি আয়াতজুড়ে একটি কাহিনি বিবৃত হলো?

আল্লাহ ﷻ বলেন :

> 'আমি ওদের কাছে দুজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদের তৃতীয় একজন দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম। এবং তারা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' ওরা বলল, 'তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ আর পরম দয়াময় তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।' রাসূলরা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।' ওরা বলল, 'আমরা তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি স্পর্শ করবে।' তারা বলল, 'তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই! এটা কি এ জন্য যে, আমরা তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি? বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" (সূরা ইয়াসিন, ১৪-১৯)

তারা মনে করল, আল্লাহ ﷻ-এর প্রেরিত রাসূলগণ তাদের জন্য অমঙ্গলের কারণ। রাসূল দুজনকে তারা হুমকি দিলো। তাঁদের পাথর মারা হবে, নির্যাতন করা হবে। এ অবস্থায় মুমিন লোকটি নিষ্ক্রিয় বসে থেকে নিরাপত্তা আর সুবিধার জীবন বেছে নিল না। এটি তো আমার দেখার বিষয় না, বলে এড়িয়ে গেল না। সে কী করল? আল্লাহ ﷻ বলেন :

> 'নগরীর এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, রাসূলদের অনুসরণ করো। অনুসরণ করো তাঁদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কামনা করে না এবং যারা সুপথপ্রাপ্ত। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত

www.banglakitab.weebly.com

হবে, আমি তাঁর ইবাদত করব না কেন? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করব? পরম দয়াময় যদি আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না। এরূপ করলে আমি অবশ্যই প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে পড়ব। আমি তো তোমাদের প্রতিপালকে বিশ্বাসী, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো।" (সূরা ইয়াসিন, ২০-২৫)

এসব অন্যায় হচ্ছে জানতে পেয়ে, নেককার হিসেবে পরিচিত মানুষটি শহরের প্রান্ত থেকে ছুটে আসলেন। তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। কিন্তু মৃত্যুর পর পরকালীন জীবনেও তাঁর অন্তর যুক্ত ছিল দাওয়াহর সাথে। জান্নাতের পুরস্কার পাবার পরও তাঁর অন্তর উন্মুখ হয়ে ছিল তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বাঁচাতে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

'(যখন তারা তাঁকে হত্যা করল এবং তার মৃত্যুর পর তাঁকে বলা হলো, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।' সে বলল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!" (সূরা ইয়াসিন, ২৬-২৭)

আখিরাতের জীবনেও তাঁর অন্তর লোকদের বাঁচানোর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁর আক্ষেপ–যদি শহরের লোকদের জানাতে পারতেন যে আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, স্থান দিয়েছেন সম্মানিতদের কাতারে! সম্ভবত এ ইচ্ছার কারণ হলো, এই সম্মানিত অবস্থার কথা জানলে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এ সম্মানের অধিকারী হতে চাইবে এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তিনি আফসোস করছেন–আমি যদি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারতাম, তাদের দাওয়াহ দিতে পারতাম, সব জানাতে পারতাম! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হলো। এমন অবস্থাতেও তিনি দাওয়াহর কথা চিন্তা করছেন। এভাবেই দাওয়াহ কারও কারও বেলায় জীবনের একটি অংশে পরিণত হয়। রাসূলগণ, সাহাবা এমনকি কোনো মানুষের উদাহরণও যদি আপনাকে দাওয়াহর কাজে অনুপ্রাণিত করতে যথেষ্ট না হয়, তাহলে জিনদের উদাহরণ দেখুন। জিনরাও দাওয়াহ করে, এতে তারা বেশ মজবুত। যখন জিনদের একটি দল ইসলাম কবুল করেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করেছিল, তখন কি তাঁরা চুপচাপ বসেছিল? দেখুন, কুরআনে আল্লাহ ﷻ তাঁদের ব্যাপারে কী বলছেন। তাঁরা বলেছিল :

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন ও তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন।' (সূরা আল-আহকাফ, ৩১)

ঈমান আনার সাথে সাথে জিনরা ছুটে গিয়েছিল তাওহিদের দাওয়াহ পৌঁছে দিতে। জিনরাও

www.banglakitab.weebly.com

দাওয়াহর কাজে আগ্রহী। যদি রাসূলগণ, সাহাবা, জিনরাও দাওয়াহর কাজে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট না হয়, তবে পশুপাখিদের দিকে তাকান। কুরআনে বর্ণিত হুদহুদ পাখির ঘটনার দিকে তাকান। সুলাইমান ﷺ তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নিতে। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন একটি পাখি অনুপস্থিত। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

'সুলায়মান পক্ষীকুলকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং বললেন, 'কী ব্যাপার! আমি হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই ওকে কঠোর শাস্তি দেবো কিংবা জবাই করব।' (সূরা আন-নামল, ২০-২১)

ফিলিস্তিন থেকে ইয়েমেনে গিয়ে হুদহুদ আবার ফিরে এল ফিলিস্তিনে। সে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করল। দাওয়াহর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সেনাবাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করতে তার দেরি হয়ে গেল। পাখিটি বলল :

أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

'...আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত এক সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।' (সূরা আন-নামল, ২২)

সে দাওয়াহর মিশন নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাই সে বলল, সুলাইমান ﷺ আপনি জানেন না, আমি এমন এক বিষয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছি।

সে কী সংবাদ এনেছিল?

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

'আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করছে। শয়তান ওদের দৃষ্টিতে ওদের কার্যাবলিকে সুশোভিত করেছে এবং ওদের সৎ পথ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে ওরা সৎ পথ পায় না। (সুশোভন করেছে এই জন্য যে,) যাতে ওরা আল্লাহকে সিজদাহ না করে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তুকে প্রকাশ করেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন করো

www.banglakitab.weebly.com

ও যা তোমরা প্রকাশ করো। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের অধিপতি।' (সূরা আন-নামল, ২৩-২৬)

সেই নারী ও তার সম্প্রদায় সূর্যের ইবাদত করত। অথচ তাঁদের জন্য ফরয মহান আরশের অধিপতি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করা। তাদের শিরকে লিপ্ত দেখে পাখিটি আর চুপ থাকতে পারেনি।

দাওয়াহ ইলাল্লাহর ব্যাপারে উপসংহার :

আসল ফুল আর প্লাস্টিকের নকল ফুল কখনো এক হয় না। বাড়িতে একটি তাজা ফুল এনে রাখুন, দেখবেন তা ঘরের শোভাবর্ধন করছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার মিষ্টি সৌরভ। প্লাস্টিকের ফুল সুন্দর হলেও কেবল নামেই ফুল। যে মুসলিম দাওয়াহর কাজের সাথে সম্পৃক্ত না, যে ভালো কাজে উৎসাহ ও অন্যায় কাজে বাধা দেয় না, সে যদিও মুসলিম এবং দেখতে সুন্দর—কারণ, সব অবস্থাতেই মুসলিমের মধ্যে কল্যাণ থাকে—কিন্তু তার উদাহরণ হলো সেই প্লাস্টিকের ফুলের মতো। আর দাওয়াহ কাজের সাথে সম্পৃক্ত, ভালো কাজের নির্দেশ ও অন্যায়ে বাধা দেয়া মুসলিম চারপাশকে সুরভিত করা সেই তরতাজা আকর্ষণীয় ফুলের মতো।

নিজেকে দাওয়াহর কাজে নিযুক্ত করা, এই দায়িত্বকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়া মুমিনের উদাহরণ হলো প্রবাহিত পানির মতো। স্থির পানির চেয়ে প্রবহমান পানি বিশুদ্ধ। কোনো বদ্ধ জলাশয়ে থাকা স্থির পানির বেলায় কী ঘটে? কিছুদিন তা পরিষ্কার থাকে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেটা দূষিত হয়ে যায়। সেটা পুকুর, খাল এমনকি এরচেয়েও বড় কিছু হোক না কেন। কিন্তু প্রবাহিত পানির বেলায় ব্যাপারটা ভিন্ন। প্রবাহিত পানি সমুদ্রে গিয়ে মেশে, আর সমুদ্রের পানি তো আরও বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ। আপনি যদি অন্যায় কাজে বাধা না দেন, ভালো কাজের উপদেশ না দেন, দাওয়াহর কাজ না করেন, তাহলে আপনার অবস্থা ওই স্থির পানির মতো—যা একটা সময় পার হবার পর দূষিত হয়ে যেতে পারে।

দাওয়াহর কাজে কোনো নিরপেক্ষ অবস্থান নেই, বিশেষ করে যারা পশ্চিমে বসবাস করছে তাদের জন্য। এই মূলনীতিটি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করুন, দাওয়াহর ক্ষেত্রে কোনো নিরপেক্ষ অবস্থান নেই। আপনার এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, আমি নিজেকে এসবে জড়াব না, আমি আমার মতো থাকব। আপনাকে হয় দাওয়াহ দিতে হবে, নয়তো আপনার ঈমান আক্রান্ত হবে। আবদ্ধ পানি ময়লা হবেই, বিশেষ করে আজকের পরিস্থিতিতে। কাজেই নিজেকে প্রবাহিত পানির মতো বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করে তুলুন মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করার মাধ্যমে। একজন মুমিন কখনো তার দ্বীন নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, সে সব সময় চাইবে তার দ্বীনকে ছড়িয়ে দিতে। কেনই বা চাইবে না? এ তো এক মহান দায়িত্ব, আর এই দায়িত্ব দিয়েই যুগে যুগে পাঠানো হয়েছে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের।

www.banglakitab.weebly.com

দারস ১০

উসুল আস-সালাসাহ্ বইয়ের শুরুতে উল্লেখিত চারটি বুনিয়াদি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। প্রথমটি ছিল ইলম ও এর সংজ্ঞা। দ্বিতীয়টি ইলমের প্রয়োগ। তৃতীয়টি ইলমের প্রচার ও প্রসার তথা দাওয়াহ ইলাল্লাহ। এবার আমরা আলোচনা করব চতুর্থ বিষয়টি নিয়ে।

চতুর্থ বুনিয়াদি বিষয় : সবর

চতুর্থ বিষয়টি হলো সবর। লেখক বলেছেন,

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : الصَّبْرُ على الأذى فِيْهِ

চতুর্থ বিষয় : দাওয়াহর কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে সবর করা।

ইলম অর্জনের জন্য অবশ্যই সবর অবলম্বন করতে হবে। ধৈর্যধারণ করতে হবে ইলম অর্জন ও একে বহনের জন্য। সবর না করার কারণেই অধিকাংশ মানুষ ইলম অর্জনের পথে টিকে থাকতে পারে না। 'গারিবুল হাদিস' সংকলনটি লেখার পেছনে আবু উবাইদ ﷺ চল্লিশটি বছর ব্যয় করেছিলেন। ইবনু আব্দিল বার ﷺ তাঁর কিতাব আত-তামহিদ রচনা করতে সময় নিয়েছিলেন তিরিশ বছর। আমাদের সবার মুখে মুখে ফাতহুল বারির কথা শোনা যায়, এটি লিখতে ও রিভাইস করতে ইবনু হাজার ﷺ-এর দীর্ঘ তেইশ বছর সময় লেগেছিল। সুতরাং ইলম অর্জন ও একে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের। আবার আমলের ক্ষেত্রে এবং মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করার বেলাতেও ধৈর্য প্রয়োজন । সব ক্ষেত্রে সবরের প্রয়োজন আছে, তবে লেখক এখানে বিশেষভাবে দাওয়াহর ব্যাপারে সবরের কথা বলেছেন। তিনি বিশেষভাবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের কথা বলেছেন। কারণ, সাধারণত মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করতে শুরু করলে বিপদও আসতে শুরু করে। একজন দা'ঈ মানুষকে আহ্বান করেন নফসের শেকল থেকে মুক্তি ও নিজের সংশোধনের দিকে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কিছু কিছু জাহিলি, শয়তানি প্রথা অনেক সময়

www.banglakitab.weebly.com

মানুষের জীবনের অংশে পরিণত হয়। এগুলো যেন মিশে যায় তাদের রক্ত-মাংসে। একজন দা'ঈ মানুষকে আহ্বান করেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এসব প্রথা ও রীতিনীতি ত্যাগ করে আল্লাহ ﷻ-এর শারীয়াহর সীমারেখা মেনে চলার দিকে। এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। অনেক সময় দেখা যায়, যাদের দাওয়াহ করা হচ্ছে তারা এই কথাগুলো প্রথমবারের মতো শুনছেন। আর যেহেতু মানুষের জন্য নিজেকে পরিবর্তন করা খুব কঠিন তাই প্রাথমিক পর্যায়ে তারা দাওয়াহর প্রবল বিরোধিতা করে, দাওয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে, প্রতিহত করতে শুরু করে। আর আক্রমণের নিশানা বানায় বার্তাবাহককে। একজন দা'ঈকে দুটো পথের একটিকে বেছে নিয়ে হয়—হয় আমি দাওয়াহর কাজ বাদ দিয়ে দেবো অথবা আমি ইসলামের কিছু দিক বাদ দেবো। আসলে যেকোনো সত্যিকারের মুসলিমের জন্যই কথাটা প্রযোজ্য। কিন্তু কোনো মুমিনের পক্ষে এটা আদৌ সম্ভব না। অন্যের হাসি-তামাশা কিংবা ঠাট্টার কারণে কেউ হিজাব, নিকাব, দাড়ি বা সালাত ছেড়ে দেবে, তা হতে পারে না। একই কথা প্রযোজ্য দাওয়াতি কাজের বেলাতেও। প্রতিকূলতার কারণে দাওয়াহ ছেড়ে দেয়া কোনো সমাধান নয়।

*সুনানুত তিরমিযি*তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

> দাওয়াহর উদ্দেশ্যে কোনো মুমিন ব্যক্তি যদি লোকজনের সাথে ওঠাবসা করে, তাদের দ্বারা কোনো অনিষ্ট হলে তাতে সবর করে, তবে সে ওই মুমিন থেকে উত্তম যে তার ঘরে একাকী থাকে এবং মানুষের অনিষ্টে সবর করতে পারে না।[১২৬]

কাজেই দাওয়াহর পথে যে বিপদ আসে, যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধান নিহিত সবরে।

সবর একজন দা'ঈর অপরিহার্য গুণ

ধৈর্য সবারই দরকার। কিন্তু দাওয়াহর সাথে জড়িত ব্যক্তি, কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বানকারীর জন্য সবরের প্রয়োজন বিশেষভাবে। সবর হলো দা'ঈর অন্তরের উজ্জ্বলতা, যা কখনো ম্লান হয় না। সবর হলো দা'ঈর জন্য (جواد لا يكبو)—এমন এক দ্রুতগামী অশ্ব যা কখনো হোঁচট খায় না। এ হলো দা'ঈর (جند لا يهزم)—অপ্রতিরোধ্য সেনাদল, (حصن لا يهدم)—এক অভেদ্য দুর্গ।

দ্বীন মেনে চলা মুমিন হিসেবে, একজন দা'ঈ হিসেবে আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। নিঃসন্দেহে মুমিনমাত্রই দ্বীন মানলেওয়ালা (Practicing) হতে হবে, কিন্তু আজ উম্মাহর

১২৬ *মুসনাদু আহমাদ*: ৫০২২; *আদাবুল মুফরাদ*: ৩৮৮

www.banglakitab.weebly.com

পরিস্থিতি এতটা দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের আলাদাভাবে Practicing Muslim বা 'দ্বীন মেনে চলা' মুসলিম কথাটি বলতে হচ্ছে।

সবরের প্রতিদান

সবর এক অভেদ্য বর্ম ও ঢাল; একজন সৈনিকের যেমন বর্ম, হেলমেট ও বুলেটপ্রুফ ভেস্ট থাকে, একজন দা'ঈর জন্য সবর ঠিক তেমন। যোদ্ধা যেভাবে বর্ম আর ঢালকে ব্যবহার করে, দা'ঈ সেভাবে সবরকে ব্যবহার করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

'কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না।' (সূরা আলি ইমরান, ১২০)

সবরকারীদের জন্য এটি অত্যন্ত সম্মানজনক বিষয় যে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৩)

মায়িয়্যাহ (معية –আল্লাহর সান্নিধ্য) দুধরনের। প্রথম প্রকার হলো, মায়িয়্যাতু আম্মাহ (معية عامة) –সাধারণ বা সর্বজনীন অর্থে আল্লাহ ﷻ-এর সান্নিধ্য। এ মায়িয়্যাহ হলো আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞানের মাধ্যমে সান্নিধ্য, কারণ সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞানের আওতাধীন। দ্বিতীয় প্রকারের সান্নিধ্য হলো আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ, সম্মানজনক সান্নিধ্য। এই সান্নিধ্যই আমার ও আপনার দরকার; এ সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টাই আমরা করি। প্রথম প্রকারের মায়িয়্যাহ সবার জন্য, কিন্তু খুব সীমিত-সংখ্যক মানুষ এই দ্বিতীয় প্রকারের মায়িয়্যাহ অর্জন করে। তাঁরা কারা?

আল্লাহ ﷻ বলেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মাঝে এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ হিসেবে উপস্থিত না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, কিয়ামতের দিন তিনি তাদের তা জানিয়ে দেবেন।' (সূরা আল-মুজাদালাহ, ৭)

www.banglakitab.weebly.com

তাঁর ইলম সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

'তিন ব্যক্তির মাঝে এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ হিসেবে উপস্থিত না থাকেন।'

এই আয়াতে 'নাজওয়া' মানে গোপন পরামর্শ। আল্লাহ ﷻ বলছেন, তিন ব্যক্তির মাঝে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। এ সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তাধীন। পরবর্তী দারসগুলোতে আমরা একটি বিষয় আলোচনা করব, আর তা হলো আল্লাহ ﷻ তাঁর আরশের ওপর। এ বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা বহুবার প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, আল্লাহ ﷻ সাত আসমানের ওপরে, তাঁর আরশের ওপরে। তিনি বলেছেন :

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

'তিনি পরম দয়াময় (আল্লাহ), আরশে সমুন্নত হয়েছেন।' (সূরা আত-ত্বহা, ৫)

তাই সূরা মুজাদালাহর উল্লেখিত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর জ্ঞান–তিন ব্যক্তির মাঝে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যেখানে তাদের চতুর্থ হিসেবে আল্লাহ ﷻ তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে উপস্থিত থাকেন না। এটাই হলো মায়িয়্যাতু আম্মাহ (معية عامة); সর্বজনীন সান্নিধ্য। এর স্বপক্ষে আরও কিছু আয়াত আছে।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের ওপর ইস্তিওয়া (সমুন্নত) হয়েছেন। যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি থেকে নির্গত হয় তিনি তা জানেন এবং আকাশ থেকে যা কিছু বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয় তাও তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।' (সূরা আল-হাদিদ, ৪)

অর্থাৎ, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞানের মাঝেই আছেন। মুমিন, কাফির, মুত্তাকি যে-ই হোক না কেন এই মায়িয়্যাহ (معية) প্রযোজ্য সবার জন্য।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

www.banglakitab.weebly.com

شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

'আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং একই রূপ পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন, এসবের মাঝে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে।' (সূরা আত-তালাক, ১২)

অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

'আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।'

এটাই মায়িয়্যাত আম্মাহ (معية عامة)।

এখন আসা যাক, মায়িয়্যাতু খাস্সাহ (معية خاصة)-তে। মায়িয়্যাতু খাস্সাহ হলো, বান্দার সাথে আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ ও সম্মানজনক সান্নিধ্য।

وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ আস-সাবিরীনদের (ধৈর্যশীলদের) সাথে আছেন।' (সূরা আল-আনফাল, ৪৬)

আল্লাহ ﷻ বলছেন :

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا

'তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তারা (মুহাম্মাদ ﷺ ও আবু বকর ؓ) গুহাতে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষণ্ণ হোয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' (সূরা আত-তাওবাহ, ৪০)

মদীনায় হিজরতকালে গুহায় আশ্রয় নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ؓ-কে বলেছিলেন:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا

'বিষণ্ণ হোয়ো না, ভয় পেয়ো না, দুঃখ কোরো না, আল্লাহ ﷻ আমাদের সাথে আছেন।'

আল্লাহ ﷻ আমাদের সাথে আছেন—এটা ছিল আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে এক বিশেষ ও সম্মানজনক সান্নিধ্য। একইভাবে আল্লাহ ﷻ যখন ফিরাউনের কাছে মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন :

قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

www.banglakitab.weebly.com

'আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি।' (সূরা আত-ত্বহা, ৪৬)

গুহার ভেতর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকা, মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামের সাথে থাকা, সবরকারীদের সাথে থাকা, এসবই হলো জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ মায়িয়্যাহ বা সান্নিধ্য। এই বিশেষ ও সম্মানজনক সাহচর্য হলো বাছাই করা বিশেষ কিছু মানুষের জন্য। এ হলো বিশেষ কিছু মানুষের জন্য প্রশংসাজনক মায়িয়্যাহ। এ হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে সাহায্য আর আমরা সবাই তো আল্লাহ ﷻ-এর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এই বিশেষ সান্নিধ্য অর্জনের জন্য আমাদের ধৈর্যশীল হতে হবে।

إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সাবিরীন (ধৈর্যশীলদের) সাথে আছেন।' (সূরা আল-আনফাল, ৪৬)

আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ, সম্মানজনক ও প্রশংসার মায়িয়্যাহ ছাড়াও ধৈর্যশীলদের জন্য আছে আরও পুরস্কার।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

'আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলি ইমরান, ১৪৬)

ওপরের এই দুটো আয়াতের প্রতি লক্ষ করুন। ইমাম আহমাদ رحمه الله-এর মতে, কুরআনে মোট নব্বইটি আয়াতে সবরের আলোচনা বা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুটি ছাড়াও কুরআনে আরও ৮৮টি আয়াতে সবরের কথা বলা হয়েছে। শুধু এ দুটি আয়াতের দিকে তাকানো যাক। এই দুটো আয়াত নিয়ে ভাবুন, গভীরভাবে চিন্তা করুন, বাকি আটাশিটি আয়াত আপাতত রেখে দিন।

প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ ﷻ সবরকারীদের সাথে আছেন আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ ﷻ সবরকারীদের ভালোবাসেন। সুতরাং সবরের একটি প্রতিদান হলো নিজ ইলমের দ্বারা আল্লাহ ﷻ সবরকারীদের সাথে আছেন বিশেষ ও সম্মানজনক এক পদ্ধতিতে। যদি আসলেই এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন, অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে পারেন, তাহলে কী করে আপনি ভীত হন? কী করে একাকী বোধ করতে পারেন? যদি আল্লাহ ﷻ আপনার সাথে থাকেন আর আপনি তা অনুভব করেন, তবে ভীত হবার কিংবা নিজেকে একা মনে করার অবকাশ কোথায়? আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, সবরকারীদের আল্লাহ ﷻ ভালোবাসেন। আপনি যদি জানেন, আল্লাহ ﷻ আপনাকে ভালোবাসেন, তবে কী করে আপনি দুঃখ পান, কী করে দুশ্চিন্তা করতে পারেন? আল্লাহ ﷻ যদি আপনাকে ভালোবাসেন, তবে আপনার দুঃখ কীসে আর চিন্তাই বা কিসের?

www.banglakitab.weebly.com

সবরের আরেকটি প্রতিদান হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। আপনি কি আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে সুসংবাদ চান না? তাহলে সবরের মাধ্যমে তা অর্জন করুন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল ও ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৫-১৫৬)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'সবরকারীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।'

কারা সবরকারী?

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।'

আপনি কি চান, জান্নাতে প্রবেশের জন্য ফেরেশতারা জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়ে আপনাকে ডাকতে থাকুক?

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

'তারা বলবে : তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিঃসন্দেহে তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই-না চমৎকার।' (সূরা আর-রাদ, ২৪)

ফেরেশতারা তাঁদের (ইন শা আল্লাহ আমরা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত) জান্নাতে প্রবেশ করাবে আর বলবে, 'সালামুন আলাইকুম' তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা সবর অবলম্বন করেছিলে আর তোমাদের চূড়ান্ত আবাস নিঃসন্দেহে চমৎকার। কেন ফেরেশতাগণ এ আহ্বান জানাবেন?

তারা বলবেন :

سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ

'তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

www.banglakitab.weebly.com

ফেরেশতাগণ তাদের সবরের মানের ওপর ভিত্তি করে সালাম দেবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

'মূলত সবরকারীদের জন্য রয়েছে অগণিত পুরস্কার।' (সূরা আয-যুমার, ১০)

আপনি যদি ধৈর্যধারণ করেন, তাহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে অগণিত পুরস্কার। কোনো ক্ষমতাশালী, উদার ব্যক্তি যদি আপনাকে বলেন–আপনার বিষয়টা আমি দেখছি, আপনি নিজের অংশ যেন ঠিকঠাক বুঝে পান সেই দায়িত্ব আমি নিলাম। তখন আপনি বুঝে নেবেন যে, আপনার জন্য বেশ ভালো পরিমাণ প্রতিদান অপেক্ষা করছে। তাহলে যিনি আল-কারিম (সর্বশ্রেষ্ঠ মহানুভব), তিনি যখন বলছেন, 'অগণিত পুরস্কার' তখন এই পুরস্কারের মাত্রা কেমন হতে পারে চিন্তা করুন।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

'তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের (বনি ইসরাইল) মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।' (সূরা আস-সাজদাহ, ২৪)

তারা কখন নেতৃত্বের আসনে ছিল? যখন তারা ছিল সবরকারী ও দৃঢ় বিশ্বাসী। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ও ইমাম ইবনু কাসির ﷺ-ও মত প্রকাশ করেছেন যে,

بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ

ইয়াকিন ও সবরই কাউকে দ্বীনি ইমামাত এনে দিতে পারে।[১২৭]

সবরের সংজ্ঞা

সবরের শাব্দিক অর্থ–বাধা দেয়া এবং বিরত রাখা (الحبس والمنع)। অর্থাৎ হতাশা ও উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও বাধা (prevent) দেয়া। আল্লাহ ﷻ বলেন :

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

'...তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না।' (সূরা আয-যুমার, ৫৩)

নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাধা দেয়া ও বিরত রাখার নাম সবর। নিজের জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে বিরত রাখা সবর। সবর একটি পদ্ধতি, একটি মানহাজ–আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এটা নিছক মুখে উচ্চারণ করার বিষয় না যে, কেউ বিপদে আক্রান্ত হবার

১২৭ *ই'লামুল মুওয়াক্কিয়িন* : ৪/১৩৫

www.banglakitab.weebly.com

পর বলল, ওয়াল্লাহি, আমি সবর করেছি, আর এতেই সে ধৈর্যশীল হয়ে গেল। কারণ, হতে পারে যে সে এর আগে এমন কিছু বলেছে, যা আল্লাহ ﷻ-এর ক্রোধের কারণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হলো প্রকৃত সবর।[১২৮]

সবর সুসংজ্ঞায়িত। এর নিজস্ব কিছু নিয়মনীতি ও শিক্ষা রয়েছে।

অভিযোগ কি সবরকে বাতিল করে দেয়?

আমরা যদি অভিযোগ করি, তাহলে কি আমাদের সবর বাতিল হয়ে যাবে? এর উত্তর হলো, অভিযোগ দুভাবে হতে পারে। প্রথমটি খারাপ আর দ্বিতীয়টি হলো অভিযোগ প্রকাশের সুন্দরতম পদ্ধতি। আপনি সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারেন না। আপনি তো অভিযোগ করবেন আল্লাহ ﷻ-এর কাছে। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ করা বরং মজবুত ঈমানের পরিচায়ক। ইউসুফ ﷺ-এর পিতা ইয়াকুব ﷺ-কে যখন পরীক্ষা করা হয়েছিল, শুরুতেই তিনি বলেছিলেন :

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

'...সুন্দর সবর..।' (সূরা ইউসুফ, ১৮)

সুন্দর সবর হলো অভিযোগ না করে সবরের পন্থা অবলম্বন করা। তাই ইয়াকুব ﷺ বললেন, আমি বরং সুন্দর সবর অবলম্বন করব। আমি কোনো অভিযোগ করব না, অভিযোগ ছাড়াই সবর করব। সবরের পেছনের নিয়্যাত বিশুদ্ধ হতে হবে। মানুষ আপনাকে সবরকারী বলবে এই কারণে সবর করবেন না। এ জন্যও সবর করবেন না যে, লোকে বলবে, ওয়াল্লাহি, সে তো নিরাশ হয়নি।

এমনকি যদিও ইয়াকুব ﷺ বলেছিলেন,

'...সুন্দর সবর...।' (সূরা ইউসুফ, ১৮)

এবং আল্লাহ ﷻ কুরআনে তা উল্লেখও করেছেন, তবুও যখন তিনি তাঁর ছেলে ইউসুফ ﷺ-এর সাথে ঘটা বিপর্যয়ের ব্যাপারে জানলেন, তখন তিনি অভিযোগ করেছিলেন। ইয়াকুব ﷺ অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু পাশাপাশি তিনি এ-ও বলছিলেন, 'ফাসাবরুন জামিল'। সাবরুন জামিলা হলো এমন সবর যাতে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু তিনি যে অভিযোগ করছিলেন সে কথারও স্পষ্ট উল্লেখ কুরআনেই আছে। তাহলে এ দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য

১২৮ *সহিহুল বুখারি* : ১২৮৩

www.banglakitab.weebly.com

কীভাবে হবে? হ্যাঁ, ইয়াকুব ﷺ অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি অভিযোগ করেছিলেন আল্লাহ ﷻ-এর কাছে। তিনি বলেছিলেন :

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।' (সূরা ইউসুফ, ৮৬)

তিনি বলেছেন, ইন্নামা—ইন্নামা বলার মাধ্যমে এই অভিযোগের নিবেদন শুধু আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি তিনি নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ পেশ করার কারণে আপনার সবর বাতিল হবে না। বরং আল্লাহ ﷻ-এর কাছেই অভিযোগ করুন। আপনার দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও দুর্বলতা—সবকিছুর জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ করুন। আপনার অন্তরের সব অভিযোগ, অনুযোগ, দুঃখ—সবকিছু আল্লাহ ﷻ-এর কাছে বলুন। কিছু চেপে রাখবেন না। হৃদয়ে যা কিছু আছে তার সব আল্লাহ ﷻ-এর কাছে পেশ করুন, বিনয় ও নম্রতার সাথে ভিক্ষা করুন, তারপর দেখুন না ফলাফল কী হয়।

আইয়্যুব ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ, সকল বিচারকের বড় বিচারক, সবরকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ

'আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয়ই সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।' (সূরা আস-সাদ, ৪৪)

এটা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা। স্বয়ং আল্লাহ ﷻ ঘোষণা করছেন যে, তিনি আইয়্যুব ﷺ-কে ধৈর্যশীল পেয়েছেন। যদিও তিনি অভিযোগ করছিলেন তবু আল্লাহ ﷻ তাকে সবরকারী আখ্যা দিয়েছেন। কারণ, তিনি অভিযোগ করেছিলেন আল্লাহ ﷻ-এর কাছে, আর তাই তাঁর অভিযোগ করার ব্যাপারটি বরং সেই সব নিয়ামকের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর কারণে তিনি আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে সবরকারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভের মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন:

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

'নিঃসন্দেহে আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।' (সূরা আল-আম্বিয়া, ৮৩)

লক্ষ করুন, আইয়্যুব ﷺ কত সূক্ষ্মভাবে শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, মাসসানি مَسَّنِي (আমাকে স্পর্শ করেছে)। আহলাকানি (أهلكني) অর্থাৎ, আমাকে ধ্বংস করেছে

www.banglakitab.weebly.com

কিংবা শেষ করে দিয়েছে, এ ধরনের কোনো শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন, আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। স্পর্শ শব্দের মানে দাঁড়ায় তিনি খুব সামান্য দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কী ছিল সেই সমস্যা? আমাদের সবারই জানা আছে, এ নিয়ে আর আলোচনায় যাচ্ছি না। ধৈর্যশীল বান্দার উদাহরণ হলেন আইয়্যুব ﷺ। তিনি তাঁর সম্পদ, সন্তান ও পরিবার সব হারিয়েছিলেন। কেবল স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, রুগ্‌ণ দেহে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর এই অবস্থা কেবল এক-দুদিনের ছিল না, বরং বছরের পর বছর তিনি এই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ করার সময় তিনি বললেন,

'নিঃসন্দেহে দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে।'

তিনি এটুকুই বললেন কারণ এমনও মানুষ থাকতে পারে যারা তাঁর চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। তাই খুব বিনয়ের সাথে তিনি অভিযোগ করলেন। আল্লাহ ﷻ তাঁকে সবরকারী বান্দা আখ্যা দিলেন।

এই হলো অভিযোগের সুন্দরতম পদ্ধতি।

আর যে ধরনের অভিযোগে বান্দা গুনাহগার হয়, তা হলো সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার ব্যাপারে অভিযোগ করা। এমন অভিযোগ বান্দার সবরকে বাতিল করে দেয়। এটা এমন অভিযোগ যেখানে গ্রহীতার কাছে অভিযোগ করা হয় দাতার নামে। অভিযোগ করার আগে আমরা কি ভেবে দেখছি, কার কাছে অভিযোগ করছি? আমরা সেই মহান সত্তাকে—দয়াশীলতার গুণে যথাযথ ও পরিপূর্ণ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ ﷻ -কে—ভুলে গিয়ে এমন সত্তার কাছে অভিযোগ করি, যে তার দয়াতে ত্রুটিপূর্ণ কিংবা তার মাঝে আদৌ দয়াশীলতার কোনো গুণ নেই। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অভিযোগ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে, সৃষ্টির কাছে আল্লাহ ﷻ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এটি সর্বনিকৃষ্ট। যেমন : কেন এমন হলো?, কেন আমি বিপদে পড়লাম? এভাবে অভিযোগ করা এবং নিজের বিশ্বাস ও চালচলন বদলে ফেলা। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ করা; এটি অভিযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। তৃতীয় প্রকারটি মাঝামাঝি অর্থাৎ স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির ব্যাপারে অভিযোগ করা। প্রথমটি সবরকে বাতিল করে দেয় আর বাকি দুটোতে সবর নষ্ট হয় না।

সবরের প্রকারভেদ

এখানে আমি সবরের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরছি। সবর তিন ধরনের হতে পারে। প্রথম প্রকার হলো, সবর আলাত্তা আহওয়াল-মামুর (صبر على الطاعة والمأمور) অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্য ও হুকুম পালনে সবর করা। তারপর হলো, সবর আলাল মাসিয়াহ (صبر على المعصية), অর্থাৎ গুনাহ থেকে বিরত থাকার সবর।

www.banglakitab.weebly.com

এ দুই প্রকার সবরের একটি উদাহরণ হচ্ছে, ফজরের সালাতে ঘুম থেকে ওঠা। এক দীর্ঘ কর্মমুখর দিনের শেষে আপনি হয়তো রাত করে ঘুমোতে গিয়েছেন কিংবা রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে শুয়েছেন। এমন অবস্থায় হঠাৎ ফজরের ওয়াক্ত চলে এল। আপনাকে আবারও ফজরের সালাতের জন্য উঠতে হলো; কিংবা স্বামী হয়তো স্ত্রীর সাথে বিছানার উষ্ণতা উপভোগ করছেন, এ অবস্থায় সালাতুল ফজর কিংবা সালাতুন নাফিলার সময় উপস্থিত হলো, ফলে তিনি বিছানা ছেড়ে সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ ছাড়া আরও কিছু উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন : আপনি হয়তো পরিবারকে নিয়ে বসবাসের জন্য একটি সুন্দর বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু সুদি লেনদেনে জড়াতে হবে ভেবে তা পরিত্যাগ করলেন। গীবত ও নামিমাহ থেকে বিরত থাকা, এ থেকে জিহ্বা সংযত রাখার জন্যও প্রচুর সবরের প্রয়োজন। এগুলো প্রথম দুই প্রকার সবরের উদাহরণ।

সবরের তৃতীয় প্রকারটি হলো, আস-সবরু আলাল বালায়ি ওয়াল-মাকদুর (الصبر على البلاء والمقدور) অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া পরীক্ষা ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

الم ۝ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّـهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

> আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' আর তাদের কোনো পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।' (সূরা আল-আনকাবুত, ১-৩)

এখানে আল্লাহ ﷻ বলছেন, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও পরীক্ষা করেছি, আর তোমরা তাঁদের চেয়ে উত্তম নও। সুতরাং আল্লাহ ﷻ অবশ্যই জানিয়ে দেবেন, কারা সত্যপন্থী আর কারা বাতিলের অনুসরণ করে। মুখে উচ্চারণ করলেই ঈমান হয় না। ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকৃতি নয়; বরং অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলের সমন্বয় হচ্ছে ঈমান।

আল্লাহ ﷻ কেন আমাদের পরীক্ষা করেন?

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

مَّا كَانَ اللَّـهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَـٰكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

www.banglakitab.weebly.com

'আল্লাহ এমন নন যে, মুমিনদের তাদের বর্তমান অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন, যতক্ষণ না তিনি ভালোদের মন্দদের থেকে পৃথক করে নেন। আর আল্লাহ এমনও নন যে, তোমাদের গাইবের সকল সংবাদ অবহিত করবেন। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো ও আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।' (সূরা আলি ইমরান, ১৭৯)

আমাদের সাথে যা কিছু ঘটে তার পেছনে আল্লাহ ﷻ-এর হিকমাহ থাকে। আমাদের ওপর কোনো পরীক্ষা এলে কখনো কখনো আমরা এর পেছনের হিকমাহ টের পাই, আবার কখনো কখনো আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না। আল্লাহ ﷻ এখানে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, আমরা গাইবের ব্যাপারে জ্ঞান রাখি না। আল্লাহ ﷻ গাইব প্রকাশ করবেন না। কিন্তু আমরা যদি আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান আনি, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মহাপ্রতিদান।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

'সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো ও আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।'

এখানে মূল শিক্ষা হলো, আপনার জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি সত্যের ওপর অবিচল থাকবেন। এ আয়াতের শেষে আল্লাহ ﷻ মূলত এই বিষয়টির কথাই বলেছেন—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আলাইহিমুস সালাম-গণের সত্য পথের ওপর অটল থাকা। তাই আল্লাহ ﷻ মানুষের ঈমান যাচাই করবেন, যেন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য করা যায়। আল্লাহ ﷻ বলছেন :

حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

...যতক্ষণ না তিনি ভালোদের মন্দদের থেকে আলাদা করে নেন।

আল্লাহ ﷻ বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ও পরীক্ষার মাধ্যমে ভালোদের মন্দদের থেকে আলাদা করেন। হতে পারে সেটা আর্থিক দিক দিয়ে কিংবা কারও অসুস্থতা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের পরীক্ষার মাধ্যমে। আবার কেউ হয়তো দ্বীনের কোনো বিষয়ে পরীক্ষায় পড়তে পারে। আর দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

www.banglakitab.weebly.com

'যেন আল্লাহ আলাদা করে দেন খারাপদের (কাফির, মুশরিক ও মন্দ আমলকারী) ভালোদের (মুসলিম, যারা নেক আমল করে) থেকে এবং খারাপগুলোকে একটির পর একটি স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন ও তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা আল-আনফাল, ৩৭)

লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ বলছেন খারাপদের ভালোদের থেকে আলাদা করে দেবেন এবং খারাপগুলোকে একসাথে জড়ো করবেন। গত দশ কিংবা পনেরো বছরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক সময়ের ফিতনাগুলোর মাধ্যমে সমস্ত আবর্জনা একদিকে, আর সমস্ত সত্যপন্থী লোকগুলো অন্যপাশে জড়ো হচ্ছে। দু-পক্ষ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আপনারা এখন দা'ঈদের মাঝেও পার্থক্য করতে পারবেন–যারা আবর্জনা তারা আবর্জনাই, আর যারা আসলেই সত্যের ওপর আছেন আপনি তাঁদেরও চিনতে পারবেন। সামান্য দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে মুহূর্তের মধ্যে অনেকের চোখমুখের ভাব বদলে যায়। সেই সাথে বদলে যায় তাদের নীতি, আদর্শ আর মানহাজও। দ্বীনের যে বিষয়গুলো এতদিন তাদের কাছে সুনিশ্চিত ফরয হিসেবে বিবেচিত হতো, হঠাৎ করেই সেগুলো 'সুন্নাহ'তে পরিণত হয়, কিংবা সুন্নাহর চেয়েও কম গুরুত্বের হয়ে যায়। বিপদের মুখোমুখি হলে তারা দ্বীনকে কাটছাঁট করে ফেলে। আগে তাদের কাছে ওয়ালা ও বারার সংজ্ঞা ছিল এক রকম, আর এখন রাতারাতি সেগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, সবকিছুই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং আমরা এসবের প্রত্যক্ষ নিদর্শনও দেখতে পাচ্ছি।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

'মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?' (সূরা আল-আনকাবুত, ২)

সাধারণ অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে সবরের পরীক্ষায় যারা ফেল করে তারা বলে, আল্লাহ তুমি এটা কেন করলে? কিন্তু অনেকে মুখে এটা না বললেও বিপদের মুখোমুখি হলে নিজেদের নীতি ও বিশ্বাস পাল্টে ফেলে। শুরু করে নিজের আদর্শের সাথে আপস করা। অনেকে আছে, যারা জেল থেকে ফেরে সম্পূর্ণ ভিন্ন, নতুন মানুষ হয়ে। তাদের বন্দিত্বের আগেকার অডিও, ভিডিও ও লেকচারগুলো লক্ষ করুন, আর এখনকার কথাবার্তা শুনুন। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে। এরা মুখে কখনো বলে না, 'আল্লাহ তুমি আমার সাথে কেন এমন করলে', এরা মুখে অভিযোগ করে না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস আর আদর্শ বদলে যায়, এক ভিন্ন আদর্শে তারা বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এরাই হলো সেসব আবর্জনা যারা আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীনের দাওয়াহর ওজন বহনের যোগ্য না। সমস্ত আবর্জনাকে একপাশে জড়ো করা হচ্ছে, আর হকপন্থীরাও জড়ো হচ্ছে একপাশে।

www.banglakitab.weebly.com

পরীক্ষা নেই এমন জীবনের প্রত্যাশা করবেন না :

হক মানহাজের দাওয়াহর পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ, লাল গালিচা বিছানো হবে না। কখনো এমন আশা করবেন না এবং এমন আশার কারণে নিজের জীবনকে আরাম ও ভোগবিলাসের দিকে যেতে দেবেন না। হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করার কারণে আপনাকে যেসব দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট ভোগ করতে হবে, তার মোকাবেলায় এখন থেকেই নিজেকে গড়ে তুলুন, আর সে জন্য আপনার দরকার মজবুত ঈমান ও সবর। 'নবি ইউসুফ ﷺ-এর পাঠশালা'[১২৯] নামক আলোচনায় আমি বলেছিলাম, কখনো আল্লাহ ﷻ-এর কাছে পরীক্ষা চাইবেন না। বরং আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আপনাকে পরীক্ষা থেকে হেফাযত করেন । কিন্তু একই সাথে নিজের ভেতরে ঈমান ও সবরকে প্রতিষ্ঠিত করুন, আর তা শুধু ইলম অর্জনের মাধ্যমে সম্ভব। এ কারণেই আমরা ইলম অর্জন করি, যেন এর সাহায্যে কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তেও আমরা অবিচল থাকতে পারি। ওয়াল্লাহি, আমি এমন কয়েকজনকে চিনি, পরীক্ষার মুখোমুখি হবার পর যারা হকের ওপর টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছেন–তারা এ সময়কার বেশ পরিচিত মুখ এবং আপনারা হয়তো তাদের মিডিয়াতেও দেখে থাকবেন।

কখনো তাদের মতো হবেন না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

> মানুষের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়ের সাথে আল্লাহর ইবাদাত করে। সে যদি কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে এতে সে প্রশান্তি লাভ করে, কিন্তু যদি কোনো বিপর্যয় তার ওপর আপতিত হয়, সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় (ঈমান আনার পর কুফরিতে ফিরে যায়)। ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।' (সূরা আল-হাজ্জ, ১১)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়ের সাথে আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদাত করে–অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন যে, ধরুন কেউ সাগর কিনারে কোনো উঁচু পাহাড়ের ধার অথবা কোনো গিরিখাতের কিনারায় সংকীর্ণ পথ ধরে হাঁটছেন।' সে যদি কল্যাণপ্রাপ্ত হয় এবং সবকিছু তার ইচ্ছামতো ঘটে, তবে এতে সে প্রশান্তি লাভ করে'–যখন সাফল্য আসে তখন সে খুশি, 'ওহ! আমি তো মুমিন, আমি প্রশান্তি অনুভব করছি'। কিন্তু যদি কোনো বিপর্যয় তার ওপর আপতিত হয়, সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়'–যখন বিপদ আসে তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পা ফসকে যায়। দ্বীনের রাস্তা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে যায়, আর এভাবে দুনিয়া-আখিরাত দুটোই হারায়। দুনিয়াতে সে বিপর্যস্ত হয়, আর আল্লাহ

১২৯ *নবি ইউসুফ ﷺ-এর পাঠশালা* নামে ইলম হাউস পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত।

www.banglakitab.weebly.com

ﷻ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন এর ওপর অসন্তুষ্ট হবার কারণে আখিরাতেও সে বিপর্যস্ত হবে। আল্লাহুম্মা সাব্বিতানা, আল্লাহুম্মা সাব্বিতানা। এরা যদি নিজেদের চাহিদা মোতাবেক ধন, যশ, খ্যাতি, সম্পদ, সম্মান ও অনুসারীদের পেয়ে যায়, তবে এরা মুমিনদের স্বাভাবিক গতিপথে মিশে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তারা সেই পথ ছেড়ে দেয়।

এখনকার অনেক দা'ঈকে বলতে শুনবেন, আমি ভাই শান্তিতে থাকতে চাই, আমি ছা-পোষা মানুষ, বউবাচ্চা নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। এখন ফিতনার সময়, আমি কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাই না। অথচ এরা ফিতনার কিছুই দেখেনি। ফিতনা কী এদের ধারণাই নেই, ফিতনা এখনো এদের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি, এমনকি ফিতনার গন্ধও এরা পায়নি। আজ এমনও মানুষ দেখবেন যারা বলছে, 'দাওয়াহ আমার জন্য না'। মাত্র কদিন আগেও আমি একজনকে বলতে শুনলাম, মাসজিদে যাওয়ার কারণে যদি আমার ওপর নজরদারি করা হয়, তাহলে আমি আর মাসজিদেই যাব না।

'মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?' (সূরা আল-আনকাবুত, ২)

একজন দা'ঈ, একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো সীরাতুল মুস্তাকিমের ওপর চলা, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথের অনুসরণ করা এবং একইসাথে এ পথের বোঝাগুলোও বহন করা। একজন দা'ঈ সঠিক পথকে গ্রহণ করে নেয় এবং স্বীকার করে নেয় এ পথের সকল কষ্টও। আল্লাহ ﷻ তার জন্য যে পরিণতিই নির্ধারণ করুন না কেন, নির্দ্বিধায়, বুক চিতিয়ে দৃঢ়তার সাথে সে তা মেনে নেয় এবং ঘোষণা করে, আমি একজন মুমিন!।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

> 'এবং নিঃসন্দেহে আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদের।' (সূরা আল-আনকাবুত, ৩)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন যে, আল্লাহ ﷻ অবশ্যই সত্যবাদী ও মিথ্যুকদের জেনে নেবেন (যদিও তিনি আগে থেকেই সমস্ত ব্যাপারে অবহিত আছেন)। নবি আলাইহিমুস সালামগণ পরীক্ষিত হয়েছেন, ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। উলুল আযমের[১৩০] এমন একজন রাসূলও পাবেন না, যার দাওয়াহর পথে আরাম-আয়েশ, ভোগবিলাস ও লাল গালিচা বিছানো ছিল। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যিনি আল্লাহ ﷻ-এর সবচেয়ে প্রিয় তিনিও এগুলো পাননি। কোনো রাসূলের দাওয়াহর পথ দুঃখ, কষ্ট, পরীক্ষা ছাড়া ছিল না। আর দাওয়াহর ক্ষেত্রে

১৩০ উলুল আযম : দৃঢ়সংকল্প। সমস্ত নবি ও রাসূলের মধ্যে পাঁচজন নবিকে আল্লাহ ﷻ 'উলুল আযম' বা দৃঢ়সংকল্প বলে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। সেই পাঁচজন হচ্ছেন : ১. নূহ ؑ, ২. ইব্রাহীম ؑ, ৩. মূসা ؑ, ৪. ঈসা ؑ এবং ৫. মুহাম্মাদ ﷺ।

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের অনুসরণীয় কারা? দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ কারা? আল্লাহ ﷻ-এর রাসূল আলাইহিমুস সালামগণই হলেন আমাদের আদর্শ। আপনারা কি এমন কোনো রাসূলের কথা জানেন যিনি তার জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি কোনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেননি? তাঁরাই আমাদের আদর্শ, দাওয়াহর ক্ষেত্রে তাঁরাই অনুসরণীয়। আজকে এমন অনেককে দেখা যায় যারা দাওয়াহকে তাদের পেশা ও ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছে। তারা দাওয়াহর কাজ করে খ্যাতি, সম্মান আর বিলাসিতার জন্য। তাই এরা সব সময় স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। যে সময়ের যে রীতি, যা বললে জনপ্রিয়তা পাওয়া যাবে, মানুষের মন জয় করা যাবে, সেটাই তাদের আদর্শ। স্রোতের সাথে চলাই তাদের দ্বীন, তাদের ধর্ম। আপনি মনে করছেন আপনি হকের ওপর আছেন, কিন্তু আপনার কোনো শত্রু নেই, আপনি পরীক্ষিত হচ্ছেন না—যদি এমন হয়, তাহলে বাসায় যান, রুমের দরজা বন্ধ করে আবার শুরু থেকে চিন্তা করে দেখুন। বারবার ভেবে দেখুন, আপনি আসলেই হকের ওপর আছেন কি না।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করেছি শয়তান—মানুষ ও জিনদের মধ্য হতে। তারা ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকপ্রদ কথা বলে। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যার ওপরে ছেড়ে দেন।' (সূরা আল-আনআম, ১১২)

আল্লাহ ﷻ বলছেন :

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু...

তাওহিদের দিকে আহ্বানকারীর শত্রু থাকবেই। আল্লাহ ﷻ এখানে শত্রু হিসেবে শয়তানের কথা বলেছেন। এ থেকে কেউ হয়তো বলতে পারে, আল্লাহ ﷻ এখানে জিন শয়তানের কথা বলছেন। কিন্তু লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ এখানে নির্দিষ্ট করে বলছেন, এ শত্রু শুধু জিন জাতির মধ্যে থেকে হবে না; বরং আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ

মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে।

তাই এই আয়াতে শয়তান বলতে কেবল জিনদের বোঝানো হচ্ছে, এমন বলা যাবে না। সূরা আল-ফুরকানে এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরেকটি আয়াত এসেছে :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

www.banglakitab.weebly.com

'এমনিভাবে প্রত্যেক নবির জন্য আমি মুজরিমুন (অর্থাৎ কাফির, মুশরিক, যালিম ইত্যাদি)-দের মধ্য থেকে শত্রু সৃষ্টি করেছি। আপনার জন্য পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে আপনার পালনকর্তাই যথেষ্ট।' (সূরা আল-ফুরক্বান, ৩১)

যারাই হক পথে চলবে তাদের শত্রু থাকবেই। এটা আল্লাহ ﷻ-এর সুন্নাহ, আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সুন্নাহকে বদলাতে পারবেন না। এ শত্রু কারা? কাফির, মুশরিক, যালিম, এখনকার সময়ের মর্ডানিস্টরাসহ আরও অনেক ধরনের লোকজন–এই শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন আল্লাহ ﷻ বলছেন لِكُلِّ অর্থাৎ, প্রত্যেক। এই প্রত্যেকজন কারা? আল্লাহ ﷻ এখানে আমার বা আপনার কথা বলছেন না। তাঁদের (আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপারে বলছেন যারা আমার এবং আপনার চেয়ে উত্তম–যারা দাওয়াহর পথে মানবজাতির আদর্শ। আল্লাহ যদি উলুল আযমের প্রত্যেক রাসূলের জন্য, অন্যান্য সকল নবির (আলাইহিমুস সালাম) জন্য শত্রু নিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে আপনি কীভাবে আশা করেন যে সত্যের পথে থাকা একজন প্রকৃত মুসলিম পরীক্ষিত হবে না? তার কোনো শত্রু থাকবে না? তাকে কোনো সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট ও ফিতনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না? এটা কীভাবে সম্ভব?

আমাদের সময়ের ইলমের পোশাক পরা কিছু ভণ্ড, মূর্খ–যাদের বক্তব্য খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়–মনে করে তারা সবাইকে খুশি করে চলতে পারবে। কল্পরাজ্যের এই বাসিন্দারা মনে করে কোনো এক জাদুবলে তারা সব মানুষকে এক করে ফেলতে পারবে, নিয়ে আসতে পারবে ঐক্যের কোনো এক গণ্ডিতে। তারা নিজেদের নতুন মাসীহ মনে করে, যার এমন কোনো শক্তি ও জ্ঞান রয়েছে, যা দ্বারা সে সবাইকে তার গণ্ডির মাঝে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। তারা মনে করে তারা দ্বীন ও দুনিয়াকে বাঁচাতে প্রেরিত নতুন কোনো মসীহ! মনে করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার এমন কোনো যোগ্যতা বা সক্ষমতা তাদের আছে যা আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও ছিল না। এদের কথা হলো সব ধর্মের, সব আদর্শের সবাই একসাথে মিলেমিশে, একসাথে হাসিখুশি অবস্থায় থাকবে। সবার দৃষ্টিভঙ্গি একই হবে, সবার অবস্থান একই হবে। শুধু ভালোবাসা, সম্প্রীতি আর ঐক্য থাকবে। অথচ আল্লাহ ﷻ বলছেন :

'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করেছি শয়তান–মানুষ ও জিনদের মধ্য হতে।'

তারা সমগ্র দুনিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় বাতিলের ওপর এবং এর বিনিময়ে তারা আল্লাহ ﷻ-এর অসন্তুষ্টি কামাই করে। এ ধরনের লোকের উচিত দাওয়াহর প্রাথমিক বিষয়গুলো, মূলনীতিগুলো আবার শেখা। শুধু দাওয়াহ-ই না, বরং তাদের আগে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আবার মনোযোগ দিয়ে শেখা উচিত। যখন আপনি সঠিক মানহাজের ওপর, সঠিক আকিদাহ নিয়ে দাওয়াহ করবেন এবং আপনার দাওয়াহ কার্যকরী হবে তখন অবশ্যই আপনার শত্রু থাকবে। আজকের দিনে কেউ যদি সত্যের দিকে আহ্বান করে, যদি পরিপূর্ণ তাওহিদের কথা বলে, তবে কাফিরদের আগে নামধারী তথাকথিত মুসলিমরাই তার বিরোধিতা করবে।

www.banglakitab.weebly.com

কোনো কারণ ছাড়া কি দু-দুবার কুরআনে এই ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছে?

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

'নিঃসন্দেহে (দুনিয়ার জীবনে) অপরাধীরা বিশ্বাসীদের উপহাস করত। তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত, তখন একে অপরের দিকে চোখ টিপে ইশারা করত। যখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনো হাসাহাসি করতে করতে ফিরত। আর যখনই তারা বিশ্বাসীদের কাউকে দেখত, তারা বলত, নিশ্চয়ই এরা তো বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে।' (সূরা আল-মুতাফফিফীন, ২৯-৩২)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, নিঃসন্দেহে (দুনিয়ার জীবনে) অপরাধীরা বিশ্বাসীদের উপহাস করত। আমরা সবাই জুয আম্মা (৩০ তম পারা) পড়ি। অনেকেরই জুয আম্মা মুখস্থ। কিন্তু আমরা কি কখনো কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করি? এ আয়াতে কাফিররা মুসলিমদের সাথে যে আলোচনা করত আল্লাহ ﷻ সেটার ব্যাপারে বলছেন। আজকে আমাদের মাঝে একশ্রেণির লোক আছে যারা নিজেদের মুমিন দাবি করে থাকে, অথচ খাঁটি তাওহিদে বিশ্বাসীদের সাথে তারা ঠিক এই কাফিরদের মতো আচরণ করে। বিশুদ্ধ তাওহিদের ওপর আমলকারীদের দেখলে এরা বলে, 'নিশ্চয় এরা তো বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে'। নির্ভেজাল তাওহিদে বিশ্বাসী সত্যপন্থীরা আজ আগন্তুকদের মধ্যেও আগন্তুক, এমনকি তাদের মাঝেও আগন্তুক।

সেটা কীভাবে?

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.....

দল্লুন শব্দের অর্থ কী? মানে হলো, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কাফিররা মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলত, এরা তো পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর আজ নামধারী মুসলিমরা কী বলে? আরে সে তো তাকফিরি, সে খারেজি। আজ এরা এসব বলে বেড়ায়। এদের ডেকে প্রশ্ন করুন, ঠিক আছে ভাই, আপনারা যেহেতু তাদের এসব নামে ডাকছেন, তাহলে বলুন, আলিমদের মতানুসারে তাকফিরির সংজ্ঞা কী? তারা জবাব দিতে পারবে না। কিছুই বলতে পারবে না। তাদের জিজ্ঞেস করুন, সালাফদের মতে খারিজিদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী—তারা বলতে পারবে না। আসল ব্যাপার হলো, এরা কিছু মোরগকে ডাকাডাকি করতে শুনেছে, তাই তারাও সুর মিলিয়েছে। আমি তাদের একটু বেশিই সম্মান দিচ্ছি—আমি বলিনি যে, তারা কুকুরের পালকে ঘেউ ঘেউ করতে শুনেছে, অমনি তারাও তাদের মতো ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। আমি বরং বলেছি যে, এরা মোরগের ডাক শুনে সুর মিলিয়েছে। আল্লাহ ﷻ-এর ভয় ছাড়া, এরা মুহূর্তের মধ্যে এসব রেডিমেইড ট্যাগ ছুড়ে দেয়।

যা হোক, মনে রাখবেন, যদি মুমিন হয়ে থাকেন, হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল থাকেন,

www.banglakitab.weebly.com

তবে অবশ্যই পরীক্ষিত হবেন এবং তখন আপনাকে এর ওপর ধৈর্যশীল হতে হবে।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

'নিঃসন্দেহে (দুনিয়ার জীবনে) অপরাধীরা বিশ্বাসীদের উপহাস করত।' (সূরা আল-মুতাফফিফীন, ২৯)

পরীক্ষার সম্মুখীন হলে এই আয়াতগুলোকে চোখের সামনে রাখবেন। আমার কাছে অনেকে অনেক সমস্যা নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, পরামর্শ করা খারাপ না, কিন্তু আপনারা এই আয়াতগুলোর কথা সব সময় মনে রাখবেন। আপনি যদি হকের ওপর থাকেন এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, আপনি কুরআন ও সুন্নাহর নির্ধারিত পথের (সাহাবা ﷺ ও তাঁদের অনুসারীদের পথ) ওপরে আছেন–আর এই কারণে যদি আপনাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়, আপনার নামের সাথে জুড়ে দেয়া হয় বিভিন্ন ট্যাগ, আপনাকে নিয়ে হাসি-তামাশা ও বিদ্রুপ করা হয়, তাহলে এই আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

তারা আপনাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, ক্ষতি করে। কিন্তু যদি সবর করেন, তবে ফলাফল হিসেবে আপনি কী পাবেন? আল্লাহ ﷻ আপনাকে ঠিক এই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে বলছেন :

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

'আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদের উপহাস করছে।' (সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৩৪)

দুনিয়াতে এদের কাউকে নিয়ে আমরা হাসি-তামাশা করব না। কিন্তু পরকালে, ওদের নিয়ে মুমিনরাই উপহাস করবে। আজ যারা আপনাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করছে, সেদিন আপনি তাদের নিয়ে পাল্টা হাসি-তামাশা ও উপহাস করবেন। ইবনুল মুবারাক ﷺ বলেন, আল-কালবি এই আয়াতের ব্যাপারে আবি সালিহকে মন্তব্য করতে শুনেছেন।

اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

'আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫)

আবু সালিহ আল্লাহ ﷻ-এর এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, জাহান্নামে তাদের দৈনন্দিন শাস্তির সাথে উপরিপাওনা হিসেবে যোগ হবে এই উপহাস। জাহান্নামের দরজাগুলো খুলে দিয়ে তাদের চলে যেতে বলা হবে। জাহান্নামীরা দ্রুতবেগে দরজার দিকে ছুটে যাবে। কিন্তু তারা দরজার কাছে পৌঁছানোমাত্র তা বন্ধ করে দেয়া হবে। জান্নাতের জানালা দিয়ে জাহান্নামীদের দেখে মুমিনরা হাসাহাসি করবে। আবু সালিহ বলেছেন এটাই হচ্ছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা,

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

www.banglakitab.weebly.com

'আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদের উপহাস করছে।' (সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৩৪)

ওয়াল্লাহি, সবচেয়ে অধীর আগ্রহে আমি সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করি যেদিন ইন শা আল্লাহ্ আমরা আল্লাহ ﷻ-এর চেহারা দেখতে পাব। এটা আমার প্রথম চাওয়া। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টির জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি তা হলো, হাতে দুধের শরবত, মধু ও পানীয়-বিশিষ্ট গ্লাস নিয়ে আমরা আল-আরাইকের সিংহাসনে আয়েশ করে বসব, আর জান্নাতের জানালা দিয়ে জাহান্নামীদের দিকে তাকাব। সেই জাহান্নামীদের দিকে যারা পৃথিবীতে দিনের পর দিন বিরামহীনভাবে আমাদের ওপর বিভিন্ন রকমের অত্যাচার করেছিল। যারা আমাদের নিয়ে উপহাস করত আর আমাদের হত্যা করত। আল্লাহ ﷻ আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করুন এবং হক পথের ওপর আমাদের দৃঢ় রাখুন, যাতে করে সেই সম্মান ও মর্যাদার স্তরে আমরা উপনীত হতে পারি, ইন শা আল্লাহ্ তাআলা। কাজেই দুনিয়াতে এদের কাউকে নিয়ে আমরা উপহাস করব না, কেননা এখানে তাওবাহর সুযোগ আছে। সুযোগ আছে যেকোনো সময় তাওবাহ করে সঠিক পথে ফিরে আসার। কিন্তু পরকালীন জীবনে এমন একটা সময় আসবে যখন আপনার নিজের আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে উপহাস করতেও আপনার খারাপ লাগবে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ۝ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

'সিংহাসনে বসে তারা তাদের দেখবে। এবং কাফিররা যা করত, তার প্রতিদান পেয়েছে তো?' (সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৩৫-৩৬)

এবার প্রতিদানের পালা। তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল বুঝিয়ে দেয়া হবে। দুনিয়াতে যে উপহাস করেছে, পরকালে তাকে নিয়ে অন্যরা উপহাস করবে। আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের আল-আরাইকের ওপর সমবেত করেন যেন আমাদের সাথে এমন আচরণকারীদের সেদিন এ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আমরা দেখতে পারি, ইন শা আল্লাহ্ তাআলা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ, মুসলিম কিংবা মুজাদ্দিদ–এ মহান কাজের দায়িত্ব যে-ই গ্রহণ করেছেন, প্রত্যেককে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা আল্লাহ ﷻ-এর সুন্নাহ। সুতরাং আমাদের সবরের ওপর আরও দৃঢ় হওয়া ও এর ওপর আমল করা প্রয়োজন। আর একমাত্র ইলম অর্জনের মাধ্যমে তা হতে পারে। সবর ও ইলম। আল্লাহ ﷻ আমাদের অবিচল রাখুন ও পথভ্রষ্টতা থেকে হিফাযত করুন।

www.banglakitab.weebly.com

কুরআনে পরীক্ষা-সংক্রান্ত কিছু আয়াত :

পরীক্ষার ব্যাপারে কুরআনের আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ করুন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল ও ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫)

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ

এই অংশে যে লাম এসেছে তা হলো লাম আত-তাওকিদ (لام التوكيد) । লাম আত-তাওকিদের ব্যবহার করা হয় কোনো কিছু ঘটার ব্যাপারে নিশ্চিত করার জন্য। বাক্যে শপথ বোঝাতেও লাম ব্যবহৃত হয়, যাকে বলে (لام القسم) লাম আল-কসম। সুতরাং এখানে আল্লাহ শপথ করছেন যে–ওয়াল্লাহি, তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। লাম এর ঠিক পরের অক্ষরটি হচ্ছে 'ভারী নুন' (نون الثقيلة)। পুরো কুরআনজুড়ে এ বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ বলছেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদের এবং সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।' (সূরা আল-মুহাম্মাদ, ৩১)

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

'অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে এবং অবশ্যই আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) ও মুশরিকদের থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পারো। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং সংযমী হও, তবে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।' (সূরা আলি ইমরান, ১৮৬)

প্রতিটি আয়াতে একই অর্থে লামের প্রয়োগ ঘটেছে–লাম আত-তাওকিদ কিংবা লাম আল-কসম। উল্লিখিত শেষ আয়াতের দ্বিতীয় অংশের প্রতি লক্ষ করুন,

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ

www.banglakitab.weebly.com

এবং অবশ্যই আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) ও মুশরিকদের থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পারো।

অর্থাৎ, এটি একটি সুনিশ্চিত ও অনিবার্য বিষয়। তাহলে কীভাবে আমরা এর মোকাবেলা করতে পারি? এর উত্তরও এখানে বলে দেয়া হয়েছে,

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

আল্লাহ ﷻ বিষয়টি অর্ধেক বলেননি, ঝুলিয়ে রাখেননি। তিনি আমাদের সমাধান জানিয়ে দিয়েছেন। যদি আমরা সবরকারী ও মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হই, তাহলে যাবতীয় ব্যাপারে এটাই আমাদের সাফল্যে পৌঁছে দেবে। এবং এটাই আমাদের পরকালীন জীবনে সফলতার অন্যতম পাথেয়।

পার্থিব জীবনে আপনার দাওয়াহর ফলাফল কী হচ্ছে সেটা দেখা জরুরি না। অনেকে এ দুনিয়াতেই চূড়ান্ত বিজয় দেখে যেতে চায়। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় তো হলো, হকের রাস্তায় ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা ও এর ওপরেই মৃত্যুবরণ করা। আর তাই আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সব সময় কেবল এই দুআই করি, তিনি যেন বিশুদ্ধ তাওহিদ ও হক পথের ওপর আমাদের দৃঢ় ও অবিচল রাখেন। নবি-রাসূল ও বিশ্বাসীরা অসংখ্য পরীক্ষা ও ফিতনার মুখোমুখি হয়েছেন এবং আমাদের নবিজি ﷺ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে এত বেশি পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল যে তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য আল্লাহ ﷻ আয়াত নাযিল করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

'নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এর ওপর সবর করেছিল, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছায়। আল্লাহর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই, আর অবশ্যই রাসূলদের কিছু সংবাদ তো আপনার কাছে পৌঁছেছে।' (সূরা আল-আনআম, ৩৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তীব্র মনঃকষ্টে কাতর হয়ে পড়েছিলেন তখন আল্লাহ ﷻ তাকে বললেন, তোমার আগে যারা এসেছিল তাদেরও এভাবে তারা অস্বীকার করেছিল। তাদেরও অনেক ক্ষতি করা হয়েছিল, অত্যাচার করা হয়েছিল। বিজয়ের আগ পর্যন্ত অস্বীকৃতি ও নিজেদের ওপর আপতিত পরীক্ষাসমূহের ওপর পূর্ববর্তীরা সবর করেছিল।

www.banglakitab.weebly.com

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ

'আর আল্লাহর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই।'

এর কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যেক দা'ঈকে এটা জানতে হবে। এমন কেউ নেই যে আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের পরিবর্তন ঘটাবে। সুতরাং বিজয় আসবেই এবং সেই সাথে সুনিশ্চিতভাবে আসবে বিজয়ের আগের পরীক্ষাগুলো। আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সুন্নাহ বা স্বাভাবিক নিয়মে কোনো ব্যতিক্রম পাবেন না। বিশুদ্ধ তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত দা'ঈ বিপদে পড়বে, ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এটাই আল্লাহ ﷻ-এর সুন্নাহ। একে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। ইউনিভার্সিটি অব ইউসুফ[১৩১] ﷺ লেকচারটি যদি শুনে থাকেন, আমি সেখানে বলেছিলাম উম্মাহর ইতিহাসের সবচেয়ে সম্মানিত আলিমগণ জীবনভর অসংখ্য পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন। ইমাম আবু হানিফা ﷺ-সহ হকপন্থী আলিমগণ কীভাবে জীবনে একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, কী পরিমাণ বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়েছিলেন, তা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এ ছাড়া এমন অনেক বই আছে, যেখানে বিভিন্ন মুজাদ্দিদ ব্যক্তিদের জীবনী ও আলোচনা উঠে এসেছে। যেমন : *সিয়ারু আলামিন নুবালা* (ইসলামের মহানায়কেরা)। ইসলামের ইতিহাসের এই মুজাদ্দিদ ও মহাপুরুষদের মধ্যে এমন একজনও কি ছিলেন যাকে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কোনো ফিতনার মোকাবেলা করতে হয়নি? তাদের সবাইকেই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এটা কি কোনো কাকতাল? না।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ

'এবং অবশ্যই রাসূলদের কিছু সংবাদ তো আপনার কাছে পৌঁছেছে।'

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলছেন যে, আপনার আগে যারা রাসূল হিসেবে এসেছিল, তাদের বেলাতেও আপনার মতোই হয়েছিল। তারাও সম্মুখীন হয়েছেন ফিতনা ও পরীক্ষার। আর বিজয়ী হয়েছেন আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছায়। আপনার বেলাতেও তা-ই ঘটবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাওয়াহ ও ব্যক্তিগত জীবন সব ক্ষেত্রেই একের পর এক ফিতনার মুখোমুখি হয়েছেন। পরীক্ষিত হয়েছেন। আল্লাহ ﷻ তাকে সবরের আদেশ দিয়েছেন–ফাসবির। কুরআনে অন্তত পক্ষে ১১ বার আল্লাহ ﷻ তাঁকে সবরকারী হবার ব্যাপারে সরাসরি আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

'সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম সংযম অবলম্বনকারীদের জন্যই।' (সূরা হুদ, ৪৯)

১৩১ ইলমহাউস পাবলিকেশন থেকে বাংলায় *নবি ইউসুফ ﷺ-এর পাঠশালা* নামে প্রকাশিত।

www.banglakitab.weebly.com

মানুষ যখন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়, যখন সে উম্মাহকে আজকের মতো চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখে, তখন সে আসন্ন বিজয়ের কথা ভুলে যায়। সে ভুলে যায় যে চূড়ান্ত বিজয় আল-মুত্তাকীনের জন্য।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

'সুতরাং (হে মুহাম্মাদ) তারা যা বলে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করুন...।' (সূরা আত-ত্বহা, ১৩০)

আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূল ﷺ-কে বলছেন, ধৈর্য ধরুন, কারণ আপনার ব্যাপারে অনেক কথা বলা হবে। ঘরে বসে থাকলে কেউ আপনার ব্যাপারে কথা বলবে না। কিন্তু দাওয়াহর ময়দানে নামুন, দেখবেন নিজের ব্যাপারে এমন সব আপত্তিকর, ভয়ংকর কথা শুনতে হবে যে, আপনি হয়তো অনেক সময় নিজেই নিজের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠবেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

'সুতরাং আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য।' (সূরা আর-রুম, ৬০)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

'অতএব, আপনি সবর করুন নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।' (সূরা গাফির, ৫৫)

একই সূরা অর্থাৎ সূরা গাফিরের অন্য আরেকটি আয়াত হচ্ছে,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

'সুতরাং, (হে মুহাম্মাদ) আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য।'(সূরা গাফির, ৭৭)

আল্লাহ ﷻ কেন তিনবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন? এটা কেন করা হয়েছে? কুরআনের একটি বিন্দুও অকারণে পুনরাবৃত্তি হয় না। আল্লাহ ﷻ বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা বারবার এ কথা পড়ি এবং অনুধাবন করি যে, মুমিনের জন্য প্রতিকূল অবস্থায় সবর অবলম্বনই হলো একমাত্র সমাধান।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا

'নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করেছি।' (সূরা আল-ইনসান, ২৩)

www.banglakitab.weebly.com

এখানে তানযিলা শব্দের অর্থ পর্যায়ক্রমে। আয়াত শোনার পর মনে হতে পারে যে পরের আয়াতে হয়তো-বা আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা বলা হবে। আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন এবং এর দ্বারা আপনাকে সম্মানিত করেছেন, সুতরাং আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। কিন্তু দেখুন পরের আয়াতে কী বলা হচ্ছে, আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ.....

'সুতরাং (হে মুহাম্মাদ) ধৈর্যের সাথে তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষা করো।' (সূরা আল-ইনসান, ২৪)

আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কথা না বলে বলা হয়েছে, আল্লাহ ﷻ আপনাকে আদেশ করছেন তিনি আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন সে ব্যাপারে ধৈর্য অবলম্বন করার।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ

'আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালার মতো হবেন না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল।' (সূরা আল-কালাম, ৪৮)

এখানে আল্লাহ ﷻ বলছেন, আল্লাহ ﷻ আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তার ওপর ধৈর্যধারণ করুন। মাছের নবির মতো হবেন না, যিনি দাওয়াহ পরিত্যাগ করেছিলেন। যখন বিপদ আপনাকে পেয়ে বসবে, আপনি সবর করবেন।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

'অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন সবর করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ...।' (সূরা আল-আহকাফ, ৩৫)

আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্ববর্তী রাসূলদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, তাদের মতোই সবরকারী হোন। এটা সহজ দায়িত্ব না। এটা যদি সহজসাধ্যই হতো, তবে সবাই এ পথের ওপর অবিচল থাকত। এ চরম বিপদসংকুল, কাঁটা বিছানো এক পথ। কিন্তু এ পথ আপনাকে নিয়ে যাবে ফিরদাউসে। আরাম-আয়েশ, লাল গালিচায় মোড়ানো আরেকটি পথ আছে। কিন্তু সে পথের শেষ গন্তব্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। একে দেখে ভালো মনে হলেও সে পথে যাওয়া যাবে না। বরং আমাদের সেই কষ্টদায়ক, দুর্গম পথে হাঁটতে হবে যে পথ পৌঁছে দেবে সঠিক গন্তব্যে।

ছোট থেকে ছোট ঘটনার কারণে আজ মানুষ নিজের দ্বীন নিয়ে সংশয়ে পড়ে যায়। বারবার সুযোগ খুঁজতে থাকে সঠিক পথ ছেড়ে উল্টো দিকে মোড় নেয়ার জন্য। যখন আপনার মাথায়

www.banglakitab.weebly.com

ধুলো ছুড়ে দেয়া হবে, তখন হয়তো আপনি অভিযোগ করতে পারেন। যখন আপনার মাথার ওপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়া হবে, লোকেরা হাসতে হাসতে দুর্বল হয়ে একে অপরের ওপর গড়াগড়ি খাবে, তখন হয়তো আপনি কিছু বলতে পারেন, অভিযোগ করতে পারেন। যখন গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে কিংবা মারতে মারতে মেরে ফেলার অবস্থা হয়, আর আবু বকর ﷺ ছুটে এসে তাঁকে ﷺ মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেন—এমন অবস্থায় পড়লে হয়তো আপনি অভিযোগের সুরে দু-একটা কথা বলতে পারেন। কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যেভাবে অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল, আপনার বেলাতেও যদি তা-ই করা হয়, তাহলে হয়তো আপনি অভিযোগ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শিয়াব আবু তালিবে ছিলেন, সে অবস্থাকে আপনি অবরোধ, জেল কিংবা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প যেকোনো কিছু বলতে পারেন। সবগুলোই এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি কারাগারে বন্দী হবার মতোই ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে দেখবেন তাহলে আপনার কাছে এটাকে কারাগার অপেক্ষাও বেশি কিছু মনে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য কুরাইশরা তাঁকে ভণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছিল। কোনো মানুষের সাথে না, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছিল স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে প্রতারণার। তারা তাঁকে মাজনুন অর্থাৎ উন্মাদ ব্যক্তি আখ্যা দিয়েছিল। ওয়াল্লাহি, আমি হত্যা ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত এমন অনেক জঘন্য অপরাধীকেও দেখেছি, যারা পাগল পরিচয়ে অল্প সময়ে মুক্তি পাওয়ার বদলে বরং বাকিটা জীবন কারাগারেই কাটিয়ে দেয়াকে বেছে নেয়।[১৩২] সারা জীবন কারাগারে কাটাবে, তবু পাগলের খাতায় নাম আসবে, এটা তারা মেনে নিতে পারে না। বিকল্প যখন আমৃত্যু বন্দিত্ব তখনো আত্মসম্মানবোধ তাদের পাগলের খেতাব মেনে নিতে বাধা দেয়। অথচ আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাগল ও উন্মাদ আখ্যা দেয়া হয়েছিল। আর কাউকে পাগল অভিহিত করা অত্যন্ত গুরুতর একটি ব্যাপার, যেনতেন বিষয় না। কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই না, বরং তাঁর আগের নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালামদেরও একই নামে ডাকা হতো। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

> 'এমনিভাবে, তাদের কাছে পূর্বের যে রাসূলই আগমন করেছে, তারা বলেছে, এক জাদুকর, না হয় উন্মাদ।' (সূরা আয-যারিয়াত, ৫২)

আমাদের নবিজি ﷺ-কে তারা এমন নামে আখ্যায়িত করেছিল যেটাকে আজ আমরা বলি অযোগ্য ও অপদার্থ ব্যক্তি—নিষ্কর্মা, বাউন্ডুলে, ভবঘুরে—আউযুবিল্লাহ। আমার জীবন, আমার আত্মা, আমার অন্তর, আমার পরিবার ও আমার সম্পদ সবকিছু আমার হাবিব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কুরবান হোক। আমার নবিজি ﷺ-এর ব্যাপারে তারা এত জঘন্য কথা বলেছিল।

---

১৩২ Insanity Plea- আসামী যদি আদালতে নিজেকে অপ্রকৃতস্থ বা উন্মাদ প্রমাণে সমর্থ হয় তাহলে অপরাধ প্রমাণিত হবার পরও শাস্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম হবার সম্ভাবনা থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا

'এবং তারা যখন আপনাকে দেখে, আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। তারা বলে, এই-ই কি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন?' (সূরা আল-ফুরকান, ৪১)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, তারা বিদ্রুপ করে। বিদ্রুপ ও হাসি-তামাশার লক্ষ্যবস্তু হওয়া অত্যন্ত কষ্টের। তারা বলেছিল, আল্লাহ কি এই লোককে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? একে? আল্লাহ কি এর চেয়ে ভালো কাউকে পেলেন না? তারা সবাই বসে হাসি-তামাশা করতে করতে বলত,

أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا

'এই-ই কি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন?'

তারা ঘৃণাভরে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে এবং বলত আল্লাহ কি এই লোকের চেয়ে ভালো আর কাউকে পেলেন না?

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

'তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না?' (সূরা আয-যুখরুফ, ৩১)

অর্থাৎ, মক্কার বাইরের কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তির ওপরে কেন কুরআন নাযিল করা হলো না? আল্লাহ কি তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে খুঁজে পাননি?

কুরআনে বহুবার এ বিষয়টি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি ﷺ-গণ হাবশাতে (আবিসিনিয়া) নাজ্জাশির ভূমিতে শরণার্থী। বাকিদের অনেককে নির্যাতন করা হয় তপ্ত রোদের নিচে। খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাথর মারা হয়। এমন অবস্থায় তিনি আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে হিজরতের নির্দেশ পেলেন। পথে তাঁর প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সাথে আশ্রয় নিলেন সাপ-বিচ্ছু ভরা এক গুহায়। তাদের দুজনকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে চারিদিকে। এমন অবস্থায়ও তিনি সত্য থেকে নড়েননি। সবর করেছেন। কাসিম, আবদুল্লাহ, ইবরাহিম, যয়নব, রুকাইয়াহ ও উম্মু কুলসুম, একের পর এক তাঁর সব সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল। ফাতিমা ﷺ-ই ছিলেন একমাত্র সন্তান, যিনি তাঁর জীবদ্দশার শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বেঁচে থাকতেই ফাতিমা ﷺ-এর মৃত্যুকাল সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। একের পর এক বিপদ, একের পর ফিতনা, একের পর এক পরীক্ষা তাঁর ওপর এসেছিল। ব্যক্তিগত ও দাওয়াহ-জীবনের উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে এসবের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। অথচ

www.banglakitab.weebly.com

আজ আমরা আমাদের বাবা-মা কিংবা সন্তানদের কোনো একজনকে হারিয়েই বিমর্ষ হয়ে পড়ি, যেন এ বিপর্যয়ের পর আর ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব না। অথচ একমাত্র ফাতিমা ﵂ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সব সন্তানকেই হারিয়েছিলেন। এমনকি জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলোতেও তিনি কষ্ট থেকে মুক্তি পাননি। বুখারি ও মুসলিমের একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন ইবনু মাসউদ ﵁ তাঁকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন জ্বরে কাঁপছিলেন। তাঁর দেহে হাত রেখে ইবনু মাসউদ ﵁ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি খুবই অসুস্থ। ইবনু মাসউদ ﵁ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে দুজন মানুষের যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে। ইবনু মাসউদ ﵁ প্রশ্ন করলেন, আপনার জন্য কি পুরস্কারও দ্বিগুণ হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমি দ্বিগুণ পুরস্কার পাব।[১৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াসিলাহর অধিকারী এবং নিঃসন্দেহে এর দাম অত্যন্ত চড়া। কাজেই আপনি যদি আল্লাহ ﷻ-এর নিকটবর্তী হতে চান, যদি ওয়াসিলাহর নিকটবর্তী হতে চান এবং আল্লাহ ﷻ-এর আরশের যথাসম্ভব কাছাকাছি হতে চান–তবে যত শক্তভাবে সম্ভব এই পথকে আঁকড়ে ধরুন। এই সত্য প্রচার করুন। মানুষকে এর দিকে আহ্বান করুন, এবং অন্তর্ভুক্ত হোন সবরকারীদের। এটাই আপনার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ। দাওয়াহর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান বৈশিষ্ট্য ছিল সবর। প্রতিশোধ নিতে চাইলে পুরো আরবের জন্য তিনি তাইফবাসীকে দৃষ্টান্ত বানাতে পারতেন। পর্বতের চূড়া থেকে মক্কার উপত্যকা পর্যন্ত প্রবাহিত হতো তাইফবাসীদের রক্ত এবং কুরাইশসহ সমস্ত আরব উপদ্বীপের সকলে জানতে পারত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ্য হবার পরিণাম কী। কোনো দিনই তারা এই শিক্ষা ভুলতে পারত না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর যেকোনো হুকুম বাস্তবায়নে প্রস্তুত পর্বতের ফেরেশতাদের উদ্দেশে তিনি ﷺ বলেছিলেন, ওদের ছেড়ে দাও, হয়তো তাদের মধ্য থেকে এমন কেউ আসবে যে আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদাত করবে।[১৩৪] যখনই কোনো বিপদ এসেছে, পরীক্ষা এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বেশি আশা ও উদ্যম নিয়ে তাঁর দাওয়াহর দায়িত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিপদ যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই তিনি সুনিশ্চিত হয়েছেন বিজয়ের ব্যাপারে। কেননা, তাঁর চোখের সামনে ছিল সেই আয়াত–ফাসবির। কারণ, সবর ব্যতীত বিজয় আসে না। এ শিক্ষা সব সময় মনে রাখবেন।

একজন দা'ঈ তার কঠিনতম মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী হবে :

সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্তগুলোতে সাহাবি ﵃-দের অনুপ্রাণিত করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শোনাতেন। এ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, পরিস্থিতি যখন অন্য সবার কাছে সবচেয়ে তিক্ত ও কঠিন মনে হয়, একজন দা'ঈ সে মুহূর্তেই

১৩৩ *সহিহুল বুখারি* : ৫৬৪৮; *সহিহ মুসলিম* : ৬৭২৪
১৩৪ *সহিহুল বুখারি* : ৩২৩১; *সহিহ মুসলিম* : ৪৭৫৪

www.banglakitab.weebly.com

সবচেয়ে বেশি আশার আলো দেখতে পান। বিপদের মুহূর্তগুলোতে একজন দা'ঈ হবেন সুস্থির, আশ্বস্ত, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়। কারণ, তিনি জানেন বিজয় নিকটবর্তী এবং তিনি জানেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাল ধরাই তাঁর দায়িত্ব।

দেখুন, বিজয়ের প্রতিশ্রুতিগুলো কীভাবে কঠিনতম বিপদের সময়গুলোতে এসেছে। খন্দকের দিনগুলো ছিল উম্মাহর সবচেয়ে বিপদসংকুল মুহূর্তগুলোর অন্যতম। মরুভূমির হাড় কাঁপানো ঠান্ডার সাথে যুক্ত হয়েছিল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি। সাহাবি ﷺ-গণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সমগ্র দুনিয়া যেন তাদের বিরুদ্ধে একত্রীভূত হয়েছিল।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

'সে সময়ে মুমিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।' (সূরা আয-যুখরুফ, ৩১)

তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। গাতফান, নাজদ, মুররাহ, আশজা, কুরাইশসহ সব গোত্র তাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল মদীনার উপকণ্ঠে বাস করা ইহুদিরা। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারের এ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আশাবাদী। পুরো দুনিয়া তার বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সম্মিলিত সেনাদল তাঁর সামনে আর তিনি বলছেন, আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব। আমরা শুধু এই শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হব না, আমরা বিজয়ী হব দুই সুপারপাওয়ার রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের ওপরেও। এমন এক অবস্থায় তিনি এ কথা বলেছিলেন যখন দুনিয়ার বুক থেকে তাঁর দাওয়াতের নাম ও নিশানাটুকু মুছে ফেলতে শত্রুরা একত্র হয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-সহ ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই ছিল সম্মিলিত কুফফার বাহিনীর উদ্দেশ্য। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, সমগ্র সানআহর ওপর আমরা বিজয়ী হব। আমরা বিজয়ী হব পূর্ব-পশ্চিমের ওপর, মধ্যবর্তী অঞ্চলের ওপর। পুরো দুনিয়া হবে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।[১৩৫]

অন্তরে ব্যাধিগ্রস্তরা বলছিল, তোমরা কি এই ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করছ? যে লোক জান বাঁচাতে পরিখা খুঁড়ছে সে কিনা বলছে দুনিয়ার সুপার পাওয়ারগুলো তাঁর কাছে পরাজিত হবে? আমরা তো আজ নিজেদেরও রক্ষা করতে পারছি না। কয়েক কদম দূরে গিয়ে প্রাকৃতিক কাজ সারতেও আমরা ভয় পাচ্ছি, আর সে তোমাদের সমগ্র দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বের কথা শোনাচ্ছে?

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

'এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ (সংশয়) ছিল তারা বলছিল, আল্লাহ ও রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।' (সূরা আল-আহযাব, ১২)

১৩৫ আর-রাহিকুল মাখতুমসহ অন্যান্য সীরাতগ্রন্থে বর্ণনাটি এসেছে। কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা এসেছে *সুনানুন নাসাঈতে।*

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু সেই অন্ধকার মুহূর্তে পরিস্থিতির অবনতির সাথে সাথে মজবুত হচ্ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুমিনদের ঈমান। পরিস্থিতি যত খারাপ হয়, তাঁদের ঈমান তত বৃদ্ধি পায়। যখন ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো ঈমান আরও মজবুত হলো। শেষ মুহূর্তে গোত্রগুলো যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাদের ঈমান আরও মজবুত হলো। সবশেষে ১০ হাজারের সেনাবাহিনী কয়েক গজের ব্যবধানে এসে দাঁড়াল।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

> ‘এবং মুমিনরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল, তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আর এতে তাঁদের ঈমান ও আনুগত্যই কেবল বৃদ্ধি পেল।’ (সূরা আল-আহযাব, ২২)

মুমিনরা বলল, আমরা তো এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। এই সেই চরম বিপদের মুহূর্ত, কিন্তু আমরা এরই জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একজন দা’ঈ যতক্ষণ সত্য ও সঠিক পথের ওপর থাকবে, বিপদ ও প্রতিকূলতার সাথে সাথে তাঁর আশা ও আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকবে। আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের প্রতি তাঁর আশা-ভরসাও তত বাড়তে থাকবে। রাত চিরস্থায়ী হয় না। রাত তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার, তারপরই অন্ধকারের বুক চিরে আসে ভোরের সূর্য।

*তিরমিযি*তে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, সাদ رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟

> অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ সবচেয়ে বেশি কাকে পরীক্ষা করা হয়?

ইসলামের মূলনীতি ও ধারণাগুলোর ব্যাপারে ধারণা না থাকলে এ প্রশ্নের জবাবে আমি হয়তো বলতাম, সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয় গুনাহগার ব্যক্তিদের। যিনা, ব্যভিচারকারী ও ধর্ষক—এ ধরনের লোকেরা সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ

> ‘নবি-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ঈমান অনুযায়ী, তাঁর দ্বীনের অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যার ঈমান যত মযবুত হয়, তার পরীক্ষাও তত কঠিন হয়।’

কেউ দ্বীনের ওপর মযবুত হওয়াটা কি যথেষ্ট? সে কি নিজেকে সত্যিকারভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে? না। কারও দ্বীন যদি মযবুত হয় তবে তাকে আরও পরীক্ষা দেয়া হয়। নিজের আমল,

www.banglakitab.weebly.com

নিজের দ্বীনদারির মাধ্যমে যে জান্নাতের দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে, পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে তুলে আনা হয় জান্নাতের তৃতীয় স্তরে। যখন বান্দা জান্নাতের তৃতীয় স্তরে পৌঁছানোর অবস্থায় আসে, আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে জান্নাতের আরও ওপরের স্তরে উঠিয়ে নেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন, তাই তিনি চান আপনি আরও উঁচু স্তরে পৌঁছান। তিনি চান আপনি যতটা সম্ভব আরশের কাছাকাছি অবস্থানে আসুন।

وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ

আর যদি ঈমান অতটা মযবুত না হয়, তাহলে তাঁর পরীক্ষাও সে অনুপাতেই হয়।

এমন মানুষ কেবল জান্নাতের দরজার ভেতরে অবস্থানের সুযোগটুকু পায়। এটাই তার জায়গা এবং সে এখানেই অবস্থান করে।

فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

একের পর এক পরীক্ষা আসতে থাকে, যতক্ষণ না বান্দা একেবারে পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, নিষ্পাপ অবস্থায় বিদায় নেয় দুনিয়ার বুক থেকে।[১৩৬]

আল্লাহ ﷻ আপনাকে পবিত্র করতে চান, পরিশুদ্ধ করতে চান। তিনি চান আপনি নিষ্পাপ অবস্থায় তাঁর মুখোমুখি হবেন যাতে আপনার স্থান হয় তাঁর মহাপবিত্র আরশের কাছে। সোনাকে পরিশুদ্ধ করা হয় আগুনে পুড়িয়ে। যত পোড়ানো হয়, তত তা হয়ে ওঠে খাঁটি ও নিখুঁত। কিন্তু পরিশোধনের এই প্রক্রিয়াটি মোটেও সহজ না। এ জন্য স্বর্ণকে পোড়াতে হয় এক হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াসের চেয়েও বেশি উত্তপ্ত আগুনে। তাই পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মনে রাখবেন আল্লাহ ﷻ আপনাকে পরিশুদ্ধ করছেন, পবিত্র করছেন। পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ আপনাকে পরিশুদ্ধ ও খাঁটি করতে চান।

আজ সকালে ঘণ্টা খানেক আগে ব্রিটেনের একজন দা'ঈর সাথে কথা বলছিলাম। জনসাধারণ ও যুবকদের দাওয়াহ করতে, তাদের ইলম শেখানোর ব্যাপারে আমি তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছিলাম। এটাই ছিল নূর আদ-দ্বীন জিংকির এই পদ্ধতি এভাবে তিনি একটি প্রজন্ম তৈরি করেছিলেন, আর এটাই সঠিক পদ্ধতি। সেই ভাই বললেন, আমার কোনো লেকচারের কথা ঘোষণা করা হলেই পুলিশ সেটা বন্ধ করে দেয়। আমি বললাম, এই অবস্থা তবু এখানকার (অ্যামেরিকা) চেয়ে ভালো, এখানে মুসলিমরাই বরং এমন আচরণ করে। আমাদের এখানে অনেক মাসজিদ আছে, কিন্তু তাঁর একটিতেও উসুল আস-সালাসাহ পড়াতে দেয়া হয় না। প্রতিটি দারসের জন্য অনেক খুঁজে খুঁজে জায়গা বের করতে হয় এবং কোনোরকম প্রচারণাও আমরা চালাতে পারি না। কারণ, আমাদের এত লোক জায়গা দেয়ার মতো সামর্থ্য নেই। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, জায়গার অভাবে বোনদের চলে যেতে বলতে হয়। আমাদের এই এলাকাতে মাসজিদের

১৩৬ *সুনানুত তিরমিযি* : ২৩৯৮; *সুনানুদ দারিমি* : ২৮৩৯

www.banglakitab.weebly.com

সংখ্যা কতগুলো আমি ঠিক জানি না, তবে ১৫ কিংবা তার বেশিও হতে পারে। এগুলোর মধ্যে কোনো একটি মাসজিদ থেকে আমাকে কখনো বক্তব্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় না, সুযোগও দেয়া হয় না। দু-সপ্তাহ আগে হঠাৎ করে এক মাসজিদের ব্যবস্থাপনায় কিছু অদল-বদল হলো। তারা বড় আকারের একটি ইভেন্ট আয়োজন করছিল, সেখানে একজন ব্যক্তি–আল্লাহ ﷻ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন–বললেন, আমি শায়খ আহমাদকে আমন্ত্রণ জানাব এবং তিনি তা-ই করলেন। আমি বললাম, আমার আপত্তি নেই কিন্তু আপনি দেখুন অন্যান্য লোকজন এতে রাজি কি না। পোস্টার ছাপানোমাত্রই লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করল, সাবধান! এই লোকের পেছনে তো অ্যামেরিকান সরকারের নজরদারি আছে, আমরা চাই না সে এখানে আসুক। কীভাবে আপনারা এমন লোককে আমন্ত্রণ জানান?

আমি সব সময় বলি, আমাদের কথায় কোনো ভুল থাকলে আসুন বিতর্ক হোক। আমরা সব সময় বিতর্কের জন্য প্রস্তুত, আর বিতর্কের ময়দান তো বিস্তৃত। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রতিপক্ষ হলো মর্ডানিস্ট, গোমরাহ এবং এ-জাতীয় অন্যান্য লোকজন, তাই বিতর্কের পর আমরা মুবাহালা[১৩৭] করব। দেখা যাক কারা আসলে ভুলের ওপর আছে। বিতর্কের পর দুপক্ষ দুআ করবে–যে পথভ্রষ্ট, যে সত্য থেকে বিচ্যুত, যে ভুলের ওপর আছে, যে তাওহিদের পথের বদলে অন্য কোনো মতাদর্শ বেছে নিয়েছে তার ওপর যেন আল্লাহ ﷻ-এর গযব নেমে আসে। আসুন। ইন শা আল্লাহ একটি ভুলও তারা দেখাতে পারবে না, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা নির্ভুল হবার দাবি করি না। আমি গর্ব করছি না, অহংকারও করছি না, কিন্তু আসুন বিতর্ক হোক। বিইযনিল্লাহি তাআলা, উপস্থিত সকলে দেখতে পাবে কারা আসলে বিদ্রুপের উপযুক্ত। কুফফারদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুসলিম ভাইদের আক্রমণ করা এই বিভ্রান্ত মর্ডানিস্টরাই। অনেক সময় আপনি ডানে-বামে তাকিয়েও একজন সমর্থক দেখতে পাবেন না। আবার অনেক সময় প্রচুর কোলাহল শুনতে পাবেন, কিন্তু কাউকে পাশে পাবেন না। *উসূল আস-সালাসাহ* নিয়ে আমাদের আলোচনার দশটি দারস সম্পন্ন হলো। এর মাঝে আপনারা কি এমন কোনো কিছু পেয়েছেন যেটা দ্বীনের সাধারণ বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে না? মূলত এগুলো হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক জ্ঞান, যা ছেলে-বুড়ো সবারই জানা উচিত।

বর্তমানের মাসজিদগুলোর অবস্থা মুহাম্মাদ ইকবালের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি

১৩৭ 'মুবাহালা' শব্দটি আরবি 'বাহলাহ' থেকে উদ্‌গত, যার অর্থ 'অভিসম্পাত।' আক্ষরিক অর্থে 'মুবাহালা' শব্দটির অর্থ একে অন্যের ওপর অভিসম্পাত করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাযরানের খ্রিষ্টানদের সাথে মুবাহালা করেন। ৯ম হিজরি সনের ২৪শে যুলহিজ্জাহ মুবাহালার আয়োজন করা হয়। সুরা আলি ইমরানের ৬১ নং আয়াতটি এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল :

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

'তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এ সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলো, এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।'

www.banglakitab.weebly.com

বলেছিলেন,

وجلجلة الأذان بكل حى- ولكن أين صوت من بلال

منائركم علت فى كل حى- ومسجدكم من العباد خال

আযানের ধ্বনি তো বাজে চারিদিকে, কিন্তু কোথা সেই বিলালের সুর?
চারিদিকে কত সুউচ্চ মিনার, কিন্তু মাসজিদ তো হয়ে গেছে আবেদশূন্য।

আমি তাঁর অনুকরণে, কিছুটা বদলে বলব,

ومسجدكم من صيحة الحق خال

প্রতিদিন আপনি মাসজিদে গিয়ে শুনতে পান নতুন মাসজিদ বানানোর জন্য সাদাকাহ তোলা হচ্ছে। একের পর এক ইটের গাঁথুনি ফেলা হয়, একের পর মাসজিদ তৈরি হয়

ولكن أين صوت من بلال

কিন্তু কোথায় সেই বিলালের কণ্ঠস্বর?

যখন কাফিরদের ওপর কোনো দুর্যোগ আসে এরা নিন্দা জানাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন বিপর্যয় আসে কোনো মুসলিমের ওপর, ওয়াল্লাহি আশেপাশে কাউকে দেখতেও পাওয়া যায় না। কাফিররা আক্রান্ত হলে সবাই এর নিন্দা জানাতে উঠেপড়ে লেগে যায়। অথচ কারাগারে মুমিনদের ওপর যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে কিংবা উম্মাহ আজ যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে কথা বলার একজনও কি পাওয়া যায়?

ومسجدكم من صيحة الحق خال

শহরে শহরে গড়ে উঠেছে সুউচ্চ মিনার, কিন্তু হকের বাণী উচ্চারিত হয় না আজ সেথায়।

এই হলো উম্মাহর আজকের দুঃখজনক বাস্তবতা।

www.banglakitab.weebly.com

দারস ১১

সবর নিয়ে আরও আলোচনায় যাবার আগে সবরের সাথে সম্পর্কিত একটি কাহিনি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমার কাছে একটি ফিকহি প্রশ্ন এসেছে, যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের আচরণ কেমন হবে? মুসলিমরা কি তার কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করতে পারবে? আমরা কি তার জন্য দুআ করতে পারব? তার জন্য জানাযার সালাত পড়া কি বৈধ হবে?

আসলে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা আমার মূল উদ্দেশ্য না, তবে যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে, আমি উত্তর দিচ্ছি—হ্যাঁ, আত্মহত্যাকারীর জানাযার সালাত পড়া উচিত। এ ব্যাপারে আলিমদের সঠিক মত হচ্ছে, আত্মহত্যা করা কুফরি না। এটি কবীরা গুনাহ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কেবল আত্মহত্যার কারণে কেউ কাফির হয়ে যায় না কিংবা কারও তাওহিদ বাতিল হয়ে যায় না। আত্মহত্যা করা ব্যক্তিও মুসলিম। তাই অবশ্যই তার জানাযা ও দাফন-কাফন সম্পন্ন করা উচিত, অন্যান্য মুমিনদের সাথে তাদের সমাধিস্থ করা উচিত এবং আমাদের উচিত তাদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করা। তবে আত্মহত্যা করা ব্যক্তি যদি জীবিত অবস্থায় সালাত আদায় না করে, তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ। যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, সে কাফির—এ মতটিকেই আমি সঠিক মনে করি।[১৩৮] এমন ব্যক্তি যদি দাবি করে যে

---

১৩৮ ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে ইমামগণের দুটি মাযহাব আছে। ইমাম আবু হানিফা, শাফিয়ি ও মালিক رحمهم الله-এর মতে সালাত পরিত্যাগ করা ফিসক বা কবীরা গুনাহ। তবে তারা তার শাস্তির ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফিয়ি ও মালিক رحمهما الله-এর মত হলো : তাকে হদ তথা শারীয়াহ-নির্ধারিত শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে। আর ইমাম আবু হানিফা رحمه الله-এর মত হলো : তাকে তা'যিরি তথা শাসনমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে, হত্যা করা হবে না। আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইবরাহিম আন-নাখয়ি, হাকাম ইবনু উতাইবা, আইয়্যুব সাখতিয়ানি, আবু দাউদ আত-তায়ালিসি, ইবনু আবি শাইবাহ, যুহাইর ইবনু হারব رحمهم الله প্রমুখ ইমামদের মতে কুফর। তাই তাদের মত হলো, তাকে তিন দিন পর্যন্ত তাওবাহর সুযোগ দিতে হবে, তাওবাহ না করলে হত্যা করতে হবে।

সাহাবা رضي الله عنهم-দের মধ্য থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবনু আউফ, মুয়ায ইবনু জাবাল, আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ এবং আবু দারদা رضي الله عنهم প্রমুখ থেকে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি رحمه الله তার জামিয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম গ্রন্থে এ ব্যাপারে ইজমার দাবি করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com

অলসতাবশত সে সালাত আদায় করেনি, তবুও সে কাফির। সালাতের প্রশ্ন এলে হিসেব সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু যদি সে সালাত আদায়কারী হয়, আর তারপর আত্মহত্যা করে, তবে সে কবীরা গুনাহকারী হিসেবে গণ্য হবে। আলিমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা পড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন যে, তিনি জানাযা পড়াননি অন্যদের আত্মহত্যা থেকে বিরত রাখার জন্য। আলিম, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং শাসকদের উচিত আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অন্যদের আত্মহত্যা থেকে বিরত রাখতে পারেন। কেননা, এর ফলে সবাই চিন্তা করবে আত্মহত্যা করলে তার জানাযা নাও হতে পারে। এই চিন্তা একজন ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করার আগে দ্বিতীয়বার মতো ভাবাবে।

এ প্রশ্নগুলো আমার কাছে এসেছে একজন যুবকের আত্মহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে। যুবকটির ঘটনা বিস্ময়কর। সে তেইশ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি যুবক। কুরআনের হাফিয। সে সালাতের ব্যাপারে সচেতন ছিল, কেউ তাকে কখনো এক ওয়াক্ত সালাত কাযা করতে দেখেনি। এমনকি আত্মহত্যার দিনও সে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করেছিল। সে পরিচিত ছিল নেককার হিসেবে। ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি যে এ ধরনের কিছু সে করতে পারে। মানুষের কাছ থেকে তার ব্যাপারে বারবার যা শুনেছি সেটুকুই আপনাদের বলছি। ছেলেটির লম্বা দাড়ি ছিল, তার সব আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল ইসলাম। আসরের কয়েক ঘণ্টা পর গৃহপরিচারিকা রুমে গিয়ে তাকে দড়ির সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

আরেক বোনের ঘটনা, তিনি প্রথমে আমাকে টেক্সট করেছিলেন। তারপর আনুমানিক ভোর চারটার দিকে আমাকে ফোন করে বললেন, তিনি বাথরুমে ঢুকে হাতের কবজির রগ কাটার চেষ্টা করছেন। আমাকে যখন ফোন করেছেন তখন অলরেডি হাত কাটা শুরু করে দিয়েছেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে (আসলে সেটা বেশ বড়সড় রকমের ঝগড়া ছিল)। আমি বললাম, তার সাথে ঝগড়ার কারণে আপনি জাহান্নামে এক মিলিসেকেন্ড শাস্তি ভোগ করবেন, আপনার কাছে কি এটা সঠিক মনে হচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ এতে কাজ হলো। তিনি হাত কাটা বন্ধ করলেন। এখন তাঁর অবস্থা ভালো। কিন্তু একবার ভাবুন, তিনি যদি সেদিন আত্মহত্যা করে ফেলতেন, তাহলে আজ কী অবস্থা দাঁড়াত? আল্লাহ ﷻ তাঁকে, তাঁর সন্তানদের এবং আমাদের বোনদের প্রশান্তি ও সুখময় জীবন দান করুন।

মানুষ আরামে থাকা অবস্থায় সবরের বিষয়টিকে অবহেলা করে। অনেকেই সবর-সম্পর্কিত আলোচনা ও শিক্ষাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করেন না। মূলত এ কারণে এ-জাতীয় সমস্যাগুলো দেখা দেয়। যাদের সবরের সক্ষমতা নেই, তারা পরীক্ষা, হতাশা, দুশ্চিন্তা ও দুঃসময়ে নিজেদের বাঁচাতে পারে না। একদিন এভাবে মানুষ ঈমানহারা হয় কিংবা তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেউ কেউ এগুলোর দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত হয় যে, একেবারে

www.banglakitab.weebly.com

পাগল হয়ে যায়। অনেকে চিন্তা করে আত্মহত্যার কথা। কিন্তু মাত্র একটি আয়াত কিংবা হাদিস, সবর-বিষয়ক কোনো কাহিনি অথবা ওপরে উল্লেখ করা ঘটনাগুলোর মতো দৃষ্টান্ত যদি কারও মাথায় থাকে, তবে সাথে সাথে সে এ চিন্তা থেকে সরে আসবে। এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য আসলে এটাই ছিল যে, আপনারা এগুলো অন্তরে বসিয়ে নেবেন।

সত্যের পথ দুঃখ-কষ্টে ঘেরা :

সবর নিয়ে আমরা বেশ লম্বা আলোচনা করেছি। এ আলোচনার মূল শিক্ষা হলো হকের অনুসারী ব্যক্তির জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসাটা খুব স্বাভাবিক। বহু বছর আগে আমি ইবনু হাযম ﷬-এর একটি লেখা পড়েছিলাম, যেখানে তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি হকের ওপর আছে অথচ সে মনে করে তাকে কোনো দিন কোনো দুঃখ-কষ্ট, পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে না, সে উন্মাদ। আপনি যদি হক পথে থেকেও আশা করেন যে আপনাকে কোনো বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হবে না, তাহলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

পরীক্ষিত হওয়া ছাড়া কেউ ইমাম হতে পারে না। এমন একজন ইমাম পাবেন না যিনি পরীক্ষিত হননি।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

'এবং যখন তারা ছিল সবরকারী, আমি তাদের (বনি ইসরাইল) মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে লোকদের পথপ্রদর্শন করত...।' (সূরা আস-সাজদাহ, ২৪)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, আমি তাদের মাঝে থেকে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করেছিলাম। কখন?

যখন তারা ছিল সবরকারী।

এই দ্বীন মহান, একমাত্র মহানেরাই একে বহনের ক্ষমতা রাখে। তারা মহান হয়ে ওঠেন ক্রমাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। একদিন না একদিন সব পরীক্ষার অবসান ঘটে। একসময় মেঘ কেটে যায়, পরীক্ষাও একসময় শেষ হয়। যে পরীক্ষা, যে বিপদই আসুক না কেন একদিন তা দূরীভূত হবে অথবা আপনিই পরীক্ষাকে রেখে গাফুরুর রাহীমের কাছে চলে যাবেন। পরীক্ষা চলাকালীন হয়তো আপনার মৃত্যু আসবে। অনেক আলিম বলে থাকেন, প্রতিটি জিনিসই শুরুতে ছোট থাকে আর সময়ের সাথে সাথে তা বড় হয়, ব্যতিক্রম হলো পরীক্ষা। সুবহান আল্লাহ, পরীক্ষা শুরুতে বেশ বড় আকারে দেখা দেয় কিন্তু সময়ের সাথে আস্তে আস্তে তা মলিন হতে থাকে, একসময় ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। পরীক্ষা হলো মুমিনের সম্মান এবং পরিশুদ্ধির উপায়।

ইমাম আহমাদ ﷬ তাঁর কিতাবুয যুহদ ও মুসনাদে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। আবু সাঈদ

www.banglakitab.weebly.com

আল-খুদরি ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে হাত রাখলেন, বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার এত জ্বর যে আমি কাপড়ের ওপর দিয়েও আপনার শরীরে হাত রাখতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন,

আমরা নবি-রাসূলরা এভাবেই দ্বিগুণ বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হই, ঠিক যেভাবে আমরা দ্বিগুণ প্রতিদান পেয়ে থাকি। একজন নবি উকুনের সংক্রমণ দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর শরীরে উকুন বাসা বেঁধেছিল, কুঁড়ে কুঁড়ে তাঁর মাংস খেয়েছিল এবং এভাবেই যন্ত্রণায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অনেক নবি-রাসূল এত বেশি দরিদ্র ছিলেন, অনাহারের কারণে এত দুর্বল ছিলেন যে একটিমাত্র জোব্বা কিংবা 'আবা'র (কমদামি উলের বস্ত্র) ওজন তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। আরেক বর্ণনায় আছে, তাঁরা একটি জোব্বা উঁচু করে তুলে ধরতে পারতেন না। অভুক্ত থাকার কারণে তাঁরা এতটা দুর্বল ছিলেন যে, একটি পাতলা জামাও তাঁদের কাছে এত ভারী মনে হতো। সেটা গায়ে দিয়ে হাঁটতে পারতেন না। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ক্লিষ্ট তাঁদের দুর্বল, শীর্ণকায় দেহ একটি কাপড়ের ভারও বহন করতে পারত না।

হাদিসটি কি শুধু এতটুকু? না, সুবহানাল্লাহ! তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

'তাঁরা এই পরীক্ষাতে সেভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন, যেভাবে তোমরা তোমাদের সমৃদ্ধি নিয়ে সন্তুষ্ট।'[১৩৯]

আল্লাহ ﷻ বলেন :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

> তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবি ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাঁদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী। (সূরা আল-বাকারাহ, ২১৪)

আপনি কি মনে করছেন আপনি জান্নাতে যাবেন যখন জান্নাতবাসীদের একজন হলেন আম্মার ﵁? আপনি আর আমি কি সেই জান্নাতে যাব যেখানে আম্মার ﵁ গিয়েছেন? তিনি যেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং আল্লাহ ﷻ-এর স্বার্থে সহ্য করেছিলেন, আপনি আর আমি কি তার ছিটেফোঁটাও দ্বীনের জন্য করেছি? তারপরও কি আমরা তাঁর সমান মর্যাদা পাব? আমিও কি সেই একই জান্নাতে যাব যেখানে বিলাল ﵁ যাবেন? অথচ বিলাল ﵁ পরীক্ষিত হয়েছিলেন আর তিনি ছিলেন পরীক্ষায় দৃঢ়। তিনি আর আপনি কি সমান? আপনি

১৩৯ *মুসনাদু আহমাদ* : ১১৮৯৩

www.banglakitab.weebly.com

কি ধরে নিয়েছেন যে, আপনি জান্নাতে চলে যাবেন অথচ পূর্ববর্তীদের মতো আপনার ওপর কোনো বিপদ আসবে না?

তাদের ওপর কী কী বিপদ এসেছিল?

مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

'তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবি ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাঁদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।'

মুখে ঈমানের দাবি করলেই জান্নাত পাওয়া যায় না। বিশৃঙ্খলা ও এলোমেলো পথচলার মাধ্যমে জান্নাত পাওয়া যায় না। জান্নাত কোনো সস্তা বুলি না। দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই কেবল জান্নাতের দেখা মেলে। অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে, বিজয় তত কাছে আসে, আর জান্নাতে পৌঁছানো যায় পরীক্ষা ও ফিতনা অতিক্রম করার মাধ্যমে।

পরীক্ষা গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধির উপায় :

ইমাম আহমাদ, নাসায়ি, ইবনু হিব্বান, আল-হাকিম ও আল-বাযযার ﷭ নিচের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন :

একবার এক বেদুইন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ قَطُّ

তুমি কি কখনো 'উম্ম মিলদাম' দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলে?

লোকটি বলল, 'উম্ম মিলদাম কী?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন,

حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ

এটি হলো এক ধরনের জ্বর যা চামড়া ও হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করে।

আসলে উম্ম মিলদাম দ্বারা মূলত জ্বর বোঝানো হয়। বেদুইনটির কখনো জ্বর হয়নি, এমনকি সে জানতই না যে এটি কী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আবারও প্রশ্ন করলেন,

فَهَلْ أَخَذَكَ هَذَا الصُّدَاعُ قَطُّ

www.banglakitab.weebly.com

তোমার কি কখনো মাথাব্যথা হয়েছে?

সে বলল, 'মাথাব্যথা কী?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ

স্নায়ুঘটিত কারণে মাথার অভ্যন্তরে অনুভূত ব্যথা।

সে বলল, না, আমার কখনো এমন হয়নি। সে জানতই না মাথাব্যথা কী।

যখন লোকটি চলে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

'কেউ যদি জাহান্নামী কোনো লোক দেখতে চায়, সে যেন একে দেখে নেয়।'[১৪০]

এ বেদুইনটি ছিল এমন এক ব্যক্তি যার কখনো জ্বর হয়নি, মাথাব্যথা হয়নি, কোনো ধরনের পরীক্ষা তার ওপর আসেনি–আর তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কেউ জাহান্নামী কোনো ব্যক্তি দেখতে চাইলে যেন এই বেদুইনের দিকে তাকায়। সব সময় যে এমনটা হবে তা নয়, তবে এটাই অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে।

এক সহিহ হাদিসে এসেছে, মুমিন গাছের কচি শাখার মতো। গাছের কচি সবুজ শাখা বাতাসে ক্রমাগত ডানে-বামে দোল খেতে থাকে। একজন মুমিনের জন্য পরীক্ষাও তেমনই। জীবনে চলার পথে মুমিন বারবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কচি শাখার মতো তাঁর জীবনও পরীক্ষার দমকা বাতাসে ডানে-বামে দুলতে থাকে। সাধারণত কেউ পরীক্ষার মুখোমুখি না হবার অর্থ হলো, তার অবস্থার ওপরই আল্লাহ ﷻ তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। হতে পারে সে জাহান্নামী, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক; কিংবা হতে পারে সেই ব্যক্তি জান্নাতে থাকবে একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে, তার স্থান হবে রাব্বুল আলামিনের আরশ থেকে বহু দূরে। কিন্তু যারা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে উল্টো। এটা জানার কারণে ইন শা আল্লাহ আপনার ঈমান মজবুত হবে–লা সামাহাল্লাহ, আপনাকেও যদি কখনো কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, তবে আপনি সবর করতে পারবেন।

মুসনাদে আহমাদ[১৪১] ও সহিহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিবে একটি হাদিস এসেছে :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ : الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ

১৪০ *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৩৯৫; *মুস্তাদরাক হাকিম* : ১২৮৩
১৪১ হাদিস নং : ২২২৭৪

www.banglakitab.weebly.com

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জ্বরকে তুলনা করেছেন কামারের হাপর এবং ধাতু পরিশুদ্ধিকরণের সাথে। আমরা জানি, একজন কামার তার হাপরের সাহায্যে ধাতুকে বিশুদ্ধ করে। যেভাবে কামার আগুন, উত্তাপ আর হাতুড়ির মাধ্যমে লোহাকে বিশুদ্ধ করে, জ্বরও সেভাবে মুমিনের জাহান্নামের অংশটুকুকে মিটিয়ে দেয়। কামার লোহাকে আগুনে উত্তপ্ত করে, ময়লা ও অপদ্রব্য থেকে মুক্ত হয়ে তা পুরোপুরি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। তেমনিভাবে একজন মুমিন যখন পরীক্ষা ও মুসিবতের মুখোমুখি হয় (যেমন : এই হাদিসে জ্বরের কথা বলা হয়েছে), তখন তার গুনাহগুলোও এভাবে দূর হতে থাকে। এভাবে একসময় সে এমনভাবে পরিশুদ্ধ হয় যার ফলে বিচারের দিন তাকে আর কোনোরকম জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না।

ফুযাইল ইবনু আয়ায ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَكْثَرَ غَمَّهُ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا أَوْسَعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ

> আল্লাহ ﷻ যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তার বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়ে দেন। আর তিনি যাদের ঘৃণা করেন, তাদের সমৃদ্ধ জীবন দান করেন।[১৪২]

সহিহ বুখারিতে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

> আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে।[১৪৩]

লক্ষ করুন, এখানে বলা হচ্ছে–'স্পর্শ করে'। তার মানে আল্লাহ ﷻ একজন মুমিনের জন্য যে দুঃখ-কষ্টই নির্ধারণ করুন না কেন, এমনকি যদি সেটা তার জীবনের প্রথম দিন থেকে শুরু করে একেবারে মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্তও হয়, তবু সেটা কেবল স্পর্শই। এর বেশি কিছু না। আল্লাহ ﷻ আপনাকে যে অবস্থায় রাখুন না কেন, যে পরীক্ষা বা বিপদের মুখোমুখি করুন না কেন, সেটা আপনারই গুনাহর কামাই। অল্প কিছু গুনাহর জন্য কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি করার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ আপনার অন্যান্য গুনাহগুলো মাফ করে দেন।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

'তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।' (সূরা আশ-শুরা, ৩০)

১৪২ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৫/৪৫২
১৪৩ *সহিহুল বুখারি* : ৫৬৪৫

www.banglakitab.weebly.com

ইবনু হিব্বান, আবু ইয়ালা ﵀-সহ আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন কাউকে জান্নাতের এমন কোনো স্তরে পৌঁছাতে চান যেখানে পৌঁছানো ওই ব্যক্তির আমলের দ্বারা সম্ভব না, তখন তিনি তাকে বিপদাপদ দ্বারা আক্রান্ত করেন যাতে সে ওই উচ্চ স্তরে পৌঁছুতে পারে। ধরুন, আপনার আমলের মাধ্যমে আপনি বড়জোর জান্নাতের দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছুতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ আপনাকে নিয়ে যেতে চান জান্নাতের সপ্তম স্তরে। তিনি চান আপনার জান্নাতের প্রাসাদের ছাদ হোক তাঁর আরশ। এমন অবস্থাতেই পরীক্ষা ও বিপদ আসে। আপনাকে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয় যাতে আল্লাহ ﷻ আপনার অবস্থান আরও উঁচুতে, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে—সপ্তম স্তরে—নিয়ে যেতে পারেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সাথে আছেন, যতক্ষণ আপনার অন্তর আল্লাহ ﷻ-এর সাথে জুড়ে আছে, হৃদয় আল্লাহ ﷻ-এর কৃতজ্ঞতায় বিনম্র ও জিহ্বা আল্লাহ ﷻ-এর যিকিরে সচল আছে, যতক্ষণ আপনি সবর অবলম্বন করে চলছেন, ততক্ষণ হতাশ হবার কিছু নেই। আল্লাহ ﷻ আমাদের কৃতজ্ঞ, প্রশংসাকারী ও সবরকারী বান্দা হিসেবে কবুল করুন। পরীক্ষা জীবনের এক চরম বাস্তবতা। একজন দা'ঈ ও মুসলিমের জীবনে পরীক্ষা থাকবে, এটাই চূড়ান্ত সত্য। তাই আমাদের সবর করা শিখতে হবে। একে মনে করতে হবে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সবরের অর্থ হলো সত্যের ওপর অবিচল থাকা। আপনি একা আছেন নাকি আপনার সাথে অনেক অনুসারী আছে, তার কোনো গুরুত্ব নেই। তবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় আপনি আশেপাশে কাউকে পাবেন না কিংবা পেলেও খুব অল্পসংখ্যক মানুষই হয়তো আপনার সাথে থাকবে। এমনটাই হয়ে আসছে এবং এটাই নিয়ম।

ফুযাইল ইবনু আয়ায ﵀ বলেছেন,

الزم طريق الهدى، ولا يغرك قلة السالكين

وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين

'হিদায়াতের পথ আঁকড়ে থাকো, হতাশ হোয়ো না অনুসারীদের সংখ্যা কম দেখে। সাবধান হও ভ্রষ্টপথের ব্যাপারে, ধোঁকায় পোড়ো না ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যাধিক্য দেখে।'[১৪৪]

নিয়্যাতের গুরুত্ব :

আপনার অঙ্গীকারকে নবায়ন করুন। প্রতিদিন আপনার নিয়্যাত নবায়ন করুন। দিনে একবার না, বারবার। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সিদ্ধান্তের আগে নিশ্চিত হয়ে নিন আপনার নিয়্যাত ঠিক আছে কি না। আপনার নিয়্যাতকে ঠিক করে নিন প্রতিটি কথা, প্রতিটি লেখা, দাওয়াহর প্রতিটি পদক্ষেপের আগে। বিপদের মুহূর্তে নিয়্যাতের শুদ্ধতা আপনাকে সবরের শক্তি জোগাবে। কখনো যদি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, আপনার পাশে কাউকে না

১৪৪ *আস-সাওয়াযিকুল মুরসালাহ* : পৃ. ২২৭

www.banglakitab.weebly.com

পান,আপনার কি মনে হয় আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কেউ তখন আপনার সাহায্যে আসবে?

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

'সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে।' (সূরা আবাসা, ৩৪-৩৬)

দুনিয়াতে যদি তারা আপনাকে সাহায্য না করে, আপনার কি মনে হয় আখিরাতে তারা আপনার কোনো উপকারে আসবে? যখন পরীক্ষা আপনাকে বিহ্বল করে ফেলবে, যখন প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে নিজেকে একাকী আবিষ্কার করবেন, মনে রাখবেন আল্লাহ ﷻ-ই আপনার জন্য যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা আসলে তাঁরই মুখাপেক্ষী। প্রশ্ন হলো, কীভাবে আমরা আল্লাহ ﷻ-কে আমাদের পাশে পেতে পারি? দাওয়াহর পথে আপনাকে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। প্রতিবন্ধক হয়ে ধেয়ে আসবে একের পর এক পরীক্ষা ও মুসিবত। এই প্রতিকূলতায় এক আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কাউকে আপনি পাশে পাবেন না। সুতরাং যদি বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ ﷻ-কে পাশে চান তবে দুর্যোগের মুখোমুখি হবার আগেই নিশ্চিত করুন যে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আপনি কাজ করছেন। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি কি আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্য কাজটি করছি? এটা কি ইসলামসম্মত? আল্লাহ ﷻ এতে খুশি হবেন তো? আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টিকেই নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন।

আমাদের সবারই কমবেশি এমন বন্ধুবান্ধব আছে যারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রায় সবার এমন অভিজ্ঞতা আছে। এগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে সারাদিন কেটে যাবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি কোথাও কিছু বলি না, তবে কখনো কখনো এগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু বিষয় থাকে যা হয়তো অন্য মুসলিমের জন্য সতর্কতার কারণ হবে। তাই এখানে আমি কিছু কথা বলছি।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, জেলে যাবার পর একজন ছাত্র কিংবা সমর্থককেও আমি পাশে পাইনি। কেউ ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। একজনকেও পাওয়া যায়নি এ নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য। রমাদানের একেবারে শেষদিকে, ঈদুল ফিতরের দুদিন আগে ওরা আমাকে নিয়ে যায়। বন্দিত্বের প্রথম রাতের পরের সকাল ছিল ঈদুল ফিতর। ঈদের সকাল শুরু করলাম বন্দী হিসেবে। সেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে আমার মাকে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ ﷻ তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর দান করুন, আমীন।

জেলে যাবার একরাত আগের কথা। আমি আর বাবা এক ছাত্রের বাড়িতে ইফতারের দাওয়াতে গিয়েছিলাম। আহমাদ জিবরিল আর তার বাবা শাইখ মুসা আসছেন জানতে পেরে অনেক মানুষ এসেছিল। লোক বেশি হবার কারণে ইফতারের পর বেশ কিছুক্ষণ আমরা সেখানে কাটিয়ে দিলাম এবং সেখানেই ইশা ও তারাবিহর জামাআত করলাম। পুরো রমাদান মাসজুড়ে

www.banglakitab.weebly.com

আমি তারাবিহ পড়িয়েছিলাম আরেক জায়গায়। সেই দিন ত্রিশতম পারা শেষ করে কুরআন খতম করার কথা ছিল। সেই ভাইয়ের বাড়িতে বেশ বড়সড় জামাআত হওয়াতে সেদিন ওখানে তারাবিহ পড়ালাম। ত্রিশতম পারা শেষ হলো, আমাদের খতমও হয়ে গেল। সালাত শেষে বাবা বললেন, কাল যদি ঈদ না হয়, তবে আমাদের বাসায় সবার দাওয়াত রইল। পরদিন ঈদ হবার একটা সম্ভাবনা ছিল। আমাদের একদল বের হয়েছিল ঈদের চাঁদ দেখার জন্য, তবে তারা তখনো আকাশে চাঁদ দেখতে পায়নি। সবাই আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিল। আল্লাহ ﷻ আমার বাবাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করে নিন। আল্লাহ ﷻ আমার মাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমরা কমপক্ষে দেড় শ থেকে দুই শ লোকের আয়োজন করেছিলাম। সবাই পরদিন আমাদের বাড়িতে এল। এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদলের খাওয়া শেষ হলে আরেক দল বসতো। আল্লাহ ﷻ আমার মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তাঁকে ফিরদাউস পর্যন্ত পৌঁছে দিন। সেই দিনগুলোতে তারাবিহর পর অনেকে আমাকে ঘিরে বসতে উন্মুখ হয়ে থাকত। আমার আজও সবকিছু স্পষ্ট মনে আছে, যেন আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দারস দেয়ার সময় আমার সাথে এত মানুষ হতো যে গাড়িগুলো দেখে মনে হতো কাফেলা যাচ্ছে। আমার পাশে কে বসবে এ নিয়েও তর্ক শুরু হয়ে যেত। এমনকি ভাইয়েরা এসে আমাকে বলেছে, আমার গাড়ি কে চালাবে এ নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া হয়েছে। ওয়াল্লাহি, এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

আমার শুনানির দিনও কোর্ট প্রাঙ্গণে অনেক মানুষ ছিল। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সবার কাঁধে কাঁধ লেগে যাচ্ছিল। কিন্তু পার্থক্য হলো, সেই দিন আমি আর বাবা ছাড়া ওখানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-তে বিশ্বাসী আর একজন মানুষও সেখানে ছিল না। এফবিআই প্রসিকিউটর, সরকারি বাহিনীর এজেন্ট, কাউন্টার-টেরোরিযমের অফিসার ও কর্মকর্তাদের সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার উকিল আমাকে বলল, 'এই লোকগুলো আপনাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে, আর কোনো শুনানিতে আমি তাদের এমন করতে দেখিনি।' বিচার চলাকালীন আদালতে অনেক মানুষ থাকলে বিচারকের ওপর মানসিক এক ধরনের চাপ কাজ করে। যেহেতু সরকারপক্ষ জানত না কী রায় হবে, তাই তারা অনেক লোক জড়ো করেছিল বিচারকের ওপর চাপ তৈরি করার জন্য। যাতে বিচারক আমাদের শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। উকিল আমাকে বলল, 'এর আগে অন্য কোনো শুনানিতে এত কর্মকর্তা দেখিনি। এরা আসলেই আপনাদের ঘৃণা করে। কিন্তু তারা আপনার এত এত যেসব অনুসারীর কথা বলছে, তারা কোথায়?'

পেছনের দিনগুলোতে ফিরে যাই। ছাত্রদের জন্য আমাদের বাসার ওপরের তলা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকত। ওয়াল্লাহি, আমি এগুলো শুধু এ জন্য বলছি, যেন সবাই এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কয়েক দিন আগে আমি আমাদের পুরোনো কফি মেশিনটা দেখছিলাম। আমাদের মেশিনটা ছিল দোকানের বড় মেশিনগুলোর মতো। বাসায় সব সময় কোনো না কোনো অতিথি থাকত, ছোটগুলো দিয়ে আমাদের কাজ

www.banglakitab.weebly.com

চলত না। কয়েক দিন আগে আবার মেশিনটা চোখে পড়ল। মেশিনটার ওপর এখনো লেখা আছে—এজে'র ইলম ক্যাফে। ছাত্ররা আমাদের বাড়ির নাম দিয়েছিল আহমাদ জিবরিলের ইলম ক্যাফে।

বাসায় সব সময় মানুষের আসা-যাওয়া করত—শেখা, শেখানো, দাওয়াহ চলতে থাকত। আল্লাহ ﷻ আমার মাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। প্রয়োজনীয় সবকিছুর জোগান দেওয়া, দেখাশোনা, রান্নাবান্না, খাবার পরিবেশন, কফি—এ সবকিছু তিনি একা সামলেছেন। এখনো আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে আছে। বয়ান কিংবা হালাকাহ শেষে ভাইরা আমার পেছনে পেছনে আমাদের বাসার বাথরুমের দরজা পর্যন্ত চলে আসত। বাসায় এত মানুষ আসত যে অনেককে বাথরুমের দরজার সামনে বসতে হতো।

আমার মামলার বিচারক ছিল বেশ খাটো। লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট। কিন্তু এই পাঁচ ফুট লম্বা বিচারকের সামনে দাঁড়ানোর জন্য একজন লোকও সেদিন ছিল না। তাহলে আপনারা কি মনে করেন সব আদালতের আদালতে গিয়ে দাঁড়াবার দিন আপনার পাশে কাউকে পাবেন? পাঁচ ফুট লম্বা একটা মানুষের সামনে যদি তারা দাঁড়াতে না পারে, তবে আলিমুল গাইব—যার কুরসি সমস্ত আসমান ও জমিনের চেয়েও বিশাল—তাঁর সামনে তারা কীভাবে দাঁড়াবে? কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার নিয়্যাত যাচাই করুন। এতকিছু বলার কারণ এটাই। প্রতিটি কাজের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি এটা আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্য করছেন? কখনো নিজের পাশে অনেক মানুষ দেখতে পেলেও শুধু আল্লাহ ﷻ-এর কথাই ভাবুন। সবকিছু আপনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করছেন তো? কারণ, যখন বিপদ আসবে সবাই আপনার পাশ থেকে উধাও হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তেপাশে পাবেন একমাত্র আল্লাহ ﷻ-কেই। আপনি আল্লাহ ﷻ-এর হকের হেফাযত করুন, তিনি আপনাকে হেফাযত করবেন। বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণের এটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি। ইয়া আল্লাহ, আমি শুধু আপনার জন্যই এটা করছি—সর্বদা সব সময়।

সত্যের ওপর দৃঢ় থাকুন একাকী হলেও :

সুলাইমান আদ-দারানি رحمه الله বলেছেন,

لَوْ شَكَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْحَقِّ مَا شَكَكْتُ فِيهِ وَحْدِي

'যদি সবাই হকের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করে, আর আমি যদি একা হই, তবুও আমি হকের ব্যাপারে সন্দিহান হব না।'[১৪৫]

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً.....

'নিশ্চয়ই ইব্রাহীম (একাই) ছিল এক উম্মাহ বা একটি জাতি...।' (সূরা আন-নাহল, ১২০)

১৪৫ *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, বর্ণনা নং : ১৪২৬৪

www.banglakitab.weebly.com

ইব্রাহীম ﷺ ছিলেন একাই একটি উম্মাহ। সহিহ বুখারিতে আছে, ইব্রাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী সারাকে বলেছিলেন, আমি আর তুমি ছাড়া এই দুনিয়ার বুকে আর কোনো মুমিন নেই; দুনিয়ার বুকে মুমিন কেবল আমরা দুজন-ই।

শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ কিতাবে ইমাম আল-লালাকায়ি সহিহ সূত্রে ইবনু মাসউদ ﷺ-এর এই কওলটি বর্ণনা করেছেন,

الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت وحدك

জামাআহ সেটাই যা হকের ওপর আছে, এমনকি তুমি যদি একা হও তবুও।[১৪৬]

যারা হকের ওপর আছে তাঁরাই জামাআহ, তাদের সংখ্যা যতই কমই হোক না কেন। সংখ্যা দেখে কখনো ধোঁকায় পড়বেন না। সংখ্যাধিক্যের কারণে বাতিল কখনো হক হয়ে যায় না। আর হকপন্থীদের কম সংখ্যা তাঁদের ভ্রান্ত হবার প্রমাণ না।

কুরআনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের তিরস্কার করা হয়েছে :

সংখ্যাগরিষ্ঠদের ব্যাপারে সাধারণত কুরআনে তিরস্কারই এসেছে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

'আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে।' (সূরা আল-আনআম, ১১৬)

তিনি বলেন :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

'আপনি যতই আগ্রহী হোন না কেন, অধিকাংশ লোক ঈমান আনার মতো নয়।' (সূরা ইউসুফ, ১০৩)

فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

'কিন্তু অধিকাংশ লোক সত্যকে অস্বীকার না করে থাকেনি।' (সূরা আল-ইসরা, ৮৯)

---

১৪৬ এটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ এর মশহুর একটি কওল। বিভিন্ন সনদে, বিভিন্ন শব্দে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম লালাকায়ি নিম্নোক্ত শব্দে বিশুদ্ধ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন :

إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ

জামাআহ হলো সেটাই, যা আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যের সাথে মিলে যায়, যদিও তুমি একা হও। (বর্ণনা নং : ১৬০)

www.banglakitab.weebly.com

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

'আমি তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্যবিমুখ ছিলে!' (সূরা আয-যুখরুফ, ৭৮)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

'নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।' (সূরা আশ-শুআরা, ৮)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

'অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু তার সাথে সাথে শিরকও করে।' (সূরা ইউসুফ, ১০৬)

কুরআনে অল্পসংখ্যকদের প্রশংসা করা হয়েছে :

অপরদিকে কুরআনের এমন বেশকিছু আয়াত রয়েছে যেখানে সংখ্যালঘুদের প্রশংসা করে হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ .....

'(দাউদ বলল) সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি যুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প...। (সূরা সাদ, ২৪)

আল্লাহ ﷻ নূহ ﷺ-এর প্রসঙ্গে বলেছেন :

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

'অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।' (সূরা হূদ, ৪০)

অর্থাৎ, নূহ ﷺ-এর সাথে খুব অল্পসংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল।

তালূত-জালূতের ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ

www.banglakitab.weebly.com

'অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল।' (সূরা আল-বাকারাহ, ২৪৬)

তিনি আরও বলেন :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

'বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের ওপর বিদ্যমান না থাকত, তবে তোমাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করতে।' (সূরা আন-নিসা, ৮৩)

সুতরাং স্বল্পসংখ্যক হলেও আল্লাহ ﷻ তাদের প্রশংসা করেছেন হকের অনুসারী হবার কারণে। আর হকের অনুসারীরা সংখ্যায় কম হবে—এটাই তো নিয়ম।

আল্লাহ ﷻ তো সবকিছু জানেন, তারপরও কেন আমাদের পরীক্ষা করেন?

গত অধ্যায়ে আমরা বলেছিলাম,

فليعْلمنّ

(আল্লাহ পরীক্ষা করবেন) যাতে তিনি জেনে নেন...।

আল্লাহ পরীক্ষা করেন যাতে তিনি জেনে নিতে পারেন...। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে—জানার জন্য আল্লাহ ﷻ-এর পরীক্ষা করতে হবে কেন? তিনি তো এমনিতেই সবকিছু জানেন। তাহলে পরীক্ষা করার কী দরকার? আল্লাহ ﷻ যদি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু জানেন-ই, তাহলে তিনি পরীক্ষা কেন করবেন?

নিঃসন্দেহে কোনো পর্বতশৃঙ্গ হোক কিংবা কোনো সাগর অথবা নদী, এমন কিছুই নেই যার একেবারে কেন্দ্রস্থল, গভীর থেকে গভীরতম বিন্দু, সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থান সম্পর্কেও আল্লাহ ﷻ জ্ঞাত নন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। অন্ধকার রাতে কোনো পাথরের ওপর ছুটে চলা কালো পিঁপড়ের পদক্ষেপগুলোও তিনি দেখেন, শোনেন। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে কোনো পিঁপড়া হেঁটে গেলেও হয়তো আমরা টের পাব না, শোনার তো প্রশ্নই আসে না। অথচ সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ ﷻ সেই শব্দ শুনতে পান।

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

'তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্য জগৎসমূহের চাবি। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।

www.banglakitab.weebly.com

জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণা কিংবা রসযুক্ত অথবা শুষ্ক বস্তু পড়ে না; যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' (সূরা আল-আনআম, ৫৯)

কাজেই সবকিছু লিপিবদ্ধ এবং আল্লাহ ﷻ সবকিছু সম্পর্কে অবগত। কিছুদিন আগে আমি আমার প্রিয় ছাত্র মুহাম্মাদের সাথে কথা বলছিলাম। মুহাম্মাদের বয়স সাত বছর, সে ইউকে-তে থাকে। আমি ওকে বলছিলাম, আমাদের বাড়ির পেছনের খোলা আঙিনায় যদি ছোট্ট একটি গাছ থাকত, তাহলে হেমন্তে ঝরে-পড়া পাতাগুলোর সাথে কিছুতেই আমরা পেরে উঠতাম না। কতগুলো পাতা ঝরে পড়ছে, কোনটা কোথায় পড়েছে, কোথায় যাচ্ছে–কিছুতেই আমরা হিসাব রাখতে পারতাম না। একটি ছোট্ট গাছের বেলাতে যদি আমাদের এই অবস্থা হয়, তবে একটি ঘন বনের বেলায় ব্যাপারটা কেমন হবে? গাছপালায় ঘেরা একটি বনে গিয়ে দেখুন। আচ্ছা চিন্তা করুন তো, পৃথিবীজুড়ে কতগুলো বন আছে, সেগুলোতে কতগুলো গাছ আছে, সেগুলোর কতগুলো পাতা আছে? জেনে রাখুন, প্রতিটি গাছে কতগুলো পাতা আছে, এক একটি পাতা কখন, কোথায়, কোন স্থানে ও কীভাবে ঝরে পড়ছে, ঝরে পড়ার আগে কোথায় ছিল এবং ঝরে পড়ার পর তারা কোথায় যাচ্ছে, এ সবকিছুই আল্লাহ ﷻ জানেন।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না;

এমনকি মাটির অন্ধকার কিংবা সাগরের গভীর অন্ধকার তলদেশে থাকা এর চেয়েও ক্ষুদ্র শস্যকণা সম্পর্কেও তিনি অজ্ঞাত নন, যা আমি কিংবা আপনি খালি চোখে দেখতেও পারব না।

তাহলে আল্লাহ ﷻ কেন পরীক্ষা করবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া একেবারেই সহজ। আল্লাহ ﷻ কুরআনে অসংখ্যবার এটি উল্লেখ করেছেন। তেমনই কিছু আয়াত হলো :

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

'এবং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।' (সূরা আল-আনকাবুত, ৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ মানুষকে সুখ ও দুঃখের মুহূর্ত দ্বারা পরীক্ষা করবেন যাতে ভালো থেকে মন্দদের আলাদা করা যায়।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ

'অবশ্যই আল্লাহ তাআলা জেনে নেবেন কারা মুমিন ও কারা মুনাফিক।' (সূরা আল-আনকাবুত, ১১)

www.banglakitab.weebly.com

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

'এবং আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি তোমাদের মাঝে মুজাহিদ ও সবরকারীদের জেনে নিই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।' (সূরা মুহাম্মাদ, ৩১)

অর্থাৎ, কারা মুজাহিদ তা জানতে আল্লাহ ﷻ আপনাকে পরীক্ষা করবেন।

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

'এবং মানুষের মধ্যে (বিপদের) এ দিনগুলোকে আমি অদল-বদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে তিনি শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।' (সূরা আলি ইমরান, ১৪০)

আল্লাহ ﷻ জেনে নেবেন, কারা মুমিন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ

এবং তিনি মুনাফিকদেরও জেনে নেবেন, তাদের বলা হয়েছিল, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো কিংবা প্রতিরক্ষা করো...।' (সূরা আলি ইমরান, ১৬৭)

আল্লাহ ﷻ মুনাফিকদেরও জেনে নেবেন।

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ

'আর আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ জেনে নেবেন কে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে।' (সূরা আল-হাদিদ, ২৫)

আল্লাহ ﷻ আমাদের পরীক্ষা করবেন, যাতে তিনি জানতে পারেন, কে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করবে।

সুতরাং এককথায় সব প্রশ্নের জবাব হলো, আল্লাহ ﷻ তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের ভিত্তিতে মানুষের জবাবদিহি নেন না, দায়ী করেন না, মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেন না; বরং তিনি তা করেন আমাদের আমলের ভিত্তিতে। আল্লাহ ﷻ আমাদের সবকিছু জানেন, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অপরিসীম করুণা, ন্যায়বিচার ও সীমাহীন ধৈর্যের কারণে তাঁর ইলমের ওপর ভিত্তি করে আমাদের বিচার করেন না; বরং আমাদের আমলের ভিত্তিতে বিচার করেন। এ কারণেই মানুষের মধ্যে কারা সঠিক ও ভুল, নেককার ও পাপী, এ সবকিছু জানার পরও আল্লাহ ﷻ

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের পরীক্ষা করেন, যাতে আমাদের আমলগুলো আমাদের জন্য প্রমাণ হয়। নেককার ব্যক্তির নেক আমল প্রমাণ করবে সে নেককার এবং পাপাচারীর বদ আমল প্রমাণ করবে তার পাপাচারিতা।

মুমিনের জন্য সবকিছুই কল্যাণকর :

সবরের ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন আয়াত, হাদিস ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি কারণ সময়ের সাথে সাথে সবরের পরিমাণ কমতে থাকে। বিপদের মুখোমুখি হবার পর সবর করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার থাকে না। আর সময়ের সাথে সাথে তা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। তাই এসব দারস থেকে আপনি যা শিখেছেন সবর ধরে রাখার জন্য সেগুলো ব্যবহার করবেন। এগুলো হলো মধু যা আপনার হৃদয়ের বিষণ্ণতার তিক্ততাকে সবরের মিষ্টতায় ভরিয়ে দেবে, সবরের ওপর টিকে থাকার অনুপ্রেরণা দেবে; শক্তি জোগাবে এবং আপনি এ-ও উপলব্ধি করবেন যে আল্লাহ ﷻ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ

মুমিনের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক! সবকিছুই তার জন্য কল্যাণকর, একমাত্র মুমিনদের বেলাতেই এমন হয়ে থাকে।[১৪৭]

আমার মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন ইফকের ঘটনার সময়। এটা যদি সবচেয়ে কঠিন নাও হয় তবুও অন্তত এটুকু বলা যায় যে, এটা ছিল তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষাগুলোর একটি। অভিযোগ আরোপিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান—আ'ইশা ؓ-এর ওপর। তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির ব্যাপারে অভিযোগ উঠেছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন? তিনি তখন বলেছিলেন, আ'ইশা। তিনি আ'ইশা ؓ-কে নিয়ে গর্বিত ছিলেন, সবার সামনে এ কথা বলেছিলেন। সাফওয়ান ؓ-এর সম্মানও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। আবু বকর ؓ-কে সবাই অপবাদ দিচ্ছিল। আ'ইশা ؓ মর্মবেদনা ও কষ্টে কাতর হয়ে পড়েছিলেন, এ ছিল তাঁর জীবনের চরম বেদনাদায়ক মুহূর্ত। আ'ইশা ؓ আমাদের সম্মান। তিনি আমাদের মা, আমাদের সম্মান, আমাদের গর্ব, আমাদের মর্যাদা। এ ঘটনায় তিনি শোকে ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু সবশেষে আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত নাযিল হলো :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

'যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের

১৪৭ *সহিহ মুসলিম* : ৭৬৯২

www.banglakitab.weebly.com

জন্য খারাপ মনে কোরো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।' (সূরা আন-নূর, ১১)

আল্লাহ ﷻ বললেন, এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাঁরা এই পরীক্ষাকে খারাপ মনে করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ ﷻ একে তাঁদের জন্য কল্যাণকর বললেন। এ পরীক্ষার বারাকাহ্ ও কল্যাণ আজ চৌদ্দ শ বছর পার হবার পরও আমাদের মাঝে রয়ে গেছে। শিয়াদের প্রকৃত রূপ এবং আমাদের মা, উম্মুল মুমিনিন আ'ইশা رضي الله عنها-এর প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণার কথা সবারই জানা আছে। আ'ইশা رضي الله عنها আমাদের মা। তাদের মা নন, কারণ তিনি কেবল মুমিনদেরই মা। বাস্তবে অনেক আহলুস সুন্নাহর দাবিদারদেরও আমরা দেখতে পাই, যারা তাদের এই মায়ের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হয় না। গ্বাইরাহ (আত্মমর্যাদাবোধ) বোধ করে না। আপনি কারও মাকে নিয়ে কিছু বললে সে হয়তো সারা জীবনের মতো আপনার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেবে। অথচ শিয়ারা আমাদের মা আ'ইশা رضي الله عنها-কে নিয়ে কথা বলে, কিন্তু কিছু আহলুস সুন্নাহর দাবিদার বলে, 'শিয়ারা আমাদের ভাই!' আ'ইশা رضي الله عنها-কে নিয়ে কথা বললে সমস্যা নেই, কিন্তু নিজের মাকে নিয়ে বললে বিরাট কিছু। আ'ইশা رضي الله عنها-কে নিয়ে যে কেউ কথা বলতে পারবে, কিন্তু নিজের মায়ের বেলাতে হলেই সমস্যা।

এই ঘটনা যে খারাপ কিছু ছিল না এটা তার খুব সামান্য একটি উদাহরণ। এ থেকে উৎসারিত কল্যাণ ও বারাকাহ্ আজ চৌদ্দ শ বছর পরও বহাল আছে।

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

'একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে কোরো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।'

এটা যেকোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–কখনো কখনো হয়তো আমরা সেটা বুঝতে পারি, কখনো পারি না।

কষ্টদায়ক কথার বিপরীতে সবর করুন :

সবর করুন। আপনাকে নিয়ে বলা বাজে কথা, অভিযোগ, ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলার কারণে আপনাকে নিয়ে অন্যদের মাঝে চলা ঠাট্টা-তামাশা এবং তাদের বিভিন্ন বিরক্তিকর আচরণের বিপরীতে সবর করুন। আপনার আগে সালাফদের সাথেও এমন হয়েছে। যদি আপনার নিকাব নিয়ে উপহাস করা হয় কিংবা আপনার দাড়ি, সবার মাঝে আপনার সালাত আদায়, আপনার দাওয়াহ কিংবা সাহাবা رضي الله عنهم ও সালাফদের অনুকরণে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত আপনার আদর্শ নিয়ে যদি আপনাকে উপহাস করা হয়, তবে জেনে রাখুন, আপনার আগের লোকদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে। যারা আমাদের চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন তাদের সাথেও এমন ঘটেছে।

এক ব্যক্তি ইব্রাহীম ইবনু আদহাম رحمه الله-কে খুব গালাগালি করল; বলল, তুই একটা কুকুর!

www.banglakitab.weebly.com

ইব্রাহীম ইবনু আদহাম ﷺ খুব ধীরস্থির ও শান্তভাবে উত্তর দিলেন, আমি যদি জান্নাতে যাই, আমার ধারণা আমি কুকুরের চেয়ে ভালো হব; আর যদি জাহান্নামে যাই, তাহলে আমি তো কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। এই বলে তিনি চলে গেলেন। একবার এক বিখ্যাত আলিমকে এক লোক অভিশাপ দিলো, গালিগালাজ করার পর বলল, আমি তোমাকে এমন অপমান করব, এমন ছোট করব যে এটা তোমার কবর পর্যন্ত তোমার সাথে যাবে। তিনি বললেন, বরং এটা (তোমার আমল) তোমাকে অনুসরণ করবে তোমার কবর পর্যন্ত। এ কথা বলেই তিনি হাঁটা শুরু করলেন। আহনাফ ইবনু কাইস ﷺ তাঁর বিচক্ষণতার জন্য পরিচিত ছিলেন। একবার এক লোক এসে তাকে গালমন্দ করা শুরু করল, চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগল। আহনাফ ﷺ তাঁর বাসার দেউড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর পর পেছন ফিরে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার যদি আরও কিছু বলার থাকে তবে এখানেই বলো, না হয় এখন যাও। আমি চাই না আশেপাশের ভবঘুরের দল তোমার এসব কথাবার্তা শুনতে পাক, আর তোমার সাথে এমন কোনো আচরণ করুক যা তোমার অপছন্দনীয় হবে। অর্থাৎ, তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আমার ভবঘুরে প্রতিবেশীরাও তোমার এসব কথার সাথে একমত হবে না।

ওয়াইস আল-কারনি ﷺ-কে ছোট ছেলেরা পাথর ছুড়ে মারত। তিনি কেবল তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমরা যদি আমাকে মারতেই চাও, তাহলে বড় বড় পাথরগুলো রেখে ছোট ছোট পাথর নাও, নয়তো পা থেকে রক্ত ঝরবে আর আমি কিয়ামুল লাইল আদায় করতে পারব না। মালিক ইবনু দিনার ﷺ-কে এক মহিলা বললেন, তুই একটা ভণ্ড। তিনি বললেন, আপনি আমাকে এমন নামে সম্বোধন করলেন যা সমগ্র বসরাবাসীর কেউ কোনো দিন আমার ব্যাপারে কাউকে বলতে শোনেনি। এমন অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন তাঁরা হয়েছেন, তাঁদের নানাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কেউ একজন সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমার ﷺ-এর কাছে এসে বলল, তুমি একটা ভণ্ড শাইখ। সালিম ﷺ বললেন, তুমি খুব ভুল কিছু বলোনি ভাই, সম্ভবত তুমি ঠিকই বলেছ। এই বলে তিনি চলে গেলেন। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে গালিগালাজ করতে শুরু করল। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই–বিজ্ঞ ইমাম, শাইখ ও আলিম। সে থামার পর ইবনু আব্বাস ﷺ তাঁর ছাত্র ইকরিমাকে বললেন, এই লোককে জিজ্ঞেস করো, তার কি কিছু লাগবে কি না, যাতে আমরা তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। লোকটি লজ্জায় মাথা নিচু করে চলে গেল।

এঁরা হলেন আমাদের ইমাম, তাঁরাও এসবের মুখোমুখি হয়েছেন, আর এমনই ছিল তাঁদের প্রতিক্রিয়া। এসব কিছু তাদের ক্রোধান্বিত করেনি। তাঁদের দমাতে পারেনি কিংবা নিজেদের পথ ও পন্থা নিয়ে তাঁদের মাঝে কোনো সন্দেহ-ও দেখা দেয়নি। এমনকি আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও এসব আচরণ সহ্য করতে হয়েছে। তিনিও এসব থেকে অব্যাহতি পাননি। *সহিহ বুখারিতে* আছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কিছু মাল বণ্টন করছিলেন, এমন সময় আনসারীদের একজন বলে উঠল, ওয়াল্লাহি এই বণ্টন আল্লাহর

www.banglakitab.weebly.com

পছন্দ অনুযায়ী হয়নি। আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্পদ ভাগ করার ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি খুব মারাত্মক এক বিষয়। এ কথা শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বললেন, ওয়াল্লাহি, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা জানাব। ইবনু মাসউদ ﷺ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর সাহাবি ﷺ-দের সাথে ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে এ কথা জানালাম। এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এতখানি প্রভাব ফেলেছিল যে, সাথে সাথে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এটা তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেছিল, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদ বণ্টনে বে-ইনসাফির অভিযোগ করা হয়েছিল। যার ঘরে একাধারে তিন দিন কখনো চুলো জ্বলেনি, তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে। তাঁর ﷺ চেহারার এমন পরিবর্তন দেখে ইবনু মাসউদ ﷺ আফসোস করতে লাগলেন, কেন তিনি এ কথা তাঁকে জানাতে গেলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুসা ﷺ-কে আমার চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, তিনি তা সহ্য করেছেন। নিন্দা ও অপবাদ যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর প্রভাবে ফেলে থাকে, তাহলে আপনার ওপরও এসব প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু দেখুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে নিজের আবেগকে সংবরণ করেছেন। তিনি বললেন, মুসা ﷺ-কে তাঁর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, তিনি আমার চেয়েও বেশি সহ্য করেছেন। কাজেই আপনাকেও এভাবে চিন্তা করা করতে হবে, এমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে।[১৪৮] এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনু হাজার ﷺ বলেছেন, এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যও মর্মাহত হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। সুতরাং আপনি কাউকে এমন বলতে পারেন না যে, কেন তিনি মানুষের কথা শুনে আপসেট হচ্ছেন, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন; বরং এমন হওয়া তো স্বাভাবিক। তবে কাউকে অন্যায়ভাবে কিছু বলার কারণে যদি সে রাগান্বিত হয়, তবে রাগান্বিত হবার পরও তার উচিত এসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শের অনুসরণ করা। তিনি যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা।

এখানে লক্ষণীয় হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় ক্রোধের ছাপ ফুটে ওঠেছিল, চেহারার রং বদলে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি একে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। কখনো ক্রোধের কারণে নিজের আচরণকে ইসলামি আচরণের সীমা অতিক্রম করতে দেবেন না। সবর অবলম্বন করুন। যখন আপনার ব্যাপারে অন্যায়ভাবে কিছু বলা হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে মুসা ﷺ-এর কথা স্মরণ করেছিলেন, আপনিও একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা স্মরণ করবেন। স্মরণ করবেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আপনার চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল।

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ

'আপনার সম্পর্কে তো তা-ই বলা হয়, যা বলা হতো আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে...' (সূরা ফুসসিলাত, ৪৩)

১৪৮ *সহিহ মুসলিম* : ২৪৯৫

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূল ﷺ-কে বলছেন, এরা আপনাকে যা বলে আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদেরও তা-ই বলা হতো, সুতরাং রাগান্বিত হবেন না। কাজেই আপনিও এ থেকে শিক্ষা নিন। নিজের জীবনে এ শিক্ষা প্রয়োগ করুন। আপনাকে যা বলা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও সেই একই কথা বলা হয়েছিল। সুতরাং, শান্ত হোন।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা ও পালনকর্তা। তিনিই মানুষকে রিযক দেন, লালন-পালন করেন, রাতের অন্ধকারে রুহ বের করে আনেন, আবার ফিরিয়ে দেন সকাল হলে। তবুও মানুষ আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে। আবু মুসা আল-আশআরি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

> মন্দ ও বিরক্তিকর কথা শ্রবণে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। তাঁর সাথে শিরক করা হয়, তাঁর প্রতি সন্তান গ্রহণের অপবাদ আরোপ হয়, এরপরও তিনি তাদের নিরাপত্তা দেন এবং তাদের রিযক দেন।[১৪৯]

কারা আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে এসব কথা বলে? মানুষ। তারা বলে আল্লাহ ﷻ সন্তান গ্রহণ করেছেন! অথচ এটা আল্লাহ ﷻ-কে গালি দেয়ার সমতুল্য। অথচ তারপরও আল্লাহ ﷻ তাদের সুস্বাস্থ্য ও রিযক দান করেছেন।

আমাদের নবি ﷺ-কে আমাদের চেয়েও বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, অপবাদ দেয়া হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও বেশি কষ্ট ভোগ করেছেন মুসা عليه السلام। সালাফগণ–আমাদের অনুসরণীয় সাহাবা رضي الله عنهم ও আলিমগণও অভিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেয়া হয়েছে। এমনকি মানুষ অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করেছে স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-এর ওপরও। এ কথাগুলো জানা, এগুলো স্মৃতিতে মজুদ রাখা ভিটামিনের মতো কাজ করে। এগুলো আপনার সবরের মাত্রাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। নিজেকে দৃঢ় প্রত্যয়ী মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলুন, কেননা যখন শক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন শক্ত মানুষই পারে বাধাকে অতিক্রম করতে।

পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তাওবাহ করুন, আল্লাহ ﷻ-এর রহমতের প্রত্যাশী হোন

একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, যখনই কারও দিক থেকে ক্ষতি বা পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন, সাথে সাথে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে ফিরে যাবেন, তাওবাহ করবেন। যদি আপনি একজন দা'ঈও হয়ে থাকেন এবং যদি আপনার বিপদ, কষ্ট কিংবা আপনাকে নিয়ে করা আজেবাজে মন্তব্য আপনার ইসলামি মূল্যবোধের কারণেও হয়ে থাকে, তবুও এমন যেকোনো পরিস্থিতিতে তাওবাহ করুন। আপনি হকের ওপর থাকার কারণে যদি তারা আপনাকে দু-

১৪৯ *সহিহ মুসলিম*: ৭২৫৮

www.banglakitab.weebly.com

একটা বিশেষ নাম দেয়, তবুও ইস্তিগফার করুন। বাড়িতে গিয়ে আপনার ঘরের দরজা বন্ধ করে ইস্তিগফার করতে থাকুন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর মাজমু আল ফাতাওয়াজুড়ে এমন অনেক উদ্ধৃতি আছে, যেগুলোর সারমর্ম হলো, যখন অন্যদের দ্বারা কষ্ট পাবেন কিংবা অভিযুক্ত হবেন তখন ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে ধাবিত হোন।

যারা আপনার বিরুদ্ধে বলছে তারা হয়তো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি, আর আপনি হয়তো একজন হকপন্থী মুসলিম–কিন্তু আপনার কোনো গুনাহর কারণে আজ তারা আপনার ওপর (জেল, অভিযোগ ও মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে) নিজেদের কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে, আর এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ আপনার অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন। পাশাপাশি আপনার সাথে যা-ই করা হোক না কেন, যদি আপনাকে তাদের কোনো বিষবাক্য শুনতে হয় কিংবা তারা আপনার ক্ষতি করে, তবুও অন্তরে সব সময় দয়া ও মমতা রাখুন। যদি আপনার সাথে প্রতারণা করা হয়, আপনার বিপদের সময়ে দুর্বলতার সুযোগে নানা কথা বলা হয়, কিংবা যদি আপনার কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হওয়া লোকেরা আজ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, তবুও তাদের প্রতি অন্তরে দয়ার অনুভূতি বজায় রাখুন। সবার সাথে এমন কিছু না কিছু ঘটে। আপনি হয়তো তাদের দরকারের সময় কোনো একটা কাজ করে দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, কিন্তু আজ হঠাৎ তারাই আপনার বিরুদ্ধে বলছে। আপনার জীবন কিন্তু শুধু আপনার মাঝে সীমাবদ্ধ না। যেমন আমার পরিচয় কেবল 'আহমাদ' না। আপনি দুনিয়াতে এসেছে একটি গুরুদায়িত্ব নিয়ে। সুতরাং দাওয়াহর এ পথে আপনাকে যদি কোনোভাবে কষ্ট, প্রতারণা কিংবা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তবুও নির্দয় হবেন না, রহমদিল হোন।

দয়ার নবি ﷺ তাঁর প্রিয় চাচার হত্যাকারীদের শাহাদাহ কবুল করেছিলেন। কাবার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাঁর সাহাবি ﷺ-দের হত্যাকারী ও যালিমদের উদ্দেশ্যেও। বলেছিলেন,

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ...اِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء

তোমাদের কারও ওপর কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা যেখানে খুশি যেতে পারো।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ

'এবং এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন...।' (সূরা আলি ইমরান, ১৫৯)

সুনান আবু দাউদ, জামি তিরমিযি ও মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

দয়ালুদের প্রতি পরম দয়াময় দয়া করেন। যারা জমিনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[১৫০]

---

১৫০ *সুনানুত তিরমিযি* : ১৯২৪; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৪১

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের নবিজি ﷺ আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমের অপর এক হাদিসে এসেছে,

مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ

যে দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।[১৫১]

এ ব্যাপারে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে ইউসুফ ﷺ-এর কারাগার থেকে মুক্ত হবার পরের ঘটনাগুলো থেকে। আমি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুন্দর কিছু আলোচনা আমার শাইখদের কাছে থেকে শোনার সুযোগ পেয়েছি। ইউসুফ ﷺ যখন কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন তখন তিনি ছিলেন শক্তি-সামর্থ্যবান। যখন শেষমেশ তাঁর ভাইদের সাথে মিলিত হলেন তখন চাইলেই তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু ইউসুফ ﷺ কী বললেন,

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ

'...হে আমার পিতা, এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে...।' (সূরা ইউসুফ, ১০০)

এতদিন পর তাঁর ﷺ তো বরং এটা বলা স্বাভাবিক ছিল যে, আল্লাহ ﷻ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমকে কুয়ো থেকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু তিনি কারাগারের কথা বললেন কেন? কারণ, তিনি তার সহোদর ভাইদের কুয়োর ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাদের মনে কষ্ট দিতে চাননি। অথচ এই ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে কত কিছু করেছিল। এখন তিনি শক্তিশালী অবস্থানে আছেন, তবুও তিনি কুয়োর ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেলেন, যাতে তাঁর ভাইরা নিজেদের অতীত কৃতকর্মের কথা মনে করে কষ্ট না পান। তিনি এখন স্বাধীন এবং কর্তৃত্বের অধিকারী, কিন্তু তিনি মহানুভব, তাঁর পিতা মহানুভব, তাঁর পিতামহ মহানুভব, তাঁর প্রপিতামহ মহানুভব। যেমনভাবে সহিহুল বুখারির একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

আল-কারিম (মহানুভব) ইবনুল কারিম, ইবনুল কারিম–ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম (আলাইহিমুস সালাম)।[১৫২]

মহান ব্যক্তিরা ক্ষমতাসীন হবার পর ক্ষমা করেন। ক্ষমতা থাকার পরও যে ক্ষমা করে দেয়,

---

১৫১ *সহিহুল বুখারি* : ৫৬৯০; *সহিহ মুসলিম* : ৪৪০৬
১৫২ *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৩৩

www.banglakitab.weebly.com

সে-ই প্রকৃত দয়ালু। অনেকে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে, আড়ালে আপনাকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করতে পারে। এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, আপনি কারও উপকার করলেন আর হঠাৎ তারাই আপনার গীবত করতে শুরু করল। তারা ইন্টারনেটে আপনার ব্যাপারে মর্যাদাহানিকর মন্তব্য করতে শুরু করল। কাফিররা তো শুরু থেকেই আপনার পেছনে লেগে ছিল, এখন উম্মাহর মধ্য থেকে একটি দলও আপনার বিরোধী হয়ে গেল। যেই দিন এ সবকিছু অতিক্রম করে আপনি শক্ত অবস্থানে পৌঁছবেন, চাইলেই অতীতের সব আঘাতের বদলা নিতে পারবেন, পারবেন প্রমাণসহ তাদের মুখোশ খুলে দিতে, তখন আপনার সবর আপনাকে বলবে এ থেকে বিরত থাকতে। দয়াশীল হোন, এটাই দা'ঈদের পথ।

কোন জিনিস ইউসুফ ﷺ-কে এতখানি সবর করতে শেখাল যে, তিনি ভাইদের অনুভূতিতেও আঘাত করতে চাইলেন না? তাঁর প্রতি তাদের আচরণ এবং তাদের কারণে তাঁকে ও তাঁর বাবাকে যে সীমাহীন কষ্ট, দুর্ভোগ ও বিপদের মাঝে দিয়ে যেতে হয়েছে, এর বিপরীতে তাদের প্রতি কোনো ধরনের তিক্ততাও তিনি প্রকাশ করলেন না! কীভাবে? এর মূল কারণ হলো, তাঁর অন্তর সব সময় আল্লাহ ﷻ-এর দিকে ঝুঁকে থাকত। মনে রাখবেন, এই জীবন, এই দাওয়াহ আপনার নিজের না। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য হলো ইসলাম—আল্লাহ ﷻ ও রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ। ইউসুফ ﷺ আল্লাহ ﷻ-কে এত বেশি পরিমাণে স্মরণ করতেন যে শেষপর্যন্ত তিনি যখন পুনরায় ভাইদের সাথে মিলিত হলেন এবং তাদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন, তিনি কথা শুরু করলেন আল্লাহ ﷻ-কে দিয়ে এবং শেষও করলেন আল্লাহ ﷻ-কে দিয়ে।

তিনি বললেন,

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي

তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

অর্থাৎ, তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এবং সবশেষে তিনি বললেন,

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

> 'আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশল ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা ইউসুফ, ১০০)

তিনি ﷺ তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন আল্লাহ ﷻ-এর স্মরণের মাধ্যমে এবং আল্লাহ ﷻ-এর স্মরণ করার মাধ্যমেই তা শেষ করলেন। এ কারণেই ভাইদের প্রতি কোনো ধরনের খারাপ কিংবা তিক্ত অনুভূতির তাঁর মনে সৃষ্টি হয়নি। তেমনি দা'ঈ হতে হলে আমাদের শিখতে হবে ইব্রাহীম ﷺ-এর দৃষ্টান্ত থেকেও। তিনি নিজেকে আগুনে সঁপে দিয়েছিলেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে নিজে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছিলেন, নিজ সন্তানকে কুরবানির জন্য

www.banglakitab.weebly.com

উৎসর্গ করেছিলেন। আপনি শুধু দিতে থাকবেন, আর দিয়েই যাবেন, কোনো বিনিময় কিংবা প্রতিদানের আশা করবেন না। বরং ধরে নেবেন যে ক্ষতি আসবে। নিজেকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত করুন। কোনো বিনিময় নেবেন না। আর যদি বিনিময় প্রত্যাশী হয়ে থাকেন, তবে কেবল ক্ষতির আশা-ই করুন। আপনি কেবল দান করুন, ত্যাগ করুন, পরীক্ষা এলে সবর করুন। এর চূড়ান্ত বিনিময় আপনি পাবেন আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে। আর সেটা কী?

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৫)

সবরকারীদের জন্য রয়েছে প্রশংসা, গৌরব ও মর্যাদা।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'যখন তাদের ওপর বিপদ আপতিত হয়, তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাওয়াত (ক্ষমা ও করুণা) প্রদান করা হয়েছে, আর এরাই হলো সুপথগামী।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৬-১৫৭)

সবর করলে আল্লাহ ﷻ-এর সালাওয়াত পাবেন। আপনার ওপর আল্লাহ ﷻ-এর করুণা বর্ষিত হবে, আল্লাহ ﷻ আপনার মর্যাদা উন্নীত করবেন। এত সব অনুগ্রহের কারণ কী? কারণ, কেবল সবর। আল্লাহ ﷻ আপনাকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সুতরাং সবর অবলম্বন করুন।

দাওয়াহর পথে সবরের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা :

শেষ কথা হলো, অধিকাংশ পরীক্ষা আপনি এড়াতে পারবেন না। কখনো কখনো সবর অবলম্বন করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মৃত্যুর কথাই ধরুন। মুসলিম, নেককার, পাপাচারী, কাফির, নাস্তিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান–মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেককে। সম্পদের ক্ষতি–প্রত্যেককে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। বিয়ে-সংক্রান্ত নানা জটিলতা–সবাইকে কমবেশি এগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এগুলোর আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু দাওয়াহর পথে সবরের বিশেষ মর্যাদা আছে। দ্বীনের ওপর অটল থাকা এবং এর ওপর সবর করা, অবশ্যই বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। কেন? কারণ, অন্যান্য পরীক্ষাগুলো আপনি চাইলেও এড়াতে পারবেন না, কিন্তু দ্বীনের পথের, দাওয়াহর পথের পরীক্ষা চাইলেই আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন।

www.banglakitab.weebly.com

দ্বীনের ও দাওয়াহর পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে পরীক্ষাগুলো এড়িয়ে চলার, এগুলোর মুখোমুখি না হবার, এমনকি পরীক্ষা আসার আগেই তা পরিত্যাগ করার সুযোগ ও সামর্থ্য আপনার আছে। সালাতের কারণে অফিসে নানা ঝামেলা হচ্ছে? আমি আর অফিসে সালাত আদায় করব না। ইশার পর বাসায় ফিরে পুরো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একসাথে আদায় করে নেব। দাওয়াহর কারণে আমাকে নজরদারিতে পড়তে হচ্ছে? আমি এসব ছেড়ে আমার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে থাকব। আপনি চাইলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ পরীক্ষাগুলো এড়িয়ে যেতে পারবেন। ঠিক এ কারণেই এ ধরনের কষ্ট হলো সর্বোত্তম কষ্ট, কারণ, এটা হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় কষ্ট। এ ধরনের কষ্ট ও তার ওপর সবরের মর্যাদাও সর্বোত্তম। কারণ, আপনাকে এখানে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় আর আপনি এর ওপর সবর করছেন। বাধ্য, নিরুপায় হয়ে না; বরং স্বেচ্ছায় আপনি সবর করছেন। যারা এই বিশেষ ধরনের কষ্টের মুখোমুখি হয়েও ধৈর্যশীল থাকেন তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ আল-ফিরদাউসে জায়গা করে দেন। এমন এক অবস্থান তাঁদের জন্য নির্ধারিত করেন নিজেদের আমলের মাধ্যমে যেখানে তারা হয়তো পৌঁছতে পারতেন না। এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তাঁদের নিয়ে যান তাঁর আরও কাছাকাছি, আল-আরশের কাছাকাছি।

কখনো যদি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যখন মনে হবে আপনি আর পারছেন না, তখন জান্নাতে প্রবেশ করার প্রথম মুহূর্তটির কথা চিন্তা করার চেষ্টা করবেন। সব সময় সেই মুহূর্তটির কথা চিন্তা করবেন, আপনার মনে একে গেঁথে রাখবেন। কল্পনা করুন তো, দুনিয়াতে সবচেয়ে কষ্টে কাটানো মানুষটিকে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ ﷻ কয়েক মুহূর্ত, এমনকি এক মিলি সেকেন্ডের চেয়েও কম সময়ের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারপর আল্লাহ ﷻ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এর আগে কষ্টকর কিছু দেখেছিলে? সে আর কিছুই মনে করতে পারবে না।

কেবল এই দৃশ্যটি কল্পনা করুন, এটা আপনার সবরে শক্তি জোগাবে।

শাইখ মুসার কিছু প্রজ্ঞাময় বাণী :

পরিশেষে, আমার বাবার বলা কিছু কথা উল্লেখ করব। কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রাখার মতো। প্রজ্ঞার পাশাপাশি যে পরিস্থিতিতে কথাগুলো বলা হয়েছিল সেটাও একে গভীর অর্থবোধকতা দান করেছে। আগেই বলেছি, কারাগারের একটা সময় আমরা সলিটারি সেলে কাটিয়েছি। প্রথমে আমাদের দুজনকে আলাদা আলাদা সেলে রাখা হয়েছিল। দুজনের সেল ছিল সলিটারি ওয়ার্ডের দুই প্রান্তে। কথা বলা, দেখা করা, এমনকি একজন আরেকজনের খোঁজ নেওয়ারও কোনো উপায় ছিল না।

কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী জেলার প্রতি সপ্তাহে একবার সলিটারি সেলের বন্দীদের পরিদর্শনে আসত। পরিদর্শনের সময় নিয়ম করে প্রতিটি সেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বন্দীর অবস্থা

www.banglakitab.weebly.com

দেখত। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমাকে সলিটারিতে রাখা হয়েছে?

কারণ, তুমি সন্ত্রাসী, তুমি অন্য কয়েদিদেরও তোমার মতাদর্শে গড়ে তুলতে পারো, তাদের সংগঠিত করতে পারো।

তোমার এই অভিযোগের পেছনে প্রমাণ কী?

কারাগারের মুসলিম ইমাম তোমার ব্যাপারে লম্বা রিপোর্ট দিয়েছে।

আসলে উম্মাহর সমস্যার মূলে মুনাফিকরা। কারাগারের ইমাম আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল। আমি জেলারকে বললাম, তুমি আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করলে, কিন্তু আমার বাবার ব্যাপারে কী বলবে? তাঁকে কেন সলিটারিতে রাখা হয়েছে? সে আমার বাবার ব্যাপারেও সেই একই অভিযোগ করল, অথচ বাবা জেলে খুব অল্প কথা বলতেন।

আমি আবার বললাম, তোমরা আমাদের আলাদা রেখেছ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি কেন তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগও পাই না?

তোমরা সবাইকে নিজেদের মতো চরমপন্থী বানাও, তাই তোমাদের সবার কাছ থেকে আলাদা রাখা হয়েছে।

ঠিক আছে, আমার আর বাবার বিরুদ্ধে তোমার এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এটা তো একটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। আর আমরা দুজনই যেহেতু এই রোগে আক্রান্ত তাই আমাকে আর আমার বাবাকে একই সেলে রাখলে তোমাদের জন্যই ভালো। তখন এ অসুখ আর অন্য কারও মধ্যে সংক্রমিত হবে না।

এ কথা শুনে গর্দভটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে, যাবার সময় অর্ডার দিয়ে গেল, আমাদের দুজনকে যেন একই সেলে রাখা হয়। তারপর বাবাকে আমার সাথে একই সেলে রাখা হলো। বাবার সাথে কাটানো সেই দিনগুলো ছিল আমার কারা-জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সলিটারিতে কাটানো মোট নয় মাসের মধ্যে প্রায় তিন বা চার মাস আমরা একই সেলে কাটিয়েছি। আমি এ সময় দেখেছি আমার বাবা হাসিমুখে সব পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। আজ অবধি তা-ই আছে। যা-ই ঘটুক না কেন তাঁর মধ্যে কখনো অসন্তোষ দেখিনি, তাঁকে সব সময় ধৈর্যশীল ও পরিতৃপ্ত পেয়েছি। আল্লাহুম্মা বারিক লাহু, আল্লাহ ﷻ তাঁকে নেক আমল-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু দান করুন।

আমাদের ছোট্ট সেলে ওপর-নিচ দুটো বেড ছিল। বাবা ঘুমাতেন নিচের বেডে, আমি ওপরেরটায়। তাঁর সময় কাটত সালাত আর কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে। ওপর থেকে আমি দেখতাম সব সময় তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত। তিনি কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতে ভালোবাসতেন। অন্যান্য বন্দীরা প্রতিরাতে তাঁর সূরা কাহফের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করত। অনেকে চিৎকার করে তাঁর কাছে নাসীহাহ চাইত। তিনি হাসিমুখে সবার কথার জবাব দিতেন। মাঝে মাঝে সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন। দরজার শিক ধরে দাঁড়িয়ে জোরে

www.banglakitab.weebly.com

কথা বললে সবাই শুনতে পেত। খুতবাতে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে নাসীহাহ দিতেন। আমরা সলিটারিতে থাকা অবস্থায় অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

ইবনুল কাইয়্যিম ﷀ তাঁর উস্তাদ ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷀ-এর ব্যাপারে বলেছিলেন, যখন আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যেত, আমরা আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷀ-এর শরণাপন্ন হতাম। তাঁর সামনে কয়েক মুহূর্ত কাটালেই তাঁর কথা আমাদের ঈমানকে তরতাজা করত। আমার বাবার ক্ষেত্রেও আমি তা-ই লক্ষ করেছি। আল্লাহ ﷻ তাঁকে নেক আমল-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর বারাকাহ্ময় চেহারা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও হাসি মুছে যেত না। শুধু গভীর রাতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন, সিজদাহয় পড়ে আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষে করতেন।

শীতের সময় মিশিগানে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে চলে যায়। কারাগারে ছিল বরফজমাট শীত। সেন্ট্রাল হিটিং বা তাপ নিয়ন্ত্রণের অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তার ওপর ওরা আমাদের কাছ থেকে সব কম্বলও নিয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো দিনের পর দিন ওরা আমাদের কোনো খাবার কিংবা পানি দিত না। ইরাক-ফেরত নির্দয় ও নিষ্ঠুর পশুগুলো বন্দীদের ওপর নিজেদের আক্রোশ মেটাতে চাইত। আসলে তাদের পশু বলাও উচিত না, এতে বরং পশুদের অসম্মান করা হয়। তবে কয়েকজন ব্যতিক্রমও ছিল। এক মেক্সিকান গার্ডের কথা মনে আছে, যে তখন মাত্র ইরাক থেকে ফিরেছে। অ্যামেরিকার নাগরিকত্ব পাবার জন্য সে আর্মিতে যোগ দিয়েছিল। ওদের একটি আইন আছে, কেউ যদি অ্যামেরিকান আর্মির হয়ে কয়েক বছর যুদ্ধ করে তবে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই গার্ডটি নিয়মিত আমাদের সেলের সামনে এসে দাঁড়াত। আমার বাবার দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেলত আর বলত, আমি জানি না ওরা কীভাবে আপনার সাথে এমন আচরণ করছে। তবে এ ধরনের লোক হলো ব্যতিক্রম, আর নিয়ম কখনো ব্যতিক্রমদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় না।

আমার ও বাবার সেল আলাদা করে দেবার কয়েক দিন আগের কথা। ওপরের বেডে বসে আমার বাবার আলোকদীপ্ত মুখ আর উজ্জ্বল হাসির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি হাঁটছিলেন। এটা ছিল তাঁর রোজকার রুটিন। অল্প জায়গার মধ্যেই পায়চারি করতেন আর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমি বললাম, আব্বু আপনার কি কখনো নিজের ঈমান নিয়ে সংশয় হয়েছে? যে পরীক্ষা আর কষ্টের সময় আমরা অতিক্রম করছি এগুলোর কারণে কখনো কি আপনার ঈমান দুর্বল হয়েছে?

এ সময় আমার বাবা এমন এক অবস্থায় ছিলেন যখন কারাগারে তাঁর ওপর নির্যাতন চলছে, পুরো পৃথিবী তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করেছে, তিনি নিজে অসুস্থ, বাসায় তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। একের পর এক বিপদ তাঁর ওপর আসছে। চেনা একজন মানুষকেও বিপদের সময় নিজের পাশে পাননি, তাঁর সব সম্পদ তিনি হারিয়েছেন, শুধু সম্পদ না জাগতিক প্রায় সবকিছু তিনি

www.banglakitab.weebly.com

হারিয়েছেন। পরীক্ষার সময় মাঝে মাঝে এমন অবস্থা আসে যখন রাসূলগণও আশাহীন হয়ে পড়েন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ

> 'অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলো এবং লোকে ভাবল যে, তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। তারপর আমি যাকে ইচ্ছা করলাম উদ্ধার করা হলো।' (সূরা ইউসুফ, ১১০)

مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

> 'তাদের ওপর ভীষণ বিপদ ও কষ্ট এসেছিল আর এতে তারা এমনভাবে শিহরিত হয়েছিল যে, নবি ও তাঁর সাথি ঈমানদার লোকেরা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্যে নিকটেই!' (সূরা আল-বাকারাহ, ২১৪)

রাসূল ﷺ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবি ﵃-গণ তীব্র দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিপদের তীব্রতায় তাঁরা এতটা বিপর্যস্ত হয়েছিলেন যে, রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা বলেছিলেন, কখন আসবে আল্লাহ ﷻ-এর সাহায্য? তাই রাসূলগণও এতটা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, যখন তাঁরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। রাসূলগণকেও এত ভয়ংকর কঠিন সময় পার করতে হয়েছে।

এতসব কথা এ জন্য বললাম যাতে উপলব্ধি করতে পারেন, কোন পরিস্থিতিতে কথাগুলো বলা হয়েছিল। কারণ, হাজার কিংবা পাঁচ শ ডলার দামের ম্যাট্রেসের ওপর শোয়া অবস্থায়, নরম উষ্ণ বিছানায় স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বলা কথা, আর শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে কোনো কম্বল ছাড়া কারাগারের নির্জন অন্ধকার কক্ষে শুয়ে বলা কথা এক রকম নয়।

আমি বাবাকে প্রশ্ন করলাম, আব্বু আপনার কি কখনো নিজের ঈমান নিয়ে সংশয় হয়েছে? যে পরীক্ষা আর কষ্টের সময় আমরা অতিক্রম করছি এগুলোর কারণে কখনো কি আপনার ঈমান দুর্বল হয়েছে? প্রশ্ন শুনে অন্ধকার কারাগারেও যেন তাঁর মুখ আলোকিত হয়ে উঠল। শান্ত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জীবন্ত কারও কাছে থেকে শোনা সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন,

> প্রিয়, আমাদের সাথে যদি এমন না ঘটত, তাহলে আমি সংশয়ে থাকতাম। এই পরীক্ষা যদি আমাদের ওপর না আসত, তাহলে বরং আমি আমাদের মানহাজ নিয়ে সংশয়ে ভুগতাম।

www.banglakitab.weebly.com

উপসংহার :

একজন মুসলিম, একজন দাঈ হিসেবে আপনাকে সব সময় এই সত্য পথের ওপর অটল থাকতে হবে। অন্যরা যে চোখে দুনিয়াকে দেখছে, আপনি সেভাবে দুনিয়াকে দেখতে পারবেন না। ওদের কাছে জীবন হলো প্রাইমারি, জুনিয়র, হাইস্কুল ও কলেজ শেষ করা। ওদের কাছে জীবন হলো অনার্স, মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা। এরই মধ্যে বা এর পর হয়তো বিয়ে করা, বাচ্চা জন্ম দেওয়া, তাদের বড় করে তোলা, চাকরি-বাকরি করা। সবশেষে রিটায়ারমেন্ট, রকিং চেয়ারে দোল খাওয়া। কোনো সমুদ্রসৈকত কিংবা নিরিবিলি রিসোর্টে স্ত্রীর সাথে বসে নাতি-নাতনিদের খেলা দেখা আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। ওদের কাছে এই হলো জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু একজন মুসলিমের জন্য সমীকরণটা আলাদা। একজন মুসলিম জানে, তার জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। এসব পার্থিব বিষয়াদি কখনো আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হতে পারে না।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'বলুন হে মুহাম্মাদ, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।' (সূরা আল-আনআম, ১৬২)

আমাদের জীবন শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য। আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের সব প্রচেষ্টা, আর শুধু তাঁর জন্য এ পথের সব বাধা-বিপত্তি আর কষ্ট সহ্য করা। আমরা কখনো পরীক্ষা কামনা করব না, কিন্তু পরীক্ষা এলে আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীন ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমরা ধৈর্য ধরব। দ্বীনের প্রশ্নে আপসহীন নীতিমান একজন ব্যক্তির জন্য পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। এ ধরনের মানুষকে পরীক্ষার মোকাবেলা করতেই হবে। আর যারা হকের দিকে আহ্বান করেন তাঁদের জন্য এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, মানুষের বানানো বিভিন্ন নোংরা, অর্থহীন আদর্শের অনুসারীরা যে পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করে, নিজ নীতির ওপর অবিচল থাকার ও আপস না করার যে দৃঢ়তা তাদের মধ্যে দেখা যায়, আজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনুসারীর মধ্যে ততটুকু সবর, ততটুকু দৃঢ়তা দেখা যায় না। আপনারা মাফিয়া নেতা, খুনি, কমিউনিস্টসহ বিভিন্ন মতাদর্শের লোকের জীবনী পড়ে দেখুন। জন গটি বা এ-জাতীয় অন্যান্যদের জীবনী পড়ে দেখুন। অবাক হয়ে যাবেন। নোংরা আদর্শের জন্য এই লোকগুলোর মধ্যে আত্মত্যাগের যে মানসিকতা ছিল আজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাহকদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আপনারা সবাই সম্ভবত বিখ্যাত কারি আবু বকর আশ-শাতরিকে চেনেন। আমার বাবার কাছ থেকে আবু বকর আশ-শাতরির একটি সাক্ষাৎকারের কথা শুনেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার তিলাওয়াতের মধ্যে এক ধরনের বিষণ্নতা খুঁজে পাওয়া যায়। কেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'কুরআন হিফয শুরু করার পর থেকে আমি একের পর এক দুর্যোগের

www.banglakitab.weebly.com

সম্মুখীন হই। আজ পর্যন্ত আমি একের পর এক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে যাচ্ছি।' এই হলো মুমিনের পার্থিব জীবন। আপনাদের কাজ হলো সবর করা, সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকা।

এ উপলব্ধিকে আপনার মন, মগজ ও অন্তরে গেঁথে নেবেন। যাতে যেদিন পরীক্ষার মুখোমুখি হবেন সেদিন যেন তার মোকাবেলা করতে পারেন। এটি এমন এক পরীক্ষা যেটাতে বেশির ভাগ মানুষ আটকে যায়। চাইলে এমন অনেকের নাম বলা যাবে যারা সামান্য পরীক্ষার কারণে সত্যের পথ ত্যাগ করেছে। এমন অনেক জনপ্রিয় নাম আর মুখ আছে যারা এমন সব সামান্য বিষয়ের জন্য সত্যকে ত্যাগ করেছে যেগুলোকে আসলে পরীক্ষাও বলা যায় না। তারা যখন দেখল, দুনিয়া পাল্টাতে শুরু করেছে, সত্যের প্রতি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছে—সাথে সাথে নিজেদের আদর্শকে ছুড়ে ফেলল। আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া এ ধরনের লোকেরা কীভাবে ধৈর্যের সাথে পরীক্ষার মোকাবেলা করবে? কীভাবে এমন একজন মানুষ বিপদের সময় আল্লাহ ﷻ-কে পাশে পাবার আশা করে?

www.banglakitab.weebly.com

দারস ১২

আমরা চারটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। বইয়ের শুরুতে শাইখ ﵀ বলেছেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِعْلَمْ رحِمك الله، أَنَّهُ يجِبُ علَيْنا تعلُّمُ أرْبعِ مسايِل، الأُوْلى : الْعِلْمُ ، وهُو معْرِفةُ اللهِ ، ومعْرِفةُ نبِيِّهِ ، ومعْرِفةُ دِينِ الأسْلامِ بالأدِلَّةِ . الثَّانِيةُ : العملُ بِهِ . الثَّالِثةُ : الدَّعْوةُ إِليْهِ . الرَّابِعةُ : الصَّبْرُ على الأذى فِيهِ. والدَّلِيْلُ قوْلُهُ تعالى - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ : والْعصْرِ - إِنَّ الْانسان لفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ وتواصوْا بِالْحقِّ وتواصوْا بِالصَّبْرِ

قال الشَّافِعِيُّ - رحِمهُ اللَّهُ تعالى : لو ما أنْزل اللهُ حُجَّةً على خلْقِهِ إلَّا هذِهِ السُّورة لكفتْهُمْ .

'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম। অবগত হোন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, চারটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা আমাদের ওপর ওয়াজিব।

এক. এমন ইলম, যার সাহায্যে দলিল-প্রমাণসহ আল্লাহ ﷻ, তাঁর নবি ﷺ ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা যায়।

দুই. ওই ইলম অনুযায়ী আমল করা।

তিন. এর দিকে দাওয়াহ দেয়া।

চার. এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে সবর করা।

এ কথাগুলোর দলিল হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর নিম্নোক্ত বাণী :

'কালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, আর যারা পরস্পরকে হক তথা সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে।' (সূরা আল-আসর, ১-৩)

www.banglakitab.weebly.com

ইমাম শাফে'ঈ ﷺ বলেছেন,

> যদি আল্লাহ ﷻ তাঁর সৃষ্টির ওপর প্রমাণ পেশ করার জন্য এ সূরা ছাড়া অন্য কোনো কিছু অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সবদিক দিয়ে যথেষ্ট হতো।'[১৫৩]

উসুল আস-সালাসাহ্‌র মূল বিষয়বস্তু তাওহিদ। আপনার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে বইগুলোকে যদি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে—যেমন : ফিকহ, উসুল, তাওহিদ, সিরাহ ইত্যাদিতে—ভাগ করে রাখেন, তাহলে এই বইটিকে রাখতে হবে তাওহিদের ক্যাটাগরিতে। তবে ইসলামি ইলমের শাখাগুলো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগের দারসগুলো আমাদের আলোচনায় উসুল ও হাদিসশাস্ত্র-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় এসেছিল, এখন আমাদের আলোচনা তাফসিরের দিকে যাবে।

ভূমিকা :

আমরা আজ সূরা আল-আসর নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। তবে খুব একটা গভীরে যাব না, কারণ এতদিন ধরে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তার পুরোটাই আসলে সূরা আল-আসরের তাফসির। এতদিন যে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো সরাসরি সূরা আল-আসর থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরা আল-আসরের ভূমিকা হিসেবে *আত-তাবারানিতে* উল্লেখিত একটি সহিহ হাদিস উল্লেখ করাই যথেষ্ট,

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ : وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

> 'যখন সাহাবি ﷺ-গণ কোথাও একত্র হতেন অথবা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তারা কখনো সূরা আল-আসর তিলাওয়াত না করে বিদায় নিতেন না।'[১৫৪]

এ থেকেই বোঝা যায়, তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কেমন ছিল। নিজেদের আলোচনার বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আমাদের অনেক সাবধান হওয়া উচিত। আপনার কথাবার্তার সাথে তাঁদের আলোচনার তুলনা করুন। আপনি হাদিসে দেখতে পাবেন, তাঁদের স্বপ্ন, আশা, চিন্তা-ভাবনা সবকিছু ছিল ইসলামকে কেন্দ্র করে। ইলম মানে বইপত্র মজুদ করা না, বরং এটি বাস্তব জীবনে প্রয়োগের বিষয়। ইলমের প্রভাব আপনি দেখতে পাবেন সাহাবি ﷺ-দের জীবনীতে, তাঁদের চলাফেরায়। মাসজিদে এক রকম আর দেয়ালের অপর পাশে ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ আরেক রকম, এমন দ্বিমুখী তাঁরা ছিলেন না। বর্তমান যুগের মানুষদের নিয়ে জরিপ করলে

---

১৫৩ *তাফসিরুশ শাফে'ঈ* : ৩/১৪৬১; *মাজমু আল ফাতাওয়া* : ২৮/১৫২;

১৫৪ *তাবারানি, মু'জামুল আওসাত* : ৫১২৪; *সিলসিলা সহিহাহ* : ২৬৪৮

www.banglakitab.weebly.com

দেখা যাবে, তালিবুল ইলম, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, পেশাদার ব্যক্তি, সাধারণ শ্রেণির লোক, সবার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজনীতি, খেলা, ব্যবসা, সম্পদ ইত্যাদি। আর অনেকে তো এমন আরও বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা সুস্পষ্ট হারাম।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন সাহাবি ﷺ-গণ তাদের ব্যক্তিগত বৈঠকে সূরা আল-আসর তিলাওয়াত করতেন? কুরআনের এত এত আয়াত এবং এত এত হাদিস জানা সত্ত্বেও কেন সূরা আল-আসর? কুরআনে ১১৪টি সূরা আছে। কেবল সাওয়াবের জন্য হলে তো সর্বপ্রথম গুরুত্ব পাওয়ার কথা সূরা আল-ফাতিহার। কারণ, সূরা আল-ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়। অথবা সূরা আল-ইখলাস প্রাধান্য পাওয়ার কথা, কেননা এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু কেন সূরা আল-আসর?

সূরা আল-আসরে রয়েছে তিনটি আয়াত, চৌদ্দটি শব্দ এবং সতেরোটি বর্ণ। কুরআনের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সূরাগুলো হলো আল-ইখলাস, আল-কাউসার, আন-নাসর এবং আল-আসর। এড় মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো আল-কাউসার আর তার ঠিক পরেই আল-আসর। তাহলে কেন সূরা আল-আসর? কারণ, এই সূরা থেকে আমাদের বিশ্বাসের চারটি বুনিয়াদি বিষয় পাওয়া যায়। এই সূরার মাঝে রয়েছে আপনার পরিত্রাণ। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার উপায় আছে এই সূরায়। এই সূরা আপনার পথপ্রদর্শন করে, বন্ধুত্বের সঠিক অর্থ এবং অপরের সাথে সম্পর্কের ধরন নির্ধারণ করে, আর তাই সাহাবি ﷺ-গণ এ সূরাকেই বেছে নিয়েছিলেন। আল্লাহ ﷻ সূরা আল-আসরে বলেন :

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে।

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

যারা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে–অর্থাৎ যারা পরস্পরকে আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত উত্তম কাজের প্রতি আহ্বান করেছে এবং আল্লাহ ﷻ-এর নিষিদ্ধকৃত সকল গুনাহ ও মন্দকাজ থেকে বারণ করেছে।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ কারা সফল সেটা জানাতে গিয়ে ঈমান ও সৎকর্মের পর আল্লাহ ﷻ বলছেন, তাঁরাই সফল যারা পরস্পরকে হক তথা সত্যের উপদেশ দিয়েছে–যেমন একে অপরকে সব ধরনের সৎ কাজে উৎসাহিত করেছে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছে। এবং পরস্পরকে ধৈর্যধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে। অর্থাৎ, যারা তাওহিদের দাওয়াহ অথবা জিহাদসহ অন্যান্য বিষয়ের কারণে আল্লাহ ﷻ-এর পথে আসা বিপদ, আঘাত ও বিপর্যয়ের

www.banglakitab.weebly.com

সময় পরস্পরকে বারবার সবরের উপদেশ দিয়েছে।

আল্লাহ ﷻ এখানে সময়ের শপথ করছেন। তিনি যে বিষয়ে ইচ্ছা শপথ করতে পারেন। তবে কোনো বিষয়ে আল্লাহ ﷻ-এর শপথ করা বিষয়টিকে বিশেষভাবে সম্মানিত ও গুরুত্ববহ করে তোলে। আমরা সবাই জানি, আল্লাহ ﷻ-এর সব বাণীই অত্যন্ত সম্মানিত। তাহলে চিন্তা করুন, আল্লাহ ﷻ যে বিষয়ে কসম করছেন, তা কতটা সম্মানিত! এক বেদুইন সূরা আয-যারিয়াতের এই আয়াতটি শুনে কাঁপতে শুরু করেছিল, যেখানে আল্লাহ ﷻ শপথ করে বলেন :

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতোই এটা সত্য। (সূরা অ্যা-যারিয়াত, ২৩)

এ আয়াত শুনে বেদুইনটি কাঁপতে শুরু করেছিল। বলেছিল, কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-কে এতটা রাগান্বিত করেছে যে, আল্লাহ ﷻ এমন শপথ করলেন? আল্লাহ ﷻ-এর এই শপথের ওজন সে অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিল।

'আসর' অর্থ :

আসর অর্থ সময়। তবে আল্লাহ ﷻ আল-আসর বলতে কোন সময়কে বুঝিয়েছেন তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ কখনো কখনো অনেক ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তাই একটি শব্দ বা আয়াতের ব্যাপারে আপনি বিভিন্ন মত দেখতে পাবেন। আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে এমতগুলোকে সংক্ষেপ করে চারটি মতে তুলে আনাই উত্তম, এর প্রত্যেকটি মত সঠিক।

প্রথম অভিমত : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়

আল-আসর এর প্রথম অর্থটি হচ্ছে আদ-দাহর ওয়ায-যামান (الدَّهْرُ وَالزَّمَانُ) বা সময় ও যুগ। এখানে কোন যুগকে বোঝানো হচ্ছে তা নিয়ে দুটো মত রয়েছে,

এক. সৃষ্টির শুরু থেকে বিচার দিবস পর্যন্ত;

দুই. মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত; এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, মানুষের জীবন ঘুরতে থাকা চাকার মতো। প্রতিটি মুহূর্ত, সেকেন্ড, পার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে জীবনের একটি অংশ হারিয়ে যায়। কল্পনা করুন যেন আপনি সময় থেকেই সৃষ্ট। যাপিত প্রতিটি মুহূর্তের সাথে আপনার এক-একটি অংশ গিয়ে সমাহিত হচ্ছে কবরে। ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মতে, আসর হচ্ছে দাহর (دهر)—সময়স্রোত, সময়কাল, যামানা, যুগ। ওয়াল আসর (وَالْعَصْرِ) এখানে

www.banglakitab.weebly.com

ওয়া (و) হলো একটি হারফু কাসম (حرف قسم) বা শপথ-বর্ণ।

সুতরাং প্রথম অভিমত অনুযায়ী আল-আসর হলো সৃষ্টির শুরু থেকে বিচার দিবস পর্যন্ত সময় অথবা ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়।

খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ ﷻ সময়ের কসম করেছেন। কিন্তু কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, এই সময়কালের মাঝেই নেয়া হয় মানবজাতির চূড়ান্ত ভাগ্য-নির্ধারণকারী পরীক্ষা। এটি এ জন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, আল-আসরের মাঝে আল্লাহ ﷻ তাঁর অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করেন। তিনি রাতকে সৃষ্টি করেছেন আচ্ছাদন হিসেবে এবং ঘুমকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামস্বরূপ। দিনকে করেছেন কর্মশক্তিপূর্ণ যেন আমরা কাজ করতে পারি। এ সব আল্লাহ ﷻ-এর নিদর্শন। আল-আসরের মাঝেই নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রবাহিত হচ্ছে দিন-রাত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ। সুতরাং আল-আসর গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই আল-আসরের মাঝেই আপনার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়, এর মাঝেই আল্লাহ ﷻ-এর তাঁর অলৌকিক নিদর্শনের অনেকগুলোকে প্রকাশ করেন।

সময় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন ব্যক্তির জীবনের শেষ মুহূর্তটি হতে পারে তার চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারণের কারণ। এই মুহূর্তে সে যদি শাহাদাহ পাঠ করে, তবে তা তাকে নিয়ে যেতে পারে চিরস্থায়ী ধ্বংস থেকে জান্নাতের দিকে; সেই জান্নাত যা আসমান ও জমিনের চেয়েও সুবিশাল। যদি জীবনের অল্প কিছু মুহূর্ত একজন ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী ধ্বংস থেকে জান্নাতের বাগানে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে ভেবে দেখুন আপনার পুরো জীবনে এই সময়ের মূল্য কত! ভেবে দেখুন সময় কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই আল্লাহ ﷻ সময়ের শপথ করছেন।

দ্বিতীয় অভিমত : নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগ

দ্বিতীয় অভিমত হলো, আল-আসর বলতে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগকে বোঝানো হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আদর্শ যুগ। এটাই এ উম্মাহর 'সোনালি যুগ'। কারণ, আমরা সবকিছুতে সিদ্ধান্তের জন্য বারবার এ যুগের কাছে ফিরে যাই। সোনালি এ যুগের শিক্ষায় নিজেদের জীবনকে সাজিয়ে না তোলা পর্যন্ত এই উম্মাহ কখনো সফলতা অর্জন করতে পারবে না। রাজনীতি থেকে শুরু করে ইবাদত, আকিদাহ, শিষ্টাচার, সঠিক পথ-নির্দেশনা—সবকিছুর শিক্ষা এই সর্বোত্তম সোনালি যুগ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

এটা হলো দ্বিতীয় মত।

তৃতীয় অভিমত : দিনের শেষাংশ

তৃতীয় অভিমত হলো, আসর হলো দিনের শেষাংশ। কাতাদাহ رحمه الله তাঁর অনেকগুলো মতের মধ্যে আল-আসর সম্পর্কে একটি মত দিয়েছেন যে, আল-আসর হচ্ছে দিনের সর্বশেষ সময়;

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ সূর্যাস্তের আগমুহূর্ত। সাধারণত যে সময় সবাই কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে শুরু করে। দিন শেষে কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরে মানুষ সারা দিনের লাভ-ক্ষতির হিসাব করে। চিন্তা করতে থাকে, ওই দিনে সে কী কী অর্জন করল বা হারাল। আল্লাহ ﷻ চান দুনিয়াবি এই জীবনের ব্যস্ততা থেকে সাময়িক অবসর পেয়ে আপনি যখন পার্থিব হিসেব-নিকেশ মেলাতে শুরু করেন, তখন যেন আখিরাতের প্রতিও মনোযোগী হন। তিনি চান আপনি যেন এই সময়ে আখিরাতমুখী হন, দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতের লাভ-ক্ষতি নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করেন।

আখিরাত একটি ব্যবসায়িক লেনদেন। আল্লাহ ﷻ স্বয়ং একে ব্যবসা বলেছেন। দিন শেষে যেমন আপনি লাভ-ক্ষতির হিসেব করেন, ব্যর্থতা-অর্জন নিয়ে ভাবেন, ঠিক তেমনি আখিরাত নিয়েও করবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

> যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না। (সূরা আল-ফাতির, ২৯)

তিজারাহ হলো ব্যবসায়িক লেনদেন। আল্লাহ ﷻ আখিরাতকে একটি ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ এমন এক ব্যবসা যা দুনিয়াবি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে এমন এক লেনদেনের কথা বলা হচ্ছে, দুনিয়াবি ব্যবসার মতো যা কখনো ধ্বংস হয় না। এমন এক লেনদেন যেখানে কোনো লস নেই, শুধুই প্রফিট। তাই দিন শেষে যেমন আপনি দুনিয়া নিয়ে ভাবেন, ঠিক তেমনি আখিরাত নিয়েও ভাবুন। আল্লাহ ﷻ চান, আপনি এই সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করুন।

আমার এক উস্তাদ তাঁর উস্তাদের কাছ থেকে শোনা একটি কথা আমাকে বলেছিলেন। অথবা তিনি কোথাও এটা পড়েছিলেন বা শুনেছিলেন, আসলে আমি সঠিক মনে করতে পারছি না; কিন্তু কথাটি তাঁর অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল আর তাঁর কাছ থেকে শোনার পর কথাটি আমার অন্তরেও গেঁথে গেছে। তিনি বলেছিলেন, আলিমগণ আল-আসরের মূল্য অনুধাবন করতেন যখন তাঁরা ঠেলাগাড়িতে করে বরফ ফেরি করে বেড়ানো বিক্রেতার দিকে তাকাতেন। আমি শেষবার হজে গিয়েছিলাম নব্বই দশকের মাঝামাঝি। সেই সময়টাতে হজের মৌসুমে উত্তপ্ত গরমের মধ্যে মিনা, আরাফাহ ও মুযদালিফাতে অনেক মালবাহী গাড়িতে করে বড় বড় বরফ-খণ্ড বিক্রি করা হতো। এমন একজন বিক্রেতার কথা চিন্তা করুন। সে যদি প্রতিটা সেকেন্ডের সুযোগ না নেয় এবং বরফগুলো বিক্রি না করে, তাহলে কী হবে? বরফগুলো গলতে শুরু করবে। যদি সে বরফের গাড়িটি রেখে মিনার তাঁবুতে বিশ্রাম নিতে থাকে, অলসভাবে বসে সময় কাটায়, তাহলে বরফগুলো তরল পানিতে পরিণত হবে আর তার বিনিয়োগ করা অর্থ,

www.banglakitab.weebly.com

তার মূলধন ও লাভ সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। অনর্থক গলে বরফ যখন ধুলোর সাথে মিশে যাবে তখন বিলাপ আর আফসোস ছাড়া তার আর কিছু করার থাকবে না। কোনোভাবে সে আর এই হারানো সম্পদটি ফিরে পাবে না। এই বরফ হলো আল-আসর, আপনার সময়। আপনি যদি একে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে না লাগান, তাহলে এটি পানির নিষ্ফল ফোঁটার মতো হারিয়ে যাবে অলিগলি আর নর্দমায়। আর কখনো আপনি তা ফিরে পাবেন না।

কুরআন খুললেই আপনি বুঝতে পারবেন, এ কেমন অসাধারণ কিতাব! আল্লাহ ﷻ সূরা আদ-দুহাতে পূর্বাহ্নের শপথ করছেন। আল্লাহ ﷻ এমন সময়ের শপথ করেছেন যখন দিনের আলো থাকে, মানুষজন কাজকর্ম করে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَالضُّحَىٰ

পূর্বাহ্নের শপথ। (সূরা আদ-দুহা, ১)

দিনের শুরুতে মানুষের কর্মোদ্দীপনা শুরু হয়। তারা স্কুল-কলেজে যায়, ব্যবসা শুরু করে, অফিসে যায়–এ সময়টাই দুহা। দিনের প্রথমভাগ। এর কয়েক আয়াত পর আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা আদ-দুহা, ২)

আর দিনের আলোর নামে এই শপথের কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ ﷻ তাঁর নবিকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। দিনের প্রথমভাগের শপথের সাথে আল্লাহ ﷻ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিকে যুক্ত করলেন। কিন্তু সূরা আল-আসরের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন আল্লাহ ﷻ দিনের শেষভাগের শপথ করে বলছেন,

'কালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।'

তৃতীয় অভিমত অনুযায়ী আসর হচ্ছে দিনের শেষভাগ, সূর্য ডোবার আগমুহূর্ত। যখন মানুষজন কর্মস্থল থেকে ফিরে আসে। যখন একটি দিন শেষ হয়ে পরবর্তী দিন শুরু হয়, কারণ হিজরি মতে নতুন দিনের সূচনা ধরা হয় মাগরিবের সময় থেকে।

আল্লাহ ﷻ বলছেন :

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

কেন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে? কারণ, এখন দিন শেষ হয়ে গেছে আর এ দিনকে যদি

www.banglakitab.weebly.com

আপনি কাজে না লাগিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার বরফ গলে পানি হয়ে গেছে। অন্যদিকে সূরা আদ-দুহায় দিনের শুরুতেই আল্লাহ ﷻ আপনাকে ভালো কাজে উৎসাহিত করতে দুহার নামে শপথ করে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সুতরাং তৃতীয় মতানুযায়ী, যদি আপনি পুরো দিনকে সৎ কাজে ব্যয় না করেন, তবে দিনের শেষে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত বলে বিবেচিত হলেন।

চতুর্থ অভিমত : সালাতুল আসর বা আসরের সালাতের ওয়াক্ত

ইবনু উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»

'যার আসরের সালাত ছুটে গেল, সে যেন পরিবার, সম্পত্তি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল।'[১৫৫]

অপর এক বর্ণনায় আছে,

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

যে ব্যক্তি আসরের সালাত ত্যাগ করল, তার আমল বিনষ্ট হয়ে গেল।[১৫৬]

লক্ষ করুন, এ হাদিসগুলোতে আসরের সালাতের সময় মিস করার কথা বলা হচ্ছে। সালাত একেবারে ত্যাগ করার কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না। এটা হলো শুধু আসরের সালাত ওয়াক্তে না পড়ার পরিণতি। কল্পনা করুন, আপনার খুব ভালো একটি চাকরি আছে। আছে সুখের সংসার। বেশ চমৎকার সময় কাটাচ্ছেন আপনি। হঠাৎ একদিন দেখলেন আপনার চাকরি, পরিবার, ধন-সম্পত্তি কিছুই নেই। এককথায় আপনি নিঃস্ব, রিক্ত এবং দেউলিয়া। আপনার কেমন লাগবে? ওই মুহূর্তে আপনার যে তীব্র কষ্টের অনুভূতি হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আসরের সালাতের ওয়াক্ত মিস করা লোকের অবস্থা তার চেয়েও করুণ।

নির্বাচিত অভিমত :

আল্লাহ ﷻ-এর কালাম মুজিযা এবং এর অর্থ অনেক ব্যাপক। একই শব্দ অনেক সময় অনেকগুলো অর্থকে ধারণ করে। আত-তাবারি رحمه الله-এর মতে, আল-আসরের ব্যাপারে সঠিক অভিমতটি হলো আল্লাহ ﷻ এখানে যুগের কসম করেছেন। দিন, রাত, অপরাহ্ন, সমস্ত সময় এর আওতাভুক্ত। আল্লাহ ﷻ এখানে নির্দিষ্ট করে কোনো সময়ের কথা উল্লেখ করেননি। তাই যা কিছু সময়ের আওতায় পড়ে সে সবই এই একটি আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আত-তাবারি رحمه الله-এর এই মতটিই গ্রহণ করেছেন আশ-শানকিতি رحمه الله। আমি *আদওয়ায়ুল বায়ান*-এর লেখক শানকিতির কথা বলছি। শানকিতি নামে অনেক মানুষ আছে,

১৫৫ *সহিহুল বুখারি* : ৫৫২; *সহিহ মুসলিম* : ১৪৪৮
১৫৬ *সহিহুল বুখারি* : ৫৫৩

www.banglakitab.weebly.com

আর এই নামে অনেক আলিমও আছেন। কিন্তু যখন আপনি বলবেন আশ-শানকিতি, তখন ইলমের সংস্পর্শে থাকা মানুষজন মুহাম্মাদ আমিন আশ-শানকিতি ﵀-এর কথাই চিন্তা করবে। যেমন : কেউ যদি বলে আল-কিতাব তাহলে আমরা বুঝে নিই যে, কুরআনের কথা বলা হচ্ছে। যদিও কিতাব অনেক আছে।

আমার বাবা যখন মদীনাতে পড়াশোনা করছিলেন তখন আশ-শানকিতি ﵀ সেখানে উস্তাদ ছিলেন। তিনি ছিলেন ইলমের এক পর্বতস্বরূপ। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তাঁকে দেখার, যদিও আমার সে সুযোগ হয়নি। বাবার কাছে আশ-শানকিতি ﵀-এর অডিও লেকচারের অনেকগুলো ক্যাসেট ছিল যেগুলো প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরনো। খুব যত্নে নিজের বিছানার নিচে তিনি এগুলো গুছিয়ে রেখেছিলেন। আনুমানিক বারো বছর আগে এফবিআই এগুলো ছিনিয়ে নেয়। আমার মনে আছে, আমি এসব ক্যাসেট থেকে কিছু কিছু শুনতাম। যার মধ্যে ছিল সূরা তাওবাহর তাফসির। এই মহিরুহসম ব্যক্তির ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন, ইবনু বায, ইবনু উসাইমিন, আব্দুর রাহমান আল-বাররাক, হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবি, বাকর আবু যাইদ এবং আতিয়্যাহ সালিম ﵀। আমার বিশ্বাস তাঁর প্রধান ছাত্র ছিলেন আতিয়্যাহ সালিম ﵀, কারণ শায়খ আশ-শানকিতি ﵀-এর ছাত্র হবার পর থেকে তিনি আর তাঁকে ছেড়ে যাননি। আশ-শানকিতি ﵀-এর সাথে দেখা হবার পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আতিয়্যাহ সালিম ﵀ তাঁর সাথে ছিলেন। আর আতিয়্যাহ সালিম ﵀ ছিলেন আমার ও আমার বাবার শিক্ষক।

শাইখ আশ-শানকিতি ﵀ কুরআনের তিনটি তাফসির লিখেছিলেন, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শেষেরটি এবং এটিই সবচেয়ে অসাধারণ। তিনি এতে কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসির করেছেন। এই তাফসিরের সাতটি খণ্ড আছে, আর সূরা আল-মুজাদালাহর ২২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পৌঁছানোর পর আশ-শানকিতি ﵀-এর মৃত্যু হয়–রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার ছাত্র আতিয়্যাহ সালিম ﵀–আমার বাবার শিক্ষক, আমার শিক্ষক এবং আমি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম–আশ-শানকিতি ﵀-এর মৃত্যুর পর তাফসিরের বাকি অংশ শেষ করেন। তারপর তা প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বজুড়ে আজ তা আদওয়ায়ুল বায়ান নামে পরিচিত।

বাবার কাছে শুনেছি আশ-শানকিতি ﵀-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কেন তাফসিরের ওপর এত জোর দেন? তিনি উসুলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইলমসম্পন্ন ছিলেন, ফিকহের ওপর গভীর জ্ঞান রাখতেন, আকিদাহর ওপর অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক ইলমসম্পন্ন ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর লেখা বিভিন্ন ছোট পুস্তিকাও আছে। ইসলামি জ্ঞানের অনেক শাখার ওপর তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের ওপর গভীর দখল রাখতেন। তবুও তাঁর জীবনের একটা বিশাল অংশ তিনি তাফসিরের পেছনে দিয়েছিলেন। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে সালাফগণের একজনেরও এমন কোনো মত নেই, যা আমি জানি না। গর্ব করে তিনি এ কথা বলেননি,

www.banglakitab.weebly.com

নিজের ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের সাথে একান্তে আলাপে জানিয়েছেন কেবল। আর তাঁর ছাত্ররাও কারা? একেকজন প্রতিভাবান আলিম। আমার বাবা বলেছেন তিনি নিজের কানে এ কথা শুনেছেন। আর অবশ্যই আমি আমার বাবার কথা বিশ্বাস করি এবং তাঁকে ভালোবাসি। আল্লাহ ﷻ তাঁকে নেক আমল সমৃদ্ধ কল্যাণময় দীর্ঘ জীবন দান করুন। পরে মদীনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর আমি শাইখ আতিয়্যাহ সালিম ؒ-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। একদিন তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আমি বাবার কাছ থেকে এ রকম শুনেছি, এ কথোপকথন কি আপনি শুনেছিলেন? শায়খ আতিয়্যাহ ؒ বললেন, যেই দিন তোমার বাবা এ প্রশ্ন করেছিলেন সেই দিন, সেই স্থান এবং তাঁর চারপাশের অবস্থার কথাও আমার মনে আছে।

আশ-শানকিতি ؒ ছিলেন ইলমের পর্বতস্বরূপ। কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে সালাফদের কোনো মত তাঁর অজানা ছিল না। এখন ছোকরা-বদমাইশ ছেলেপেলে ছুটোছুটি করে বেড়ায় আর নিজেদের এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন তারা ইমামুল মুফাসসিরিন। আল্লাহ ﷻ-এর শত্রু এবং মানবজাতির শত্রুদের সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তুচ্ছ মূল্যে আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত আর রাসূল ﷺ-এর হাদিস বিকিয়ে দেয়।

কিছুদিন আগে এক ভাই এসেছিলেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, আর আমি তাঁর সত্যবাদিতাকে সম্মান করতে বাধ্য। তিনি আমাকে বললেন, আপনি কি আমাকে একটি তাযকিয়্যাহ বা রেকোমেন্ডেশান লেখে দেবেন যাতে করে আমি অমুক জায়গায় পড়ার সুযোগ পাই? যেহেতু আমি তাঁকে চিনি না, তাই কিছু প্রশ্ন করলাম। তুমি কেন ইলম অর্জন করতে চাও? তুমি কেন ওইখানে পড়তে চাও? উনি বেশ আন্তরিক এবং সৎ ছিলেন। উনি বললেন, উনি শিখতে চান যাতে করে এ দিয়ে টাকা রোজগার করতে পারেন।

উনি বললেন, উনি অমুক অমুককে চেনেন যারা কেবল আরবি জানে। এরা ইন্সটিটিউট খুলে বসেছে আর প্রতিবছর প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে ফি নিচ্ছে। তিনি এমন অনেকের নামও বললেন যাদের আমি চিনিও না। এমন একজনের কথা বললেন, যার কাছ থেকে কুরআনের তাফসির শিখতে হলে তাকে টাকা দিতে হয়। এই ভাইটিও এটা চাচ্ছিলেন। কিছু ইলম জোগাড় করে সেটা বেচে খেতে চাচ্ছিলেন।

এখনো ডিম থেকে ফুটে বের হয়নি এমন সব ছেলেছোকরা, নিকৃষ্ট মুফাসসির আজ আমাদের মধ্যে আছে, যখন কাফিরদের ওপর কোনো বিপদ আসে তখন এসব লোকেদের সম্মিলিত চিৎকারে মিম্বারগুলো কাঁপতে শুরু করে। তারা একে অপরকে উসকে দেয়। আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের অর্থকে তারা বিকৃত করে, হাদিসের অর্থকে বিকৃত করে। আর যখন উম্মাহর ওপর কোনো বিপর্যয় আসে, যখন উম্মাহর ওপর জেনোসাইড চালানো হয়, বাংলাদেশে আমাদের ২,৫০০-৩,০০০ প্রাণপ্রিয় ভাইদের হত্যা করা হয়, তখন তাদের মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। যখন কাফিরদের রক্তপাত হয় তারা তখন একভাবে চিন্তা করে, যখন মুসলিমদের রক্ত ঝরে তখন আরেকভাবে। এরা হলো নপুংসক। আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি,

www.banglakitab.weebly.com

এরা হলো উম্মাহর নপুংসক। নপুংসক হলো সে, যার মধ্যে পুরুষ ও নারী–উভয়ের জননাঙ্গ থাকে, আর তার চিন্তা ও কথার ধরনের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা ও বিসদৃশ বৈশিষ্ট্য থাকে। উম্মাহর নপুংসকদের একই অবস্থা।

আসলে এসব বিষাক্ত টিউমারদের চেয়েও বেশি দোষ হলো স্রোতের টানে ভেসে আসা ভেড়ার মতো ওইসব লোকের যারা এদের অনুসরণ করে–দোষ এই মূর্খ জনগণের। আপনি দেখবেন, অলংকারের ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই এমন লোকও নিজের স্ত্রী কিংবা মায়ের নেকলেস অলংকারের দোকানির কাছে সারানোর জন্য আধাঘণ্টার জন্য রাখার আগেও দশবার ভাবে। এই দোকানি বিশ্বস্ত কি না, সে ভালো কাজ জানে কি না, দক্ষ কি না–নেকলেস দেয়ার আগে সে এ ব্যাপারগুলো নিশ্চিত হয়ে নেয়। ডাক্তারের ক্ষেত্রেও একই কথা। সে খুঁজে খুঁজে সেরা ডাক্তারকে বের করে তার কাছে যায়। কিন্তু যখন দ্বীনের প্রশ্ন আসে, কোনো যাচাইবাছাই ছাড়া সে এসব নপুংসকদের কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করবে।

যা হোক, আমরা মূল আলোচনাতে ফিরে যাই। সূরা আল-আসরের এই আয়াতের ব্যাপারে শায়খ আশ-শানকিতি ﵀ ইমাম আত-তাবারি ﵀-এর মতই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল-আসর হলো সম্পূর্ণ সময়। অর্থাৎ শাইখ আশ-শানকিতি ﵀-এর মতে, আল-আসর হলো আপনার পার্থিব জীবনকাল অথবা সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সময়কাল। তাঁর অভিমত ইমাম আত-তাবারি ﵀-এর মতের খুব কাছাকাছি। কত অসাধারণ ও অনন্য উপায়ে শাইখ আশ-শানকিতি ﵀ এই উপসংহার টানলেন এবং এর পক্ষে দলিল দিলেন তা তুলে ধরার জন্য আমি এখানে তাঁর কথা বললাম। তিনি বলেছেন, সূরা আল-আসর এর আগে আসে সূরা আত-তাকাসুর। যেখানে আল্লাহ ﷻ ওইসব লোকেদের প্রতি নিন্দা জানাচ্ছেন যারা কবরের সাক্ষাৎ পাবার আগ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকে। আবার সূরা আল-আসরের পর এসেছে সূরা আল-হুমাযাহ। এখানেও আল্লাহ ﷻ বলেন :

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ - يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ - كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ-وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ- نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ

> যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে! কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামাহর মধ্যে। আপনি কি জানেন, হুতামাহ কী? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি। (সূরা আল-হুমাযাহ, ২-৬)

আল্লাহ ﷻ এখানে বলছেন, সঞ্চিত সম্পদ তোমাদের চিরজীবী করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, এখান থেকে মানুষের শিক্ষা নেয়া উচিত সময়ের সদ্ব্যবহার করার, যাতে করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে সফল হওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, যেহেতু সূরা আল-আসরের আগের এবং পরের সূরাগুলোতে দুনিয়াবি জীবনে সময়ের সঠিক ব্যবহার না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, সুতরাং এই দুইয়ের

www.banglakitab.weebly.com

মধ্যবর্তী সূরাটি অর্থাৎ সূরা আল-আসরও একই তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ এখানে দুনিয়ার জীবনে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। শায়খ আশ-শানকিতি ﷺ-এর মতে সূরা আল-আসরের মূলভাবকে বুঝতে হলে, আমাদের এর আগের ও পরের সূরার মূলভাবকে জানতে হবে, সেটা অনুযায়ী সূরা আল-আসরকে বুঝতে হবে।

আল-আসরের গুরুত্ব :

'আসর' শব্দটি তিনটি আরবি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত—আইন, সাদ, রা। একটি মাত্র শব্দ, কিন্তু গুরুত্ব অনুধাবনকারীদের জন্য এই ছোট্ট শব্দটির ভার অনেক। অধিকাংশ মানুষ সময়ের মূল্য দেয় না। বিশেষ করে বর্তমান যুবসম্প্রদায় একেবারেই সময়ের মূল্য দেয় না। তরুণেরা আমাদের ভবিষ্যৎ, সামনে এক বিরাট পথ তাদের পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু সময়ের মূল্য না জানার কারণে তারা সময়ের অপচয় করে চলেছে।

*সহিহ বুখারি*তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

বেশির ভাগ মানুষই দুটো নিয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন–একটি হলো অবসর সময়, অপরটি সুস্থতা।[১৫৭]

কারও হয়তো সুস্বাস্থ্য আছে, কিন্তু সে না একে দ্বীনের জন্য কাজে লাগাচ্ছে আর না দুনিয়ার কোনো বৈধ কাজে ব্যবহার করেছে। সময়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। সময় হলো ঘূর্ণায়মান চাকার মতো, যে অংশ পার হয়ে যায় তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ সময়ের মূল্য উপলব্ধি করে শেষ বয়সে পৌঁছানোর পর। তারা এমন একটা সময়ে এসে উপলব্ধি করে যখন সময়কে কাজে লাগানোর সেই সুস্বাস্থ্য তাঁদের থাকে না। অন্যদিকে হারানো সময়কেও তখন আর ফিরে পাওয়া যায় না। অতীত কেবলই অতীত। অপরদিকে তরুণদের রয়েছে অফুরন্ত সময়, আল-আসর। তাদের আছে সুস্বাস্থ্যের সম্পদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সেগুলোর অবহেলা ও অপচয় করছে। আপনি এমন বৃদ্ধদের পাবেন যারা শেষ সময়ে এসে সময়ের মূল্য উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু এখন তারা ওয়াকার বা হুইল চেয়ারে আবদ্ধ, তাঁদের সময় কেটে যায় হাসপাতাল আর ডাক্তারের কাছে আসা-যাওয়া করে। বার্ধক্যে পৌঁছুলে মানুষের মাঝে প্রজ্ঞা আসতে শুরু করে, অতীতের সময়ের জন্য সে আফসোস করে। যদি সময়টা হারামের পেছনে ব্যয় না হয়ে নিছক মুবাহ কাজেও ব্যয় হয়, তবুও একজন সত্যিকারের প্রজ্ঞাবান বৃদ্ধ এই সময়ের জন্য আফসোস করবেন-ই।

মনোযোগী হোন, এ থেকে শিক্ষা নিন, সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। যারা এখনো তারুণ্যে আছেন এ সময়কে কাজে লাগান। কারণ, আপনাদের এখনো সুযোগ আছে। জীবনের

১৫৭ *সহিহুল বুখারি* : ৬৪১২; *সুনানুত তিরমিযি* : ২৩০৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৩৬

www.banglakitab.weebly.com

গুরুত্বপূর্ণ সময়টি আপনারা পার করছেন। আপনারা আছেন তারুণ্য এবং শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার তুঙ্গে। ইবাদত ও দাওয়াহর ক্ষেত্রে এ সময় ও সক্ষমতার সদ্ব্যবহার করুন। জীবনের একটি মুহূর্তও অপচয় হতে দেবেন না।

এই ব্যাপারে প্রখ্যাত একটি প্রবাদ আছে যা গুরুজনেরা আগে তাঁদের শিষ্যদের বলতেন– যৌবনে মুখস্থ করা হচ্ছে পাথরে ওপর খোদাই করার মতো, আর বার্ধক্যে মুখস্থ করা হলো পানিতে লেখার মতো। আমার বাবা অবশ্য এ কথার সাথে দ্বিমত করেন। আল্লাহ ﷻ তাঁকে বারাকাহ্ দিন, আমলপূর্ণ দীর্ঘ হায়াত নসিব করুন, তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে দাখিল করুন। এখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর বছর হওয়া সত্ত্বেও বাবা বলেন, এখন তাঁর স্মৃতিশক্তি তাঁর তারুণ্যের চেয়েও ভালো কাজ করে।

হাসান আল-বাসরি ؒ বলেছেন, আমি এমন লোকদের দেখেছি যারা টাকার চেয়ে সময়ের ব্যাপারে বেশি কৃপণতা করতেন। টাকা চাইলে তাদের উদার পাবে, কিন্তু সময় চাইলে তারা তোমাকে দিতে চাইবে না। রাবি ইবনু সুলাইমান ؒ বলতেন, আশ-শাফে'ঈ ؒ রাতকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগে লেখালেখি করতেন, আরেক ভাগে সালাত আদায় করতেন এবং আরেক ভাগে তিনি ঘুমাতেন। এক মুহূর্তও অপচয় করতেন না। এক ব্যক্তি আমির ؒ-এর কাছে এল। তিনি দেখলেন, লোকটি অনর্থক কথা বলছে। সে বলল, আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। আমির ؒ বললেন, যদি সূর্যকে থামাতে পারো তবেই আমরা বসে আলাপ করতে পারি। অর্থাৎ, সময়কে থামাতে পারলে বসে কথা বলা যেতে পারে। অন্যথায় আমার সময়ের দাম আছে, আমি এর উপযুক্ত ব্যবহার করব। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ؒ তাঁর উস্তাদ সুলাইমান আত-তাইমি ؒ সম্পর্কে বলেছেন, যখনই উস্তাদকে দেখতাম তখনই তিনি ওযু অবস্থায় থাকতেন, হয় জানাজা পড়াতেন অথবা মাসজিদে পাঠরত বা পাঠদানে ব্যস্ত থাকতেন। মুহাদ্দিস সুলাইমান আত-তাইমি ؒ রাসূল ﷺ-এর হিজরতের ছেচল্লিশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ؒ বলেন, একসময় তাঁর অবস্থা দেখে আমার মনে হলো তিনি যে পাপ করবেন, এই চিন্তা করারও সময় পেতেন না।

আয-যাহাবি ؒ খাতীব আল-বাগদাদি ؒ-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও তাঁর হাতে বই থাকত, আর এই পুরোটা সময় পড়তেন। অপচয় করার মতো কোনো সময় তাঁর ছিল না। আবু ওয়াফা আলি ইবনু আক্বিল ؒ বলতেন, জীবনের এক মুহূর্ত সময় অপচয় করাও আমার জন্য জায়েজ না। যদি আমি চোখকে কাজে না লাগাই তবে মুখ সচল রাখি; যখন মুখ সচল থাকে না তখন আমার অন্তরকে কাজে লাগাই, কী পড়লাম আর ছাত্রদের কী শিখালাম এই নিয়ে গভীর চিন্তা করি।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শপথ :

আল্লাহ ﷻ তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে শপথ করেছেন। শপথ করেছেন মানুষ, প্রাণী ও

www.banglakitab.weebly.com

জড়বস্তুর। তিনি আদ-দুহার শপথ করেছেন, শপথ করেছেন আল-লাইলের, আল-ফাজরের। কিন্তু মানবজাতির মধ্যে কেবল একজনকে নিয়ে তিনি শপথ করেছেন–নবি মুহাম্মাদ ﷺ।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

আপনার প্রাণের শপথ, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। (সূরা আল-হিজর, ৭২)

কোনো বিষয়ের পেছনের হিকমাহ সম্পর্কে যদি আমাদের জ্ঞান না থাকে অথবা কুরআন ও সহিহ হাদিসের কোনো ব্যাপার যদি আমরা বুঝতে না পারি, তবুও সে বিষয়ে কোনো ধরনের আপত্তি করা যাবে না। কক্ষনো না; আপত্তি করলেই আপনি ইবলিসের কাতারে চলে যাবেন। সে আপত্তি করেছিল, আর এই কারণে আজ তার এই অবস্থা।

قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.....

কিন্তু সে বলল, আমি কি এমন কাউকে সিজদাহ করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (সূরা আল-ইসরা, ৬১)

তার মনে এটা এল না যে, আল্লাহ ﷻ তাকে আদেশ করছেন; বরং সে বলল, আপনি কি আমাকে কাদামাটি থেকে সৃষ্ট মানুষকে সিজদাহ করতে বলছেন? শয়তানের অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয়েছিল আল্লাহ ﷻ-এর আদেশের ওপর আপত্তি তোলা দিয়ে। কাজেই কোনো কিছু যদি কুরআন ও সহিহ হাদিসে থাকে তবে আপনাকে বিনা দ্বিধায় তা মেনে নিতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সূরা আন-নিসা, ৬৫)

নুসুসের ওপর আপত্তি করা যাবে না। নুসুসের ব্যাপারে আপত্তি তোলা ব্যক্তির ব্যাপারে যদি হুসন আদ-দান বা ভালো ধারণা রাখতে চান, যদি তাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিতে চান, তাহলে তার মধ্যে বড় শয়তান ইবলিসের বৈশিষ্ট্য আছে বলার পরিবর্তে সর্বোচ্চ এটুকু বলা যেতে পারে যে–তার মধ্যে শয়তানের বৈশিষ্ট্য আছে। এই ব্যাপারে আমাদের সব কথাই আসলে এই আয়াতের শিক্ষার মাঝে পড়ে :

www.banglakitab.weebly.com

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তারাই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আল-আম্বিয়া, ২৩)

আপনি কখনো আল্লাহ ﷻ-কে প্রশ্ন করতে পারেন না। আপনিই আল্লাহ ﷻ-এর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন। যাকে প্রশ্ন করা হবে সে কখনো প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন করতে পারে না। আল্লাহ ﷻ-এর হুকুম নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার কারও নেই। আপনি অনেককে বলতে শুনবেন যে, আল্লাহ কেন শপথ করলেন? যদি সে ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে ঈমানদারেরা তো কোনো প্রশ্ন ছাড়া এর প্রতি ঈমান এনেছে। আর কাফিররা তো কখনোই বিশ্বাস করতে চাইবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ .....

যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা মেনে নেবে না। (সূরা আল-বাকারাহ, ১৪৫)

আপনি যদি তাদের আল্লাহ ﷻ-এর প্রত্যেকটি নির্দেশ এনেও দেখান, তারা মেনে নেবে না। যেমন : অনেকে বলে, 'সাদ ইবন মুয়ায ﷺ-এর মৃত্যুতে আল্লাহ ﷻ-এর আরশ কেঁপে ওঠেছিল, আমি এটা বিশ্বাস করি না; আমি জানি এই হাদিস সহিহ, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।' এ রকম মনোভাব রাখা যাবে না।

কেন কুরআন ও সুন্নাহয় শপথের কথা এসেছে :

আল্লাহ ﷻ-এর শপথের বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যের মূলনীতির আলোকে আলিমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেন কুরআন ও হাদিসে শপথের বিষয়টি এসেছে এ ব্যাপারে তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হলো :

১. বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তরজমা হয়েছে। এখন অনেকে ইংলিশে বা অন্য কোনো ভাষায় কুরআনের অনুবাদ পড়ে থাকেন। আর এ কারণে অনেকে ভুলে যান যে কুরআনের ভাষা আরবি, আরবিতেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। আরবিতে কোনো কিছু সুনিশ্চিত করতে শপথ করা হয়। যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সেই জ্ঞাত বিষয়ের প্রতি জোর দেয়ার জন্য আরবি ভাষায় শপথ করা হয়। এটি আরবি ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য, আর আমাদের মাথায় রাখতে হবে আরবি ভাষা সমৃদ্ধির শীর্ষে থাকার সময় কুরআন নাযিল হয়েছিল। কুরআনে শপথ আসার এটা হলো একটা কারণ।

২. যখন কোনো বিষয়ে শপথ করা হয়, একজন মুমিনের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। একজন মুমিনের

www.banglakitab.weebly.com

ঈমান দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উদাহরণ ও প্রমাণ ব্যবহার করায় কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়টি অস্বীকারের কোনো কারণ নেই। যেমন : ইবরাহিম ﷺ বলেছিলেন,

رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ .....

হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এ জন্য চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। (সূরা বাকারাহ, ২৬০)

আল্লাহ ﷻ-এর খলিল বলছেন, আমি ঈমান রাখি, তবুও আমার ঈমানকে মজবুত করতে চাচ্ছি। সুতরাং, শপথ মুমিনদের বিশ্বাসকে আরও মজবুত করে।

৩. কোনো বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ বা মনোযোগ আকর্ষণের জন্যও শপথ করা হয়। যে বিষয়ে এবং যার দ্বারা শপথ করা হয় তার গুরুত্বের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। *মাজমু আল ফাতাওয়ার* প্রথম খণ্ডে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ তাঁর কিছু সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন; সেগুলোকে সম্মানিত করতে, গুরুত্ব দিতে, মনোযোগ আকর্ষণ ও প্রশংসা করতে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

কালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল-আসর, ১-২)

এখানে إِنَّ হচ্ছে তাওকিদ; যার অর্থ জোর দেয়া, প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চিতকরণ। আবার এখানে لَفِي-এর লামের মাধ্যমেও তাওকিদ বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ জোর দেয়া, নিশ্চিত করা হচ্ছে। সুতরাং إِنَّ এর মাধ্যমে ও لَ এর মাধ্যমে দ্বিতীয় আয়াতে দুইবার প্রথম আয়াতের শপথের নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোনো বিষয়ের সম্মান ও সত্যায়নের জন্যও শপথ করা হয়। যেমন কুরআনে এসেছে :

وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? বলে দাও, অবশ্যই আমার রবের কসম, এটা সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত করে দিতে পারবে না। (সূরা ইউনুস, ৫৩)

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ.....

কাফেররা বলে আমাদের ওপর কেয়ামত আসবে না। বলুন কেন আসবে না? আমার

www.banglakitab.weebly.com

পালনকর্তার শপথ, অবশ্যই আসবে। (সূরা আস-সাবা, ৩)

তিনি আরও বলেন :

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদের অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা আত-তাগাবুন, ৭)

এই তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শপথ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই শপথগুলো করা হয়েছে পুনরুত্থান নিয়ে, পুনরুত্থানকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ও এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। হাদিসে অন্যান্য আরও শপথের উদাহরণ এসেছে। যেমন :

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ

وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ

অনেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এভাবে শপথ করার বিষয়টি এসেছে। মনে রাখুন, তিনি সেই রাসূল যিনি সৎ ও বিশ্বস্ত এবং তার ওপর তিনি শপথ করছেন। তিনি শপথ করছেন কারণ তিনি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে শপথ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। শপথ এই জন্য যেন আমরা সাবধান হই, যেন শপথগুলো আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, শপথ করে যে বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করতে পারি।

মানুষের শপথ :

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির যেকোনো কিছু নিয়ে শপথ করতে পারেন; কিন্তু আমরা শপথ করব কেবল আল্লাহ ﷻ-এর নামে। *মুসনাদু আহমাদের* এক সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে শিরক করল।[১৫৮]

---

১৫৮ *মুসনাদু আহমাদ* : ৩২৯

www.banglakitab.weebly.com

তিরমিযি ও *হাকিমে* বর্ণিত আরেকটি সহিহ হাদিসে এসেছে,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْأَشْرَكَ

যে কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে কুফর বা শিরক করল।[১৫৯]

কেউ যদি আল-আসর, নিজ মা-বাবা, মা-বাবার জীবন বা তাঁদের কবরের নামে শপথ করে, তবে কি সে কাফির হয়ে যাবে? কেবল বলার মাধ্যমে কি সে কাফির হয়ে যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরের দুটো অংশ আছে :

এক. যার নামে শপথ করা হয়েছে তাকে যদি কেউ আল্লাহ ﷻ-এর সমপর্যায় বা তাঁর চেয়েও বেশি মনে করে, অথবা মনে করে যার নামে শপথ করা হচ্ছে তার আল্লাহ ﷻ-এর মতো কোনো ক্ষমতা আছে বা সে আল্লাহ ﷻ-এর মতো পবিত্র–তবে সে নিজের ইসলামকে নাকচ করে দিয়েছে।

দুই. যদি সে ভুলবশত বলে ফেলে অথবা আল্লাহ ﷻ-এর সাথে কোনোভাবে সমকক্ষ না করে এমনি এমনি বলে, তাহলে এটি ছোট শিরক হবে, গুনাহ হবে।

কেউ নিজ মা-বাবাকে সম্মান করে তাঁদের নামে শপথ করেছে, কিন্তু সে তাদের আল্লাহ ﷻ-এর সমপর্যায়ের, কিংবা আল্লাহ ﷻ-এর চেয়ে বেশি মর্যাদার মনে করে না। এ ক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে আর এটা ছোট শিরক। তার এই কাজের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে তাওবাহ করে ক্ষমা চাইতে হবে। কোনো কোনো আলিমের মতে, যদিও সে এই কাজের কারণে ঈমানহারা হয়নি, বরং ছোট শিরক করেছে, তবুও তাকে পুনরায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে হবে।

আল্লাহ ﷻ-এর নামে শপথ করায় কোনো সমস্যা নেই। সুন্নাহর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় আশিবারের মতো শপথ করেছিলেন। কখনো কখনো আল্লাহ ﷻ নিজেই তাঁকে শপথ করতে বলেছেন। তবে অনেক আলিমের মতে, উত্তম হলো নিজ শপথকে সংরক্ষণ করা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রেই শুধু শপথ করা। গুরুত্বপূর্ণ না হলে তাঁরা শপথ করতে বারণ করেন। তাঁদের দলিল হলো এই আয়াত :

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ .....

তোমাদের কসমের হেফাযত করো। (সূরা আল-মায়িদা, ৮৯)

আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কারও নামে শপথ করা বৈধ, এমনটা প্রমাণের জন্য অনেক সহিহ মুসলিমের একটি হাদিস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেন যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল

১৫৯ *সুনানুত তিরমিযি* : ১৫৩৫; *মুস্তাদরাক হাকিম* : ৭৮১৪

www.banglakitab.weebly.com

ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করলে তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তখন সেই ব্যক্তিটি বলে, সে যা শিখেছে তার ওপর আমল করবে।

তখন রাসূল ﷺ বলেন,

أفلح وأبيهِ إنْ صدق

তার পিতার শপথ, সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে সে সফল হবে।[১৬০]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই ব্যক্তির বাবার শপথ করেছেন।

এই ব্যাপারে আলিমদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে :

একটি মত হলো এই বর্ণনা শায (شاذ) অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয় হলো, যেমন ইবনু আব্দিল বার ﷺ বলেছেন, হাদিসটি বর্ণনা করতে গিয়ে রাবি ভুল করেছেন। আসল বর্ণনাটি হবে এমন, أَفْلَحَ وَاللهِ –আল্লাহর শপথ, সে সফল হবে।

তৃতীয় মত হলো, এ ঘটনা শপথের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার আগে ঘটেছে।

ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন,

لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে সত্য শপথ করার চেয়ে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।[১৬১]

অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর নামে শপথ করে মিথ্যে বলাও, অন্য কারও বা কোনো কিছুর নামে শপথ করে সত্য বলার চেয়ে উত্তম।

---

১৬০ *সহিহ মুসলিম* : ১০৯-১১০
১৬১ তাবারানি, *মু'জামুল কাবির* : ৮৯০২

www.banglakitab.weebly.com

দারস ১৩

উসুল আস-সালাসাহর লেখক যে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের কথা বলেছেন সেগুলোর দলিল হলো সূরা আল-আসর। আগের দারসে সূরা আল-আসর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ইন শা আল্লাহ আজ আমরা সূরা আল-আসরের তাফসির শেষ করব।

সময়ের অপচয় করবেন না :

সময়ের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য আল্লাহ ﷻ আল-আসরের শপথ করেছেন। কাজেই সময়ের অপচয় করবেন না। মনে রাখবেন, আপনার সময়কে পণ্ড করার জন্য শয়তান বিভিন্ন ধরনের কৌশলের অবলম্বন করে। দেখবেন আপনার আখিরাত ও দুনিয়ার জন্য সফলতা বয়ে আনবে এমন ভালো কিছু করার সময় যখন আসে, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনাকে পেয়ে বসে উদাসীনতা ও অলসতা। অন্যদিকে শয়তান আপনার কাছে অনর্থক ও ফাহেশা কাজগুলোকে আনন্দদায়ক করে উপস্থাপন করে। এটা শয়তানের অন্যতম একটা ফাঁদ। শয়তানের এ ধরনের হীন চক্রান্ত ও কৌশলের ব্যাপারে সতর্ক হোন, এ থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে জানুন।

একটি উদাহরণ দিই। ধরুন কোনো পার্কিং লট বা এ রকম জায়গায় হঠাৎ কোনো বন্ধুর সাথে আপনার দেখা হয়ে গেল। মানুষ এ অবস্থায় কী করে? বন্ধুকে দেখে থামে, তার সাথে কথা বলতে শুরু করে। একসময় আবিষ্কার করে কথা বলতে বলতে পার হয়ে গেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অথচ তার কাছে হয়তো মনে হয়েছে যে মাত্র কয়েক মিনিট পার হয়েছে। এ সময়টুকু তারা গীবত অথবা অপ্রয়োজনীয় আলাপচারিতায় ব্যয় করে। আবার এও হতে পারে যে, তারা হয়তো এমন বিষয়ে কথা বলেছে যা মুবাহ। অর্থাৎ এ কথাবার্তার কারণে তাদের কোনো গুনাহ হয়নি। কিন্তু শয়তানের কাছে এটা মুখ্য না, তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনাকে আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্য থেকে দূরে রাখা। সে দেখবে কতক্ষণ আল্লাহ ﷻ-এর স্মরণ ও ইবাদত থেকে সে আপনাকে দূরে রাখতে পেরেছে। হিংসার কারণে যা থেকে সে নিজে বঞ্চিত হয়েছে, আপনাকেও সে তা করতে দেবে না।

www.banglakitab.weebly.com

এতক্ষণের আড্ডাবাজির পর ঘরে ফেরার পর দেখা যায় আপনি অন্যান্য দিনের মতো আজ পাঁচ মিনিটের জন্যও কিয়ামুল লাইলের জন্য দাঁড়াতে পারছেন না। আপনার বোর লাগছে। অথবা ইশা বা ফজরের সালাতে ইমাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো করে লম্বা তিলাওয়াত করতে শুরু করলে দেখবেন অনেকের পা দোলানো শুরু হয়ে যায়, তারা আনমনে নড়াচড়া শুরু করে, বারবার ঘড়ির দিকে তাকায়, কিংবা এদিক-সেদিক তাকাতে শুরু করে। এটা হলো তাদের বাহ্যিক অবস্থা, হয়তো তাদের মন আরও বেশি বিক্ষিপ্ত। অনেককে দেখবেন, তারা তাদের বন্ধুদের সাথে খুব হাসিখুশি ও ফুরফুরে মেজাজে আড্ডায় বসে, মনোযোগের সাথে তাদের কথাবার্তা শোনে, সময় দেয়। দেখলে মনে হবে তাদের জীবনে দুশ্চিন্তার কোনো বালাই-ই নেই। এদের জিজ্ঞেস করলে দেখবেন বলছে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেবার সময় তারা সব দুশ্চিন্তা ভুলে যায়। অথচ যখন সে সালাতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান এসে তার জীবনের যাবতীয় দুশ্চিন্তা, স্কুল, পরীক্ষা, চাকরি, সন্তান ইত্যাদি সবকিছুর কথা মনে করিয়ে দেয়। আর এভাবে যা তার আখিরাতের জন্য কল্যাণকর তা থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে দেয়। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমরা পাই যে মুমিনের চোখের প্রশান্তি হলো সালাত ও যিকির। অথচ আজ সালাত ও যিকির ছাড়া অন্য সবকিছু আমাদের চোখে তৃপ্তিদায়ক হয়ে গেছে।

তাই আল্লাহ ﷻ আল-আসরের শপথ করে সময়ের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। আপনার জীবন সময়ের সমষ্টি। প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছরের সমন্বয় হলো আপনার জীবন। আজকের এই দিনটি অতিবাহিত করা মানে আপনার জীবন থেকে একটি অংশ চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। প্রতিটি অতিক্রান্ত দিনের সাথে সাথে আপনি নিজের একটি অংশকে কবর দিচ্ছেন। মাগরিবের সালাত আদায়ের সাথে সাথে আপনার একটি দিন শেষ হয়ে গেছে। শুরু হতে যাচ্ছে পরবর্তী দিনটি। ঠিক তখনই আপনি নিজের একটি অংশকে কবর দিচ্ছেন। এভাবেই আপনার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এক একটি অংশ। জীবন ও সময় সম্পর্কে এভাবেই চিন্তা করতে হবে। জীবন একটি দালানের মতো। আপনার বয়স বিশ বছর হওয়া মানে আপনার দালানের বিশটি তলা হয়ে গেছে। ধরুন, কারও দালান অর্থাৎ মোট আয়ু হলো পঁচাত্তর তলা। প্রতিদিন একটি করে দিন বিদায় নিচ্ছে আর এই দালানের একটি করে ইট খুলে নিয়ে জমা করা হচ্ছে আখিরাতে। তাই অনুধাবন করুন যে পেছনে ফেলে আসা প্রতিটি আমলহীন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকে নিয়ে একদিন আপনাকে ঠিকই আফসোস করতে হবে। যদি আপনি হারামের মাঝে সময় পার করেন, তাহলে এর ফলাফল কী সবাই জানে। কিন্তু যদি কোনো অর্থহীন মুবাহ কাজেও লিপ্ত হয়ে থাকেন, তবে সেটাও আপনার আফসোসের কারণ হবে। কেননা, এর ফলে আপনি জান্নাতের উঁচু স্তরে পৌঁছুতে পারবেন না। জীবন কতগুলো সময়ের সমষ্টি কেবল। আর এ সময় চলে যাচ্ছে। মনে রাখবেন, আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে এই সময়কে কাজে লাগানোর মাধ্যমে।

এ কারণে আল্লাহ ﷻ সময়ের নামে শপথ করেছেন। দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মিনিট আপনার মূলধন। একেকটি দিন অতিবাহিত হওয়া মানে আপনার জীবনের একেকটি দিন হারিয়ে

www.banglakitab.weebly.com

যাওয়া, নিজের একটি অংশকে দাফন করা।

শপথের মূল বিষয়বস্তু :

সূরা আল-আসরের এ শপথের মূল বিষয়বস্তু কী? কোন বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ ﷻ এ নিয়ে শপথ করার মাধ্যমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন?

আল্লাহ ﷻ বলছেন :

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল-আসর, ২)

এ শপথের প্রধান বিষয়বস্তু এই যে, আমরা প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত। আল-আসরের নামে শপথ করে আল্লাহ ﷻ আমাদের জানাচ্ছেন যে, মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত। এটা বোঝানোর জন্য শপথ করার জন্য কেন আল-আসরকে বাছাই করা হলো? আল্লাহ ﷻ কেন অন্য কোনো কিছুকে এ ক্ষেত্রে শপথের জন্য বেছে নিলেন না? আল-আসর, সময় হলো আপনার জীবনকাল। আমাদের দুনিয়ার জীবন হলো সময়ের নিদর্শন। এ সময়কে আপনি কীভাবে কাজে লাগাবেন তার ওপরই নির্ভর করছে আপনার জীবনের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা। সুতরাং শপথের এই বিষয়বস্তুর সাথে আল-আসরই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ও সবচেয়ে বেশি খাপ খায়, আর নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ সর্বোত্তম মনোনয়নকারী।

তারপর আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

এখানে ইনসানা (إنسان) বলতে মানবজাতিকে বোঝানো হচ্ছে। আপনি যেহেতু মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত, তাই কথাটা আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ ব্যাপারে অবশ্য ইখতিলাফ আছে। কেউ বলেন ইনসানা বলতে এখানে শুধু কাফিরদের বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন এ দ্বারা সমগ্র মানবজাতিই উদ্দেশ্য। আর যদি কোনো আয়াতকে নির্দিষ্ট করার কোনো দলিল পাওয়ার না যায়, সে ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতের ব্যাপক অর্থ গ্রহণের নীতি অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ইনসান অর্থ সমগ্র মানবজাতি নেয়াই সম্ভবত অধিকতর সঠিক মত। শাইখ আশ-শানকিতি رحمه الله-এর মতও তাই।

মানবজাতি ক্ষতিতে নিমজ্জিত :

খুসর (خُسْر) শব্দটি নামবাচক অর্থ প্রকাশ করে।

www.banglakitab.weebly.com

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

এখানে লাফি (لَفِي) এর লাম দ্বারা তাওকিদ তথা জোর দেয়া ও নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে খুসর (خُسْرٍ) শব্দটি ক্রিয়া নয়, বরং অর্থকে আরও বেশি জোরালো ও স্থায়িত্ব দানের জন্য নামবাচক পদ হিসেবে এটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ﷻ খাসির (خاسر) বলেননি, অর্থাৎ 'সে হারাচ্ছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে' বলেননি। লাকাদ খাসির (لقد خسر), যার অর্থ 'সে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে' বলেননি; বরং আল্লাহ ﷻ বলেছেন লাফি খুসর। তিনি খুসর (خُسْرٍ) নামবাচক পদটি বেছে নিয়েছেন।

একটি উদাহরণ দিলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন কুরআনে শব্দ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কতখানি সূক্ষ্মতা অবলম্বন করা হয়েছে। ধরুন একজন কোটিপতির এক হাজার টাকা হারিয়ে গেছে, এখানে এই ব্যক্তি হলো 'খাসির' (خاسر)। কোটি কোটি টাকা থেকে এক হাজার টাকা হারালে কীই-বা আসে যায়? যেহেতু সে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তাই তাকে বলা হচ্ছে খাসির। কিন্তু যদি ওই ধনকুবের তার কোটি কোটি টাকা হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে ক্ষতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তার ব্যাপারে 'খুসর' শব্দ প্রয়োগ হবে। সে এখন আর 'খাসির' না, যেহেতু সে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খুসর মানে চূড়ান্ত ও সামগ্রিক ক্ষতি। এমন ক্ষতি যা তাকে অবরুদ্ধ, আচ্ছন্ন ও আপাদমস্তক পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

খুসর কেন নাকিরাহ (অনির্দিষ্ট) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে

এই আয়াতে কি 'লা ফি খুসর' (لفی خسر) বলা হয়েছে, নাকি 'লা ফিল খুসর' (لفی الخسر) বলা হয়েছে? এখানে লা ফি খুসর (لفی خسر) বলা হয়েছে। 'খুসর' হচ্ছে নাকিরাহ (نكرة —অনির্দিষ্ট), অন্যদিকে আল-খুসর (الخسر) হচ্ছে নির্দিষ্ট। আল-খুসর এর পরিবর্তে নাকিরাহ হিসেবে শুধু খুসর শব্দটি প্রয়োগের দুটো কারণ আছে। এর একটি হলো, এর মাধ্যমে ক্ষতির ব্যাপকতা তুলে ধরা। আরবরা সাধারণত কোনোকিছুর প্রাবল্য ও ব্যাপকতা প্রকাশের জন্য 'আল' বাদ দিয়ে নামবাচক পদ গ্রহণ করে। নাকিরাহ ব্যবহার করে। এ কারণে ক্ষতির বিশালতা বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ 'আলা' (على) এর বদলে 'ফি' (فی) ব্যবহার করেছেন

আরেকটি ব্যাকরণগত শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ ﷻ এখানে 'আলা' (على) এর বদলে 'ফি' (فی) ব্যবহার করেছেন। হিদায়াতের ব্যাপারে বলতে গিয়ে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

أُولَـٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ .....

www.banglakitab.weebly.com

তারা নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত। (সূরা আল-বাকারাহ, ৫)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ (فى) ব্যবহার করেননি। তাহলে আল-আসরে কেন আল্লাহ فى ব্যবহার করলেন? কারণ, এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে সে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্ষতি তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে আছে। যদি বলা হতো, সে ক্ষতির ওপর (على) আছে তবে এ থেকে মনে হতে পারে যে এটি মাত্রার দিক থেকে কিছুটা কম তীব্র। তাই আল্লাহ ﷻ (فى) প্রয়োগের মাধ্যমে এর গভীরতা ও তীব্রতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করছেন। অর্থাৎ এই ব্যক্তি ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে বা কাছাকাছি না, বরং সে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতি তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

এসব সূক্ষ্ম ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হলো, এ থেকে যেন আমরা ক্ষতির মাত্রা উপলব্ধি করতে পারি। এখানে একটি বা দুটি লেনদেন, এক বা দুবছর সময়, সেমিস্টার, কুইজ, কোনো পরীক্ষা ও ব্যবসায়িক লেনদেনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা বলা হচ্ছে না। বরং এ হলো এমন ক্ষতি, আপনি আপনার পুঁজি-মুনাফা সব হারিয়ে এখন ঋণগ্রস্ত ও বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এটা কোনো সাময়িক ক্ষতি না; বরং চিরস্থায়ী ও চূড়ান্ত ক্ষতি। যে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে তার জন্য ধ্বংস–আমরা এ থেকে আল্লাহ ﷻ-এর পানাহ চাই। আর যে ব্যক্তি জান্নাতে অবস্থান করবে কিন্তু জান্নাতের যে স্তরে তার পৌঁছুবার আশা ছিল তা পাবে না, সেও কিন্তু এক অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত।

এই সূরার সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তব জীবনের কিছু উদাহরণ

এই সূরার সাথে হুবহু মিলে যায় এমন কিছু বাস্তব উদাহরণ আমরা এখন দেখব। প্রথম উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির যে লাভবান হয়েছে, দ্বিতীয়জন কোনো লাভ করতে পারেনি এবং তৃতীয়জন তার পুঁজি ও লাভ দুটোই হারিয়ে এখন ঋণগ্রস্ত।

আপনি যখন আপনার কর্মস্থল কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি ফেরেন, দিনের এই শেষভাগটি হলো আল-আসর। যে সময়টাতে কেউ তার সারাদিনের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভাবতে শুরু করে। আপনি রাতে বাড়ি ফেরেন, পরিবার-পরিজনের সাথে দেখা করেন। হয়তো বাচ্চাদের কুরআন শেখান, হয়তো তাদের সাথে খেলা করেন কিংবা ফরয বা নফল সালাত আদায় করেন। কিংবা হয়তো আপনার স্ত্রীর সাথে মিলিত হন। এমনও হতে পারে যে এ সময়টাতে আপনি কুরআন-চর্চা করেন, অনলাইনে কোনো লেকচার কিংবা কুরআনের তিলাওয়াত শোনেন। হয়তো আপনি ভালো নিয়্যাতে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করেন অথবা খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়ার জন্য শোন। আপনার হয়তো নিয়্যাত থাকে যে, আমি কিছু সময় ঘুমিয়ে নেব যাতে লম্বা দিনের ক্লান্তি শেষে আমি আবারও শক্তি সঞ্চয় করে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতে পারি। তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য এ ঘুম আমার সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে একটি হাদিস এসেছে যেখানে বলা হয়েছে, দিনের হালকা ঘুম (قيلولة) রাত্রি জাগরণে সহায়ক। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সময়কে

www.banglakitab.weebly.com

কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে, সে সফলতা লাভ করে। এটা হলো ওই প্রথম ব্যক্তির উদাহরণ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো যার সারাটা দিন হয়তো বাজে কেটেছে। সে বাড়ি ফিরেছে হতাশাগ্রস্ত, চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে। এমন পরিস্থিতিতে আপনার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যায়, সারাদিন যা কিছু ঘটেছে বারবার আপনি সেগুলো মনে করতে থাকেন। এ পুরো সময়টা আপনার জন্য লস। ভালো কাজে ব্যয় না করে অলস কাটানো পুরো সময়টুকুই লোকসান। এর ফলে আপনার লস হচ্ছে, কারণ আপনি প্রফিট হারাচ্ছেন। । হ্যাঁ, আপনি হয়তো গুনাহয় লিপ্ত হচ্ছেন না। আমি বলছি না যে, সারাদিনের নানা ঘটনার কথা মনে করে সেগুলো নিয়ে বারবার চিন্তা-দুশ্চিন্তা করা গুনাহ। কিন্তু তবুও এর মাধ্যমে আপনার লস হচ্ছে। কারণ, আপনি আপনার সময়কে, আপনার পুঁজিকে কাজে লাগাচ্ছেন না। এই সূরা কী দিয়ে শুরু হয়েছিল? আল-আসর অর্থাৎ সময়। যেকোনো ভালো ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করুন, সে আপনাকে বলবে, যে টাকা আপনি বিনিয়োগ না করে অযথা ফেলে রাখবেন, তা হলো লোকসান। টাকা না খাটালে সেই টাকা থেকে প্রফিট পাওয়া যায় না। টাকা বিনিয়োগ না করার মানে এর অপচয়। একইভাবে যে সময়কে আপনি আখিরাতের কাজে বিনিয়োগ করেননি, তা অপচয় করারই নামান্তর। অন্যদিকে এই সময়কে আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হলো প্রফিট। এভাবে নেকি হাসিল করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। যদি আপনার নিয়্যাত সঠিক থাকে তবে যা-ই করেন না কেন, কমবেশি এতেই আপনি আজর (প্রতিদান) পাবেন। যদি সঠিক নিয়্যাতে রিযিকের সন্ধানে বের হন, তবে এর বিনিময়ে আপনি সাওয়াব পাবেন। ভালো নিয়্যাতে যদি রাতে কিংবা দুপুরে সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেন, তবে এতেও সাওয়াব। একইভাবে নিজ বাচ্চাদের সাথে খেলা করলেও আপনি সাওয়াব পাবেন।

তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থা হলো, যে কাজ থেকে ফিরে বাকিটা সময় বন্ধুদের সাথে আড্ডায় পার করে দেয়। আজকালকার আড্ডাগুলোতে সাধারণত কী হয়? গীবত, ফাহেশা, গল্পগুজব, হারাম কিছু দেখা, গান শোনা, বন্ধুদের সাথে বসে থাকা কিংবা এসব অসার বিষয় নিয়ে ইন্টারনেটে লেখালেখি করা, জীবিত ও মৃতদের ব্যাপারে নানা ধরনের কথাবার্তা বলা—এসবই কিন্তু হয়।

আপনারা কিছু অবাধ্য বান্দাদের দেখবেন যারা এটুকু জানে না যে পরদিন সকালে তারা মুসলিম হিসেবে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারবে কি না, কিন্তু তারা মুখের কথায় আল্লাহ ﷻ-এর এমন সব বান্দাদের সম্মানহানি ও অপদস্থ করে যাদের পরিণতি এখন আল্লাহ ﷻ-এর হাতে। তারা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে চলে গেছেন এবং আল্লাহ ﷻ তাদের উপযুক্ত প্রাপ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আবার কিছু লোক আছে তারা এমন সব ব্যক্তিদের আক্রমণ করে, অপবাদ দেয়, যারা হয়তো জান্নাতের নদীর তীরে সবুজ পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের সময় কাটছে জান্নাতের ফল খেয়ে এবং আল্লাহ ﷻ-এর আরশের কাছে ঝুলে থাকা তাঁদের বাসস্থানে। অথচ কিছু কুলাঙ্গার এসব মানুষের সমালোচনা করে বেড়ায়, যদিও এরা নিজেরাই জানে না,

www.banglakitab.weebly.com

পরদিন মুনাফিক নাকি মুমিন অবস্থায় তার ঘুম ভাঙবে।

দুজন ব্যক্তির মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্যও গীবতকেও আল্লাহ ﷻ হারাম করেছেন। মাত্র দুজন মানুষ মিলে যদি গীবত করে তবে সেটা কবীরা গুনাহ হয়ে যায়। আপনি দেখবেন, দুজন মানুষ কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে গীবত শেষে যখন নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা দেয়, তারা কী বলেছে না বলছে এ ব্যাপারে কোনো কিছু তাদের আর মনে থাকে না। কিন্তু তবুও এটা কবীরা গুনাহ। কেউ যদি ওই স্থানেই তৎক্ষণাৎ এটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবুও এটা কবীরা গুনাহ। তাহলে চিন্তা করুন, এ ধরনের কোনো গুনাহ যখন কয়েকজন মিলে দলবেঁধে করা হয় তবে সেটা কত গুরুতর আকার ধারণ করে। এবার একটু ভেবে দেখুন যখন এ ধরনের কথাগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে বলা হয়, যেখানে পুরো বিশ্ব সেটা দেখতে পায় তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? মনে রাখবেন, এই গীবত কিন্তু দুজন মানুষের আলাপচারিতার মতো কেবল ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সোশ্যাল মিডিয়াতে বলা এ কোথাগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম এবং হয়তো কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সবার চোখের সামনে থাকবে। ওয়াল্লাহি, কারও অন্তরে আখিরাতে বিশ্বাস ও কবরের আযাবের ভয় থাকলে সে অবশ্যই এ ধরনের মারাত্মক অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকার এসব কথার কারণে হয়তো কাউকে বছরের পর বছর কিংবা হতে পারে শিংগায় ফুঁ দেয়ার আগ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে কবরের আযাব ভোগ করতে হবে। তার কাছে এগুলো খুব সামান্য মনে হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ ﷻ-এর কাছে এগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। আমি বলছি শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহর অন্যতম হচ্ছে অন্যের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। কাজেই সময়ের ব্যাপারে সতর্ক হোন এবং এসবের পেছনে নিজের সময় অপচয় করা থেকে বিরত থাকুন। এ জন্যই এতকিছু বলা, কারণ আজকাল এ ব্যাপারগুলো অহরহ হচ্ছে।

মনে রাখবেন, আমাদের বোঝাপড়া হবে গাফুরুর রাহীম আল্লাহ ﷻ-এর কাছে। আপনি যখন আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও শাফায়াতের বিষয়ে জানবেন, আশায় উদ্বেলিত হবেন। কিন্তু কিছু গুনাহ আছে যেগুলো দুই ধারবিশিষ্ট তলোয়ারের মতো, যেমন অন্যের প্রতি যুলুম-বাড়াবাড়ি, হত্যা, গীবত, অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং অন্যের নামে কুৎসা রটানো। এসব করার মাত্র দুই সেকেন্ডের মাঝেই আপনি হাত তুলে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারেন। এটা আপনার ও গাফুরুর রাহীমের মধ্যকার বিষয়। কিন্তু এখানের আরেকটি বিষয় থেকে যায়। বান্দার হক। যেই দিন আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সামনে দাঁড়াবেন, তখন আল্লাহ ﷻ-এর বান্দারা আপনার কাছে নিজেদের হক দাবি করবে।

পুলসিরাত পার হবার মুহূর্তগুলো সবার জন্য একের পর এক প্রতিবন্ধকতা ও আতঙ্কের। আল্লাহ ﷻ বলেন :

زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

...কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। (সূরা আল-হাজ্জ, ১)

www.banglakitab.weebly.com

নিঃসন্দেহে বিচার দিবসের সেই প্রতীক্ষা ভয়ংকর, আল্লাহ ﷻ-এর সামনে জবাবদিহিতা ভয়ংকর, মিযান ভয়ংকর, আমলনামা হাতে পাওয়া ও পুলসিরাত পার হওয়া—এসবই ভয়ংকর। ধরুন এই সবকিছুর শেষে এখন আপনি পুলসিরাতের ওপর। আপনি পুলসিরাত অতিক্রম করছেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে অনেকে পার হয়ে জান্নাতের আঙিনায়ও পৌঁছে গেছে।

সহিহ আল বুখারিতে আবু সাইদ আল-খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ ، حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ

> মুমিনরা যখন জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এক পুলের ওপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা যুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।[১৬২]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর (পুলসিরাত পার হবার পর) মুমিনদের আল-কানতারাহ (القنطرة) নামক একটি পুলের ওপর দাঁড় করানো হবে। এর উদ্দেশ্য কী? দুনিয়াতে যারা একে অপরের প্রতি যুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ এখানে গ্রহণ করা হবে যেন তারা পরিশুদ্ধ হয়। এভাবে তারা যখন পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। হতে পারে, কানতারাহ পুলসিরাতের শেষ অংশ। তবে যা পড়েছি তার ভিত্তিতে আমার মতে, কানতারাহ হলো পুলসিরাত পার হবার পর জান্নাতের প্রবেশমুখে অবস্থিত আরেকটি ছোট সেতু। জান্নাতে ঢোকার আগে কানতারাহতে গিয়ে এই উম্মাহর মুমিনদের নিজেদের মধ্যেকার দেনা-পাওনা আগে মিটমাট করে নিতে হবে। আর তারপরই কেবল তারা জান্নাতে পা রাখতে পারবে।

নিজেকে এই অবস্থায় কল্পনা করুন। কেউ যদি আখিরাত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, অনুধাবন করে, আর নিজেকে সেই অবস্থানে কল্পনা করে, তবে তার পক্ষে কোনো অবস্থাতে আর এ ধরনের গুনাহ করা সম্ভব হবে না। সেই উত্তেজনাকর মুহূর্তটি কল্পনা করুন—আপনি একের পর এক ধাপগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছেন। এইমাত্র কালালিব (كلاليب) পার হয়ে এসেছেন, যেগুলো পুলসিরাত থেকে পাপীদের জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। আপনি পুলসিরাতের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন, জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি জান্নাতের আঙিনায় পা রাখতে যাচ্ছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যারা আপনার সামনে ছিল তাঁরা উল্লসিত হয়ে সরাসরি জান্নাতের উঠোনের দিকে এগিয়ে

১৬২ *সহিহুল বুখারি* : ২৪৪০

www.banglakitab.weebly.com

যাচ্ছে, কিন্তু আপনি যেতে পারছেন না। আপনাকে এখন যেতে হবে 'আল-কানতারাহ'য়। দুনিয়াতে যেসব মুসলিমের সাথে আপনার বিরোধ ছিল, দেনা-পাওনা ছিল তা মীমাংসার জন্য। আর এখানে বোঝাপড়ার পর বিশুদ্ধ হয়েই কেবল আপনি জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবেন।

ভাবুন তো, দুনিয়ার কেউ কি জান্নাতের আঙিনায় কয়েক মিলি সেকেন্ড দেরি করে ঢোকার কারণ হবার উপযুক্ত? দুনিয়ার কারও জন্য কি আপনি জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য অতিরিক্ত কয়েক মিলি সেকেন্ড অপেক্ষা করতে রাজি হবেন? ওয়াল্লাহি, একবার ভাবুন, এই মুহূর্তে আপনি কানতারাহর ওপর আছেন। আপনি জান্নাত দেখতে পাচ্ছেন, জান্নাত এখন আপনার দৃষ্টিসীমার ভেতরে। কিন্তু অন্য একজনের গুনাহর ভার এখন আপনাকে বহন করতে হবে, কারণ আপনি হয়তো তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন, আর তাই তার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, নিন্দা করেছিলেন, অপবাদ দিয়েছিলেন। চিন্তা করতে পারছেন এ সময় আপনি কী এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হবেন?

এ অবস্থার পর আল্লাহ ﷻ আপনার সব কষ্ট দূর করে দেবেন।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ.....

তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা দূর করে দেবো...। (সূরা আল-আরাফ, ৪৩)

কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে এর কষ্ট ভোগ করতে হবে। আপনি কি কানতারাহতে আটকে যাবার সেই তীব্র যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারছেন? কল্পনা করুন, আপনি দেখছেন জান্নাতে আপনার অবস্থান এক এক করে নিচে নামছে, ক্রমশ ফিরদাউস আপনার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে! আপনি কি জান্নাতের সামনে দাঁড়িয়ে এমন ব্যক্তির অন্তর্বেদনার তীব্রতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারছেন? কেউ হয়তো ততক্ষণে ইব্রাহীম ﷺ-এর পাশে ভিড় জমিয়েছে তাঁকে কাছ থেকে দেখার জন্য, কেউ হয়তো যাচ্ছে নূহ ﷺ এর সাথে দেখা করতে, কেউ জড়ো হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আর মা আ'ইশা ؓ-এর পাশে, কেউ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ؓ আর আবু উবাইদা ؓ এর সাথে দেখা করছে; তারা সবাই হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দিত। এই সবকিছু জান্নাতের আঙিনায়, আর সেই মুহূর্তে আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন জান্নাতে আপনার স্থান একের পর এক কমে যাচ্ছে। কেন? কারণ, আপনি হয়তো দুনিয়াতে কোনো মুমিনের নামে কিছু বলেছিলেন কিংবা কোনো মুমিনের হক নষ্ট করেছিলেন। আপনি যাকে এত ঘৃণা করেন, সে কি আপনার এই মূল্যবান সম্পদ (জান্নাতে আপনার স্তর) হারানোর কারণ হবার যোগ্য?

যদি আপনাকে গীবত করতেই হয়, তাহলে আপনার বাবা-মায়ের গীবত করুন! কিংবা আপনার শাইখ বা এমন কাউকে নিয়ে যাকে আপনি ভালোবাসেন; কারণ, বান্দার হকের কারণে কানতারাতে আটকে গেলে নিদেনপক্ষে আপনি যা হারাবেন সেটা আপনার প্রিয়জনদের

www.banglakitab.weebly.com

সূচীপত্র

কাছে যাবে। জান্নাতে আপনার অবস্থান কমবে আর তাদের মর্যাদা ও অবস্থানের স্তর বৃদ্ধি পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন অন্যের হক বিনষ্টকারীকে দেউলিয়া বলেছেন? ফাইন্যান্সের জ্ঞান আছে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করুন। যার সম্পদই নেই, যে সম্পদশূন্য তাকে কি দেউলিয়া বলা হয়? না, এমন ব্যক্তিকে দেউলিয়া বলা হয় না। যার কখনো কিছু ছিল না, এমন ব্যক্তিকে দেউলিয়া বলা যাবে না। বরং দেউলিয়া হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে আগে অঢেল সম্পদের মালিক ছিল কিন্তু এখন সে নিঃস্ব।[১৬৩] হতে পারে যে অন্যের নামে কুৎসা রটনা, গীবত, অধিকার-হরণ ও সম্মানহানি করার মতো কর্মকাণ্ডে যারা লিপ্ত, তাদের নেক আমলের পাল্লা অনেক ভারী। হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনেক মানুষ 'বিপুল পরিমাণ নেক আমল' নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু তারা সব হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাবে। আপনি দুনিয়াতে কাউকে আঘাত করেছিলেন, আপনার কিছু পুরস্কার সে নিয়ে যাবে। কারও নামে গীবত করেছিলেন, এই সুবাদে সে কিছু পুরস্কার পেয়ে যাবে। নিজের ভাইয়ের সম্মানের প্রশ্নে কিছু মানুষের মুখ এতই লাগামছাড়া যা দেখলে আপনি আসলেই বিস্মিত হবেন। এর কারণ হলো, তারা এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেনি। আখিরাতের উপলব্ধি তাদের অন্তরের গভীরে ঠাঁই নেয়নি।

কাজেই আমরা তিনটি পরিস্থিতি দেখালাম। প্রথম ব্যক্তি তার সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ সময় থেকে ফায়দা হাসিল না করতে পারার কারণে কোনো গুনাহ না করা সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, যে সময় আখিরাতের কল্যাণে ব্যয় হয় না, তা বৃথা। আর তৃতীয় উদাহরণ ছিল ওও ব্যক্তির, যে তার সময় থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করেনি; বরং গুনাহ করেছে। ফলে সে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে তার সময়কে ভালো কিংবা মুবাহ কাজে অতিবাহিত করেনি; বরং সে কেবল গুনাহই কামিয়েছে।

মানুষ পূর্ণমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত (লা ফি খুসর) তখন হয়, যখন সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিজের আমলের কারণে। এসব কাজে কেউ তাকে বাধ্য করেনি, কেউ তার মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে এসব করতে বলেনি। স্বেচ্ছায় সে এই কাজগুলো করেছিল, এ সবই তার নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

---

১৬৩ হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ». قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সাহাবিদের বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা কি জানো, মুফলিস (নিঃস্ব) কে?' তারা বললেন, 'আমাদের মধ্যে যার টাকা-কড়ি ও ধন-সম্পদ নেই, সে-ই তো নিঃস্ব।' তখন তিনি বললেন, 'আমার উম্মাহর মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে হাযির হবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ ভোগ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে কিংবা কাউকে মেরেছে। এরপর এসব লোকদের (জরিমানাস্বরূপ) তার নেক আমল থেকে সাওয়াব দেওয়া হবে। দিতে দিতে তার নেক আমল থেকে তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার ওপর চাপানো হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (সহিহ মুসলিম : ৬৭৪৪)

www.banglakitab.weebly.com

কামাই এবং কিয়ামত দিবসে এগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অতএব 'আল-খুসর' এর পরিবর্তে নাকিরাহ হিসেবে 'খুসর' শব্দ ব্যবহারের প্রথম কারণ হলো, ক্ষতির মাত্রা ও এর ব্যাপকতার ব্যাপারে জানানো।

ক্ষতির বিভিন্ন মাত্রা

আল-খুসরের বদলে নাকিরাহ হিসেবে 'খুসর' ব্যবহারের দ্বিতীয় কারণ হলো, তানওয়ি (تنويع) অর্থাৎ ক্ষতির বিভিন্ন মাত্রা আছে এটা বোঝানো। কুরআনে এর স্বপক্ষে অসংখ্য আয়াত পাওয়া যায়। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

বলুন (হে মুহাম্মাদ), কিয়ামতের দিন তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা আয-যুমার, ১৫)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

বলুন (হে মুহাম্মাদ), আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? (সূরা আল-কাহফ, ১০৩)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

তাদের জন্যই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আন-নামল, ৫)

সুতরাং কুরআনে ক্ষতিগ্রস্তদের একাধিক মাত্রার কথা বলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের 'খাসির' বলা হয়েছে আবার 'আখসার' বলা হয়েছে। সব ক্ষতিগ্রস্তকে এক কাতারে শামিল করা হয়নি। সূরা আল-আসরে পূর্ণমাত্রার ক্ষতিগ্রস্ত (খুসর) হবার কথা বলা হচ্ছে, যখন ব্যক্তি ক্ষতি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এটি হচ্ছে নাকিরাহ হিসেবে খুসর ব্যবহারের দ্বিতীয় কারণ।

কেন সূরাতে প্রথমে সর্বজনীন ঘোষণার পর নির্দিষ্ট করা হয়েছে?

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'কিন্তু তারা নয়, যারা (তাওহিদে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পরস্পরকে হক

www.banglakitab.weebly.com

ও সবরের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে।'

লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ এই আয়াতের মাধ্যমে কীভাবে প্রথমে সর্বজনীন ঘোষণা করেছেন যে, 'প্রত্যেকেই ক্ষতির মধ্যে আছে' এবং তারপর তিনি এর ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন। ইল্লা (إِلَّا) হচ্ছে ব্যতিক্রম। আয়াতটি কেন এভাবে নাযিল হলো? কেন শুরুতে সবাইকে সফল হিসেবে চিহ্নিত করে এরপর ব্যতিক্রম হিসেবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের কথা বলা হলো না? যেমন : 'সবাই ক্ষতির মাঝে আছে কিন্তু তারা ব্যতীত', না বলে কেন 'সবাই সফল হয়েছে কিন্তু তারা ব্যতীত' বলা হলো না? কারণ, এই আয়াতটি মূলত ওই একই শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করছে যে অধিকাংশরা সাধারণত নিন্দিত। অধিকাংশ মানুষ সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবার কারণে কথাটি এভাবে বলা হয়েছে। এর আগে আমরা কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছিলাম যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এবং খুব সামান্যসংখ্যক মানুষই হকের ওপর থাকে। আর কুরআনে এই অল্পসংখ্যক মানুষই প্রশংসিত।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

আর আপনি যযদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা তো অলীক কল্পনার অনুসরণ করে, আর সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর কথাবার্তা বলে থাকে। (সূরা আল-আনআম, ১১৬)

তিনি আরও বলেন :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

আপনি যতই ইচ্ছা করেন না কেন, অধিকাংশ লোক মুমিন নয়। (সূরা ইউসুফ, ১০৩)

এটাই বাস্তবতা। কুরআন–আল-খালিক আল্লাহ ﷻ-এর কালাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ যা বলেছেন তা-ই সত্য। এই বিশ্বে সর্বমোট সাত শ কোটি লোক আছে। এদের মধ্যে মুসলিম আছে প্রায় এক শ ষাট কোটির মতো। আবার এদের মাঝ থেকেও ছাঁটাই করতে হবে। যারা কখনো সালাত আদায় করে না, যারা বড় ধরনের আকিদাহগত ভ্রান্তিতে আছে, যেমন শিরকে লিপ্ত, এদের বাদ দিতে হবে। শিয়াদের বাদ দিতে হবে। এভাবে করতে করতে দেখুন কতজন বাকি থাকে।

যদি অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধার্ত এবং অল্পসংখ্যক লোক ব্যতিক্রম হয়, তাহলে আরবি ভাষাশৈলী অনুযায়ী বলা হয়–সবাই ক্ষুধার্ত, তারা ব্যতীত (আন-নাসু জাউ ইল্লা—الناس جاعوا إلا)। যদি মাত্র তিন-চারজন ছাড়া বাকি সবাই আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ কবুল করে, তাহলে আপনি

www.banglakitab.weebly.com

বলবেন, আন-নাসু আতাউ ইল্লা (الناس أتوا إلا)। লোকেরা আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছে, তারা ব্যতীত (অর্থাৎ অধিকাংশই এসেছে)। আর যদি অধিকাংশ ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে কথাটা উল্টে যাবে। তখন আপনি বলবেন, লাম ইয়াতি ইল্লা (لم يأتي إلا) অর্থাৎ, কেউ আমার বিয়েতে আসেনি, তারা ব্যতীত।

এটাই আরবি ব্যাকরণের সঠিক নিয়ম। আগে আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলবেন আর তারপর ব্যতিক্রম উল্লেখ করবেন।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.....

এখানে 'ইল্লা' দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠরা ক্ষতিগ্রস্ত। এর আগে যেসব আয়াত উল্লেখ করেছি সেগুলোর বক্তব্যের সাথে এ কথা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ ﷻ মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ উল্লেখ করেননি

লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি এর কারণ জানাননি। ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ হিসেবে তিনি মদ, প্রতারণা, যিনা ইত্যাদি অগণিত সমস্যা চিহ্নিত করেননি। বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যাও দেননি। তিনি বলতে পারতেন,

والْعصْرِ، إِنَّ الْانسان لفِي خُسْرٍ، الَّذِين أشْركُوا وزنوُا وقتلُوا ونهبُوا

> মহাকালের শপথ, নিশ্চয় যারা শিরক করেছে, ব্যভিচার করেছে, হত্যা করেছে অথবা ডাকাতি করেছে–তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ ﷻ ক্ষতিগ্রস্তদের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারতেন। তা না করে তিনি আমাদের মুক্তিপ্রাপ্ত ও বিজয়ীদের বৈশিষ্ট্যগুলো জানিয়ে দিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা ক্ষতির স্বরূপ বলার পরিবর্তে বিজয়ীদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের অনুসৃত পথের কথা বলেছেন। কেন? কারণ, ক্ষতিগ্রস্ত ও তাদের ভুলের ব্যাপারে কথার শেষ নেই। এদের ধরন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অগণিত, ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ অসংখ্য, কিন্তু বিজয় ও সফলতা অর্জনকারীদের জন্য দিকনির্দেশনা খুবই সহজ সরল। দিকনির্দেশনা মেনে চলার ব্যাপারটাও জটিলতামুক্ত, সরল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাহলে কী? এর আগের বারোটি দারসে যে চারটি বুনিয়াদি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, এগুলোই সেই বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই কুরআনের বহু আয়াত এবং এমনকি কিছু হাদিসেও সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথকে একক, অনন্য বলা হয়েছে। সিরাতুল মুস্তাকিম সব সময় 'একবচন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য পথের বেলায় 'বহুবচন' এসেছে,

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ.....

www.banglakitab.weebly.com

> **নিশ্চয়ই, এই-ই হচ্ছে (১৫১ ও ১৫২ নাম্বার আয়াতে উল্লেখিত পন্থা) আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চোলো না..। (সূরা আনআম, ১৫৩)**

সিরাতি (صراطی—আমার পথ) একবচন অর্থাৎ, একটি-ই সরল পথ। অন্যদিকে বহুবচন হলো সুবুল (سبل)। দেখুন কুরআনে সঠিক পথের বেলায় একবচন আর ভ্রান্ত পথের ব্যাপারে, গোমরাহির রাস্তার ব্যাপারে বহুবচন এসেছে।

যারা ঈমান আনে :

ঈমান ইলম থেকে উৎসারিত

ঈমান ইলম থেকে উৎসারিত হয়। *উসুল আস-সালাসাহ্র* লেখক যে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম হলো ইলম। তিনি বলেছেন, প্রথম মূলনীতি হলো জানা। অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের ইলমকে জানা। আপনি এসব বিষয়ে জানবেন যাতে আপনি ঈমান আনতে পারেন। ইলম আপনাকে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনা শেখাবে। এর আগে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যে বিষয়টা অনেকের মনে প্রশ্ন জাগাতে পারে তা হলো, *উসুল আস-সালাসাহ্র* লেখক মূলনীতি হিসেবে ইলমের কথা বলেছেন। আল্লাহ ﷻ, রাসূল ﷺ ও কুরআনের ইলম হাসিল করাকে লেখক মূলনীতি দাবি করেছেন। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, সূরা আল-আসরে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, ঈমান পাবার একমাত্র পথ হলো ইলম, তাই লেখক ইলমের মাধ্যমে ঈমানকেই মূলনীতি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। ইলম ছাড়া কি খাঁটি ঈমান সম্ভব? কখনোই না।

ঈমান হলো ইলমের শাখা আর এ থেকেই এটি উৎসারিত হয়। তাই লেখক প্রথম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইলমকেই। লক্ষ করুন, তিনি ইলমকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইলমকে তিনি আল্লাহ ﷻ, রাসূল ﷺ ও কুরআন এই তিনটির মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে জানা ছাড়া, ইলম ছাড়া, ঈমান থাকতে পারে না। বৃক্ষ ব্যতীত তার ফল কি পাওয়া সম্ভব? ইলম হচ্ছে বৃক্ষ আর ঈমান তার ফল। কাজেই লেখক যখন বলছেন ইলম হলো আল্লাহ ﷻ, রাসূল ﷺ ও কুরআনের ব্যাপারে জানা ও জ্ঞান অর্জন, তখন তিনি এই সূরা আল-আসরের এই আয়াতে যে ঈমানের কথা বলা হচ্ছে তা-ই বোঝাচ্ছেন। কারণ, এই ইলমের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ﷻ-এর, তাঁর রাসূল ﷺ ও কুরআনের ওপর ঈমান আনা।

www.banglakitab.weebly.com

এই আয়াতে ঈমানের তাৎপর্য :

আল্লাহ ﷻ কেন সবিস্তারে ঈমানের আলোচনা করলেন না

কিসের কীসের ওপর ঈমান আনতে হবে, সূরা আল-আসরে কেন সেগুলো বলে দেয়া হলো না? আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.....

তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে।

এটুকু বলেই তিনি শেষ করেছেন। বিস্তারিতভাবে ঈমানের শাখাগুলোর ব্যাপারে তিনি বলেননি। কেন? এ ব্যাপারে আমি তিনটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আল্লাহ ﷻ এই আয়াতে ঈমান নিয়ে বিশদ আলোচনা করেননি, কারণ :

১) এটি স্পষ্ট,

২) এটি জ্ঞাত, এবং

৩) ঈমান কী, তা নিয়ে কুরআন ও হাদিসে অনেক আলোচনা এসেছে যা থেকে স্পষ্টভাবে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়।

যেমন ধরুন আমার একটি গাড়ি আছে। আমি আর আপনি গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছি। আমি চালাচ্ছি। চলার পথে এক জায়গায় থেমে আপনাকে গাড়ির চাবি দিয়ে আমি বললাম, এখন আপনি চালান। আমি আপনাকে কোন গাড়ি চালাতে বলছি সেটা কি এখানে গাড়ির রং, মডেল, প্লেট নাম্বারসহ আপনাকে বলার দরকার আছে? মাত্র আপনি আমার সাথে গাড়িতে বসে ছিলেন। কোন গাড়ির কথা বলা হচ্ছে আপনি জানেন। তাই শুধু এটুকু বলা যথেষ্ট যে, আপনি আমার গাড়িটি চালান। ঈমানের ব্যাপারটাও ঠিক তা-ই।

ঈমান নিয়ে এ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা না আসার আরেকটি দিক হলো, এর মাধ্যমে যা কিছু বিশ্বাস করা আবশ্যক তার সবকিছুকে বোঝানো হয়েছে। যেহেতু এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ ঈমানকে সীমাবদ্ধ করে দেননি তাই এর অর্থ ব্যাপকতা লাভ করেছে। আল্লাহ, আসমানি কিতাব, ফিরিশতা, রাসূলগণ, কাদা, কাদর এবং এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ ঈমানের সব দিক এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ মেনে চলা

তিন নাম্বার পয়েন্ট হলো, ঈমানকে সীমাবদ্ধ না করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর হুকুম-আহকামের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং সব অলীক, অবাস্তব রূপকথা, কাহিনি ও কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা। আপনারা দেখবেন কুরআন ও সহিহ হাদিস থেকে আখিরাত ও কবর

www.banglakitab.weebly.com

সম্পর্কে আমরা এমন কিছু ধারণা পাই, যা হৃদয়কে ভয়ে প্রকম্পিত করে। আতঙ্কে অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়। অথচ এমন অনেক লোক আছে যাদের ওপর এগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। কারণ, তাদের অন্তরে ঈমান পূর্ণভাবে গাঁথেনি এবং তাদের কুরআনের বুঝেও যথেষ্ট ঘাটতি আছে। কিন্তু এদের মাঝেই আবার আপনি এমন অনেক মনগড়া কাহিনির প্রচলন দেখতে পাবেন যেগুলো শোনামাত্র আপনি বুঝতে পারবেন, এগুলো বানোয়াট। যেমন : এক লোককে কবর দেয়া হলো। যে লোক তাকে দাফন করেছিল ভুলক্রমে তার মানিব্যাগ কবরের ভেতরে পড়ে যায়। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর হারানো মানিব্যাগের কথা তার মনে পড়ে। রাতেই সে মাটি খুঁড়ে মানিব্যাগ বের আনার জন্য রওনা হয়। তারপর সে গিয়ে দেখে কবরের মধ্যে লাশটি পুড়ে কয়লার মতো হয়ে গেছে। আর এটা কেবল ওই একজন লোক দেখেছে আর কেউ দেখেনি! তারপর গল্পের একদম শেষে লেখা থাকবে যে, এই গল্প যদি আপনি দশজন লোকের কাছে না পাঠান, তাহলে আপনি কিংবা আপনার পরিবারের কেউ মারা যাবে! মনে রাখবেন, আল্লাহ ﷻ যখন আপনাকে ঈমান আনতে বলছেন তখন তিনি তাঁর আয়াতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। তার নাযিলকৃত দিকনির্দেশনার ওপর ঈমান আনতে বলছেন। ইসলাম আপনাকে কল্পকাহিনি বিশ্বাস করতে বলে না। ইসলাম বলে না যে আপনি যা শুনবেন তা-ই বিশ্বাস করবেন। বরং ঈমানের প্রশ্নে মুমিনকে সব সময় বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসরা ওয়াল মিরাজের রাতের পরের ঘটনা। তখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আবু বকর رضي الله عنه-এর দেখা হয়নি। কুরাইশের লোকেরা আবু বকর رضي الله عنه-কে ধরে বলতে শুরু করল, হে আবু বকর, শুনেছ নাকি? তোমার সাথি বলছে সে নাকি এক রাতের মধ্যে মক্কা থেকে আল-আকসায় চলে গেছে। তারপর সাত আসমান ভ্রমণ করে এক রাতের মধ্যেই ফিরে এসেছে! এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?

এই সেই ব্যক্তি যাকে আস-সিদ্দীক উপাধি দেয়া হয়েছিল, তিনি এই আয়াতে বর্ণিত মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হিদায়াতের ওপর ছিলেন, কল্প-কাহিনিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি অল্প কথায় স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন এবং আমাদের জন্য একটি মূল্যবান মূলনীতির দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন। তিনি বললেন,

إِنْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ

যদি রাসূলুল্লাহ এ কথা বলে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্য বলেছেন।

অর্থাৎ, তোমাদের কথা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু যদি আসলেই এটা নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলে থাকেন তবে এই ঘটনা সত্য। কোনো বিষয় যদি কুরআন বা সহিহ হাদিসে এসে থাকে, তবে সেটা আপনার মনঃপূত হোক বা না হোক, অন্তরে বসুক বা না বসুক, এতে কিচ্ছু যায় আসে না। সেটা বিশ্বাস করতেই হবে। তবে যা শুনবেন, তা-ই বিশ্বাস করে বসবেন না।

www.banglakitab.weebly.com

যারা সৎকর্ম করে :

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.....

আমিলুস সালিহাত (عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) –যারা নেক আমল করে। এটি হলো সাফল্য অর্জনকারীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল ঈমান আনা আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো নেক আমল। আল্লাহ ﷻ কুরআনে মোট একান্নটি আয়াতে ঈমান ও নেক আমলকে সরাসরি যুক্ত করেছেন। ঈমান থাকতে হলে আমল ও আচরণ থাকতে হবে। লক্ষ করুন, কীভাবে ঈমানের ক্ষেত্রে প্রথমে ইলম ও তারপর আমলের কথা আসছে। ঈমান ছাড়া কোনো নেক আমল করা সম্ভব না, আর ঈমানের জন্য প্রয়োজন ইলম। সুতরাং প্রথমে হলো ইলম, তারপর ঈমান আর এর পরের ধাপ হলো আমল।

ঈমানের শর্ত আমল

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমল ব্যতীত কোনো ঈমান নেই। যাদের কাজকর্ম ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তারা সব সময় বলে বেড়ায়, আমাদের অন্তরে ঈমান আছে। আমানু ও আমিলুস সালিহাতকে একান্নবার একসাথে উল্লেখ করার মাধ্যমে কুরআন এই ধরনের লোকদের মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দিচ্ছে। আমি সেই ব্যক্তির কথা বলছি না, যে যুহরের সময় শাহাদাহ পাঠ করল আর আসরের আগেই মারা গেল। এ ব্যক্তি তো ইসলামের হুকুম-আহকামগুলো মেনে চলার সুযোগই পায়নি। মুসলিম হওয়া থেকে মৃত্যু, এই সময়টুকুতে কোনো ফরয আমলের সময় তার সামনে আসেনি, এমন ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাগুলোর কথা আমি বলছি না। আমি ওইসব প্রতারকদের কথা বলছি, যারা কোনো আমল ছাড়াই দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে আর তাদের এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে জবাব দেয়–আমার তো অন্তরে ঈমান আছে। ঈমান হলো অন্তরের সেই চারাগাছ যা থেকে ফুল প্রস্ফুটিত হয়। যদি আপনি চারাগাছে নিয়মিত পানি না দেন, যত্ন না করেন, চারাগাছ যদি প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও পরিচর্যা না পায়, তাহলে একদিন তা মারা যাবে। কাজেই আপনি যদি দু-তিন সপ্তাহ আপনার ঈমানকে আমল ছাড়াই ফেলে রাখেন, যত্ন না করেন, তবে আপনার ঈমান মরে যাবে। এর আর কোনো উপকারিতা থাকবে না। অন্তরের ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আপনাকে অবশ্যই আমল করতে হবে। ঈমান হলো প্রাণের স্পন্দন। আর আমল হলো দেহের সঞ্জীবনী। কোনো কিছু ভেতরে মৃত কিন্তু বাহ্যিকভাবে জীবিত, এমন কি হয়? কিংবা বিপরীতটা? আর যদি আসলেই কারও মধ্যে এমন ঘটে তবে সেটা হবে সাময়িক, কারণ একসময় একটির অনুপস্থিতি অন্যটিরও মৃত্যুর কারণ হবে।

যারা নিজেদের ঈমানদার দাবি করে কিন্তু সপ্তাহ, মাস এমনকি বছরের পর বছর আমল

www.banglakitab.weebly.com

না করে কাটিয়ে দেয়, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো শয়তান, কুফফার কুরাইশ এমনকি ফিরাউনের মতো। আল্লাহ ﷻ এই আয়াতে কী বলেছেন দেখুন :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا .....

তারা অন্যায় ও অহংকারভরে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। (সূরা আন-নামল, ১৪)

আল্লাহ ﷻ এখানে কাফিরদের কথা বলছেন। তারা আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, যদিও তাদের অন্তরে তারা এগুলোকে সত্য হিসেবে জানত। অন্তর্যামী আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভেতরে ভেতরে ঠিকই তারা বিশ্বাস করত। তাদের অন্তরে ঈমান ছিল কিন্তু আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের বিরোধিতা করেছিল, আর এ কারণেই তাদের কাফির ঘোষণা করা হয়েছে। যারা কোনো আমল ছাড়া ঈমানের দাবি করে তারা হলো নদীগর্ভে বিলীন ফিরাউনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ অন্তরের গভীরে তো ফিরাউনও আল্লাহ ﷻ-এর ওপর বিশ্বাস করত। লক্ষ করুন, ফিরাউনের পরিবর্তনের দিকে। এই ফিরাউনই বলেছিল,

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

এবং বলল, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব। (সূরা আন-নাযিয়াত, ২৪)

আবার জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে, মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে সে বলেছিল, 'আমি মুসার রবের ওপর ঈমান আনলাম'।[১৬৪]

অন্তিম মুহূর্তে সবার অন্তরের সত্য প্রকাশিত হয়। পঞ্চাশ বছর কিংবা আরও বেশি সময় ধরে আল্লাহ ﷻ-এর নাফরমানি করে বেড়ানো লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। যখন নিশ্চিত মৃত্যুর কথা তাকে জানানো হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে সে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে ফিরে আসে। আমি এক লোকের কথা জানি, যার মুখে সব সময় মহান আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে গালিগালাজ আর অভিশাপ লেগে থাকত। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হলো। এখন এই উদ্ধত যালিম, যে আল্লাহ ﷻ-কে নিয়ে গালিগালাজ করত, তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সালাত আদায়ের নিয়ম-কানুন জানতে চায়, তাদের হক নষ্ট করার কারণে ক্ষমা চেয়ে কাকুতি-মিনতি করে।

---

১৬৪ কুরআনে এসেছে :

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর বনি ইসরাইলকে আমি পার করে দিয়েছি সাগর। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী–দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। যখন সে ডুবতে আরম্ভ করল তখন বলল, এবার আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, কোনো ইলাহ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর ওপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাইল। বস্তুত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউনুস, ৯০)

www.banglakitab.weebly.com

অসুস্থতা কিংবা বিপর্যয়ের পরই কেন এমন হয়? অসুস্থ হবার পর বুঝি সত্যের ব্যাপারে একজন মানুষের এমন আকস্মিক ও ব্যাপক উপলব্ধি হয়? নাকি এ উপলব্ধি এতদিন তার অন্তরে লুকিয়ে ছিল, বিপদ কেবল এর ওপর জমে থাকা ধুলোবালি সরিয়ে দিয়েছে? সাধারণত এমন আকস্মিক ও বিরাট পরিবর্তনের পেছনে মূল কারণ হলো, এ সত্য তাদের অন্তরেই ছিল, কিন্তু তারা একে কবর দিয়ে রেখেছিল। একটা লাল গালিচার কথা কল্পনা করুন। বছরের পর বছর ধুলো-ময়লা জমে একসময় এর রং-ই বদলে যায়। কিন্তু একটি লাঠি দিয়ে যখন আপনি এর ওপর আঘাত করা শুরু করবেন তখন দেখবেন, ধুলো-বালি উড়তে শুরু করেছে আর দীর্ঘদিনের চাপা পড়া লাল রং আবারও ফুটে উঠছে। বিপর্যয় হলো এই লাঠির আঘাতের মতো।

কুফফারদের অধিকাংশই সত্য জানে, আল্লাহ ﷻ তাদের ব্যাপারে বলেছেন :

وَاسْتَيْقَنَتْهَا.....

তারা সত্য অবগত আছে।

তারা অন্তরে নিশ্চিতভাবে সত্যকে চেনে, কিন্তু এটা তাদের কোনো কাজে আসে না, কেননা তারা একে (জবান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা) আমলে পরিণত করে না। ফিরাউনের অন্তরে সত্য লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু এ বিশ্বাসের সাথে আমল না থাকার কারণে তার এই বিশ্বাস কোনো কাজে আসেনি। বস্তুত তাদের আমল ছিল তাদের অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। সারকথা হলো, ঈমানের জন্য অন্তরের ঈমানের সাথে বাহ্যিক ঈমানও যুক্ত হতে হবে। আর বাহ্যিক ঈমান হলো আমল। কেউ যতই নিজেকে মুমিন দাবি করুক না কেন, দীর্ঘ সময়ব্যাপী সে যদি কোনো আমল না করে, তবে সে মুমিন না।

আচ্ছা বলুন তো, আপনি কি কোনো মানুষের ব্যাপারে কেবল অন্তরের ওপর সন্তুষ্ট হবেন? ব্যবসার ক্ষেত্রে কি আপনি শুধু অন্তরের চুক্তি মেনে নেবেন যদি আমলে এর কোনো ছাপ না থাকে? আপনি শুধু অন্তরের ভালোবাসায় সন্তুষ্ট হবেন যদি আমল এর বিপরীত হয়? যদি দুনিয়াবি বিষয়েই কেবল অন্তরের অবস্থাকে আপনি গ্রহণ না করেন, তাহলে আখিরাতের বেলায় আপনি তা কীভাবে আশা করেন? কোনো স্বামী যদি দিনরাত তার স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা বলে, কিন্তু তার কাজে এর কোনো ছাপ না থাকে–যদি সে তার স্ত্রীর ভরণপোষণ না দেয়, সন্তানদের খাবার, পোশাক, পড়াশুনা কোনো কিছুর খরচ না দেয়, সাংসারিক কাজে কোনো সহযোগিতা না করে–কিন্তু সারাদিন সোফায় বসে বলে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' তাহলে তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হবে? এমন অবস্থায় স্ত্রীদের কমন কথা কী হয়? তুমি যদি আসলেই ভালোবাসতে, তাহলে তো তোমার আচরণে সেটা প্রকাশ পেত। আর তারপর সে শাইখের

www.banglakitab.weebly.com

কাছে গিয়ে খুলা'র[১৬৫] জন্য আবেদন করবে।

স্কুল, কলেজ কিংবা অফিসে, যখন আপনি ভালো করবেন আপনার শিক্ষক বা বস আপনাকে পছন্দ করবে। তার আচরণ, তার কথায় আপনার প্রতি তার পছন্দের ছাপ থাকবে। সে আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে, আপনাকে ভালোবাসবে। 'আমি যদি আসলেই ভালো হয়ে থাকি তবে সেটা প্রকাশ করা হোক', এটা আমরা সবাই চাই। যদি আমি ভালো হয়ে থাকি তবে আমার মূল্যায়ন কোথায়? এ প্লাস কোথায়? আমার প্রমোশন কোথায়?

ঈমানবিহীন আমল

আমল ছাড়া ঈমানের বিপরীত হলো ঈমানবিহীন আমল। অন্তরে ঈমান না এনেই আমল করা। এটিও অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমলের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো যায় যখন বাহ্যিক আমল অন্তরের ঈমানের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। যাদের আমল ঈমানবিহীন তাদের বৈশিষ্ট্য মুনাফিক ও বহুরূপীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আপনি দেখবেন এমন লোকদেরই ঈমানে ধস নামে, তারাই অধঃপতনের স্বীকার হয়। এরাই নিজেদের অবস্থান সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে। বাইরে থেকে দেখলে এসব লোকদের খুব ধর্মপ্রাণ মুসলিম মনে হবে, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন দেখবেন সে পুরোপুরি বদলে গেছে। একেবারে উল্টো আচরণ করতে শুরু করেছে। এ মানুষগুলোর আমল থাকলেও বাইরের এ রূপ ছিল অন্তঃসারশূন্য।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আসলে উদাহরণের মাধ্যমে সহজে এ ব্যাপারগুলো বোঝা যায় তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি আপনাদের উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই শতাব্দীর শুরুর দিকের কথা। আবদুল্লাহ আল-কাসিমি নামে এক লোক ছিল। তার জন্ম সৌদিতে কিন্তু একপর্যায়ে সে স্বেচ্ছা নির্বাসনে মিসর চলে যায়। আল-কাসিমি বেঁচে ছিল ১৯০৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত। গত শতাব্দীর প্রথমভাগে ইসলাম ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের সমর্থনে এবং বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আল-কাসিমি অনেকগুলো বই লিখেছিল। তার গভীর জ্ঞান ও ইসলামের খেদমতে অবদানের প্রশংসা করে আব্দুয যাহির আবু সামহ ﷺ (হারাম শরিফের একজন ইমাম; ১৯৫২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন) একটি কবিতাও লিখেছিলেন।

১৬৫ খুলা (الخلع) হচ্ছে, মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে কোনো কিছুর (মোহরের) বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া। কুরআন ও সুন্নাহয় খুলা করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন, 'যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়েই আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় তবে উভয়ের কারও পাপ হবে না।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১২৯)

খুলা আসলে তালাক কি না—এ নিয়ে আয়িম্মা কিরামের মাঝে ইখতিলাফ আছে। ইমাম আবু হানিফা ﵀-সহ কতিপয় ইমামের মতে খুলা তালাকের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ ﵀-সহ অন্যান্য ইমামদের মতে খুলা মূলত তালাক নয়; বরং খুলা হচ্ছে 'ফাসখুন নিকাহ' বা বিবাহ বাতিল করা।

www.banglakitab.weebly.com

আবদুল্লাহ আল-কাসিমি অনেকগুলো বই লিখেছিল। তার বেশকিছু বই আমি পড়েছি এবং আসলেই তার প্রথম দিকের বইগুলো পড়লে আপনি উপকৃত হবেন। যেমন : তার সবচেয়ে জনপ্রিয় বই *আস-সিরায়ু বাইনাল ইসলামি ওয়াল ওয়াসানিয়্যাহ* (الصراع بين الإسلام والوثنية)। তার আরেকটি বই হলো *আল বুরুকুন নাজদিয়্যাহ* (البروق النجدية)। যারা দাবি করে সৃষ্টির সাথেও শাফায়াত আছে এই বইটি তাদের এই দাবি নিয়ে। মূলত এখানে শিরক আকবর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার আরেকটি বই হলো *মুশকিলাতুল আহাদিসিন নাবাউইয়্যাতি ওয়া বায়ানিহা* (مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها)। এ বইতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সে ওইসব নাস্তিকদের কথার খণ্ডন করেছে যারা দলিলের ওপরে যুক্তিতে স্থান দিতে চায়। তার একটি বইয়ের নাম *আল-ফাসলিল হাসিম বাইনাল ওয়াহ্যাবিয়্যিন ওয়া মুখালিফিহিম* (الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم)। এ ছাড়া শুয়ুখুল আযহার, আস-সাওরাতুল ওয়াহাবিয়্যাহসহ তার লেখা আরও বেশ কিছু বই আছে। এ বইগুলোতে সে বিশুদ্ধ তাওহিদ ও এর অনুসারীদের পক্ষে লেখালেখি করেছে। তার একটি বিখ্যাত বই হলো হায়াত মুহাম্মাদ এবং এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থও সে লিখেছিল। আপনারা যদি তার বইগুলো পড়তেন কিংবা তার সময়ে যদি আজকের মতো অডিও টেপ বা ইউটিউব ভিডিও লেকচার থাকত, তাহলে আপনি মনে করতেন সে হলো সালাফদের পথের ওপর থাকা ইমামদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যিনি শুধু সাধারণভাবে ইসলামের দাওয়াহ করছেন না; বরং তাওহিদের মৌলিক বিষয়গুলোর পক্ষে লড়াই করছেন। এই ছিল বাহ্যিক অবস্থা, আপাতভাবে তার ব্যাপারে এমনটাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আসলেই কি তাই?

এই আবদুল্লাহ আল-কাসিমি একসময় ঘোরতর নাস্তিক হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল এমন একজন লোক যার বাহ্যিক আমলের সাথে তার অন্তরের অবস্থা মিলত না। আজকে যাদের দেখছেন এমন অনেক মূর্খের ব্যাপারটাও একই রকম। হয়তো এদের অবস্থা আল-কাসিমির মতো এত গুরুতর না, তবে মৌলিকভাবে তাদের সমস্যা এক। যারা পনেরো বছর আগেও কুরআন, হাদিস, তাওহিদের বাণী ও সালাফদের বক্তব্য প্রচার করত, আচমকা তারা আজ মডার্নিস্ট হয়ে গেছে কিংবা মর্ডানিস্ট হবার কিনারায় পৌঁছে গিয়েছে। নুসুসের অনুসরণের বদলে আজ এরা রাজনৈতিক বিশ্লেষক বনে গেছে। কুরআন-সুন্নাহ দলিলের আলোকে বিশ্লেষণ না করে তারা সিএনএন-এর জন কিং এর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদের অনেকের বর্তমান কথাবার্তা ও লেখনী এবং পনেরো বছর আগের অবস্থার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। পূর্ব-পশ্চিমে সব জায়গায় আপনি এদের দেখতে পাবেন। আল-কাসিমি, যে একসময় কলম হাতে তাওহিদের পক্ষে লড়াই করত, সে-ই ঘোরতর নাস্তিকে পরিণত হয়েছিল। হ্যাঁ, এদের অবস্থা আল-কাসিমির মতো অতটা চরম পর্যায়ে এখনো পৌঁছায়নি। কিন্তু আল-কাসিমির সাথে এদের মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান আর তা হলো, এদের বাহ্যিক রূপের সাথে অন্তরের অবস্থা মেলে না। এই হলো তাদের সবার কমন সমস্যা, নাসআলুল্লাহাল আফিয়াহ।

আল-কাসিমি নাস্তিক হয়ে যাবার পর তার ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুর কাছ থেকে জানা যায়, যে

www.banglakitab.weebly.com

সময়টাতে ইসলাম, তাওহিদ ও বিশুদ্ধ আকিদাহর সমর্থনে বইগুলো সে লিখছিল, তখন বন্ধুদের সাথে একান্ত বৈঠকে এমন সব বিষয় নিয়ে সে বিতর্ক করত যা ছিল খুব অস্বাভাবিক। তারা অবাক হয়ে ভাবতেন, এই লোক কীভাবে এসব কথা বলতে পারে? আল-কাসিমির এক বন্ধু বলেছিলেন, আকিদাহ ও তাওহিদের পক্ষ নিয়ে বই লেখার সময়েই বন্ধুদের সাথে রাতের খাবার খেতে বসে মুহাম্মাদ ﷺ ও আল্লাহ ﷻ-কে নিয়ে সে এমন সব প্রশ্ন তুলত, যা থেকে সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ পেত। আবার দিনের বেলায় আমি তাকে দেখতাম সহিহ মুসলিমের দারস দিতে। তাই আমি ভাবতাম, গতরাতে সে যা বলেছে তা হয়তো শয়তানের ওয়াসওয়াসা। কারণ, এটা কীভাবে সম্ভব যে গতরাতে যেই লোক আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে যে সংশয়ে ছিল, সে-ই ভোরে উঠে মানুষকে সহিহ মুসলিমের দারস দিচ্ছে?

চিন্তা করে দেখুন, আমরা কিন্তু বাইরে থেকে এগুলো কিছুই জানতে পারিনি। আমরা কেবল তার বাহ্যিক অবস্থা দেখেছি, তার বইগুলো দেখেছি। তাওহিদের দিকে আহ্বানকারী থেকে ঘোরতর নাস্তিকে পরিণত হওয়া আল-কাসিমি এবং তার মতো অন্যান্যদের মূল অসুখ হলো, তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার অসামঞ্জস্য। তাদের বাইরের অবস্থার সাথে ভেতরের অবস্থা মেলে না। তাদের মধ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ঈমানের সমন্বয় ঘটেনি।

এ কারণে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে কিছু চাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই চাইবেন। একটি সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

> হে অন্তরের পরিবর্তনের মালিক, আমার অন্তরকে আপনি আপনার দ্বীনের ওপর দৃঢ় ও অবিচল রাখুন।[১৬৬]

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তর ও আমলকে একই পথে চালনা করুন, যাতে আমি তাওহিদের ওপর অবিচল থাকতে পারি।

সর্বপ্রকার নেক আমল এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত

পরিশেষে, আমালুস সালিহাত হলো নেক আমল (ইসলামের ওপর আমল)। এটা ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ লাভকারীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। অন্তরের অভ্যন্তরীণ কর্ম এবং জিহ্বা, হাত ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত বাহ্যিক কর্ম—সব ধরনের আমল এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয, সুন্নাহ, আল্লাহ ﷻ-এর হক ও বান্দার হক, এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত সব ধরনের আমল। এ সবকিছু আমালুস সালিহাতের অন্তর্ভুক্ত।

---

১৬৬ *মুসনাদু আহমাদ*: ১২১২৮; *সুনানুত তিরমিযি*: ২১৪০

www.banglakitab.weebly.com

হক ও সবর-সংক্রান্ত কিছু নাসীহাহ :

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'যারা পরস্পরকে হক ও সবরের নিরন্তর উপদেশ দেয়'

পরস্পরকে হক ও সবরের পরামর্শ দেওয়া। এটা হলো চারটি মূলনীতির তৃতীয় ও চতুর্থ মূলনীতি। ঈমান পাথর নয় যে, হাজার হাজার বছর পরও তা একই রকম থেকে যাবে। একটি পাথরের দিকে লক্ষ করুন, শত শত বছর ধরে ফেলে রাখলেও এতে কোনো পরিবর্তন আসে না। কিন্তু ঈমান এমন না, যদি হতো তাহলে ভালোই হতো, কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। ঈমান ওঠানামা করে আর এই ওঠানামার পেছনে কিছু শক্তি বা নিয়ামক কাজ করে। এর পেছনে তিনটি বিষয় কাজ করে।

প্রথমটি হলো, আন-নাফস। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ......

নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ...। (সূরা ইউসুফ, ৫৩)

দ্বিতীয়টি হলো শায়াতিন আল-ইনস, আর তৃতীয় হলো শায়াতিন আল-জিন। কুরআনে এগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনার নাফস এবং মানুষ ও জিনজাতির শয়তানরা আপনার জন্য ওত পেতে বসে আছে। এগুলো বাইরে থেকে আপনার ওপরে প্রয়োগ হয়। কখনো এদের একটি আপনাকে আক্রমণ করে। কখনো দুটি একসাথে আক্রমণ করে আবার কখনো তিনটিই একসাথে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য। কখনো পূর্ণ শক্তিতে তারা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার কখনো-বা হালকাভাবে শক্তি প্রয়োগ করে।

তাহলে এই আক্রমণ প্রতিহত করার এবং এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী?

সত্য ও সবরের উপদেশ দেয়া। নফসের কুমন্ত্রণা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং জিন ও মানুষের কাছ থেকে আসা হারাম কাজের প্ররোচনা নিয়ন্ত্রণ করতে আপনাকে সাহায্য করে আপনার মুসলিম ভাইবোনেরা। কীভাবে? আপনাকে সঠিক ও উত্তম নাসীহাহ করার মাধ্যমে। এ জন্যই আপনার দরকার দ্বীনি ভাইদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকা। কেননা, একাকী মানুষ অত্যন্ত দুর্বল, সহজেই সে গলে যায়। আপনি যদি দশটি কাপের প্রতিটিতে একটি করে বরফের টুকরো রাখেন আর অন্য একটি কাপে দশটি বরফের টুকরো রাখেন, তাহলে কোন বরফগুলো আগে গলবে? যে টুকরোগুলো আলাদা আলাদা আছে সেগুলোই আগে গলে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

দাওয়াহ কারও একচেটিয়া অধিকার নয়

আল্লাহ ﷻ কেন আওসাও (أوصوا) এর পরিবর্তে তাওয়াসাও (تواصوا) বললেন? এর কারণ হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ জানিয়ে দিলেন হক ও সবরের নাসীহাহ ও পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারটি কোনো এক শ্রেণির মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। যেকোনো মুসলিম এ কাজটি করতে পারে, এটি সব মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাওয়াসাও হলো দাওয়াহ। দাওয়াহ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংবা একচেটিয়া অধিকার না। যদি আওসাও বলা হতো, তাহলে হয়তো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির সাথে একে যুক্ত করা যেত। কিন্তু যখন বলা হয়েছে তাওয়াসাও, এর মানে হলো এটা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং সবার ওপরই এ দায়িত্ব বর্তায়। দায়িত্বটি হলো অপরকে নাসীহাহ করা এবং অন্যের নাসীহাহ গ্রহণ করা। এটাই আওসাও এর বদলে তাওয়াসাও ব্যবহারের কারণ।

এই ব্যাপারে সবার অবস্থান সমান, কেউ কারও চেয়ে উত্তম নয়। কোনো শাইখ নাসীহাহর অমুখাপেক্ষী নন, কোনো তালিবুল ইলম ও সাধারণ মানুষ সত্য ও সবরের ব্যাপারে নাসীহাহর অমুখাপেক্ষী নয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ, তালিবুল ইলম, শাইখ ও ইমাম সবাই সমান। এখানে কোনো যাজকতন্ত্র নেই; বরং আমরা সবাই এর অংশীদার। কিছু কিছু দেশে আলাদাভাবে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ-সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় থাকে (The Agency of the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)।[১৬৭] কিছু দেশ সৎ কাজের আদেশ ও দাওয়াহ কেবল এই মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। যদি আয়াতে আওসাও বলা হতো তবে তাদের এ কাজের পক্ষে দলিল দেওয়া যেত, কিন্তু তাওয়াসাও বলা মানে প্রত্যেক মুমিনকেই একে অপরকে উপদেশ দিতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই এ ক্ষেত্রে সমান। এখানে একমুখী হবার কোনো সুযোগ নেই। শুধু নাসীহাহ দেবো কিন্তু গ্রহণ করব না, এমন করা যাবে না। প্রত্যেকের একসাথে দুটোই মেনে চলতে হবে।

পরামর্শ দান একটি সামষ্টিক প্রচেষ্টা

মুমিনদের মধ্যকার সম্পর্কে উদাহরণ হলো দুটি হাতের মতো, যার একটি অপরটির ময়লা দূর করে। এক হাতের ময়লা দূর করতে গেলে অন্য হাতের সাহায্য লাগবে। মুমিনরাও ঠিক তেমন। আপনি যদি চান অন্যরা আপনার শিক্ষা ও নাসীহাহ গ্রহণ করুক, তাহলে আপনার নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হবে। আপনি নিজেকে যা-ই মনে করেন না কেন। অন্যের উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে, আপনার মধ্যে নাসীহাহ গ্রহণের মানসিকতা রাখতে হবে। শুরু করতে হবে এখান থেকেই। ওয়াল্লাহি, আমরা কেউই নির্ভুল নই, আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো দুর্বলতা আছে। এই উম্মাহ একটি দেহের মতো আর আমাদের করণীয় হচ্ছে একে অপরের দুর্বলতা সংশোধনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। কেউ কেউ সংশয়-

---

১৬৭ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (হাইয়াতুল আমরি বিল মা'রুফ ওয়ান নাহয়ি আনিল মুনকার)

www.banglakitab.weebly.com

সন্দেহে ভুগতে পারেন, একে বলা হয় শুবুহাত (شبهات)। যেমন : কোনো ব্যক্তি হয়তো আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। আজ অনেকের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়। অন্তরে শয়তানের ওয়াসওয়াসা এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যে, ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর অস্তিত্বের ব্যাপারেই সন্দিহান হয়ে পড়ে। একদিকে কিছু মানুষ যেমন এমন শুবুহাতে আক্রান্ত হয়, অপরদিকে এমন মুমিন থাকে যারা দৃঢ়তার সাথে শুবুহাত দমন করতে পারে। আবার দেখা যায় অনেকে দৃঢ়তার সাথে প্রবৃত্তি তথা শাহাওয়াতের (شهوات) মোকাবেলা করতে পারেন না। নারী, বাদ্যযন্ত্র এগুলো শাহাওয়াতের উদাহরণ।

শুবুহাত মোকাবেলায় যিনি দৃঢ়, হতে পারে যে তিনি শাহাওয়াতের ক্ষেত্রে দুর্বল। যেমন : তিনি সংশয়ে পড়েন না কিন্তু হয়তো হারাম জিনিস দেখার প্রতি সহজে আকৃষ্ট হন। এসব ক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রে শক্তিশালী মুমিন তার ওই ভাইকে সাহায্য করবে, যে এ ব্যাপারে দুর্বল। আপনি যদি শুবুহাতের ব্যাপারে সুদৃঢ় হন, তাহলে আপনি ওই ভাইদের সাহায্য করুন যারা সংশয়ে আক্রান্ত হয়েছে। একইভাবে আপনি যদি শাহাওয়াতের মোকবেলায় শক্তিশালী হন, তাহলে আপনার ওই ভাইকে সাহায্য করুন যিনি কামনা-বাসনার কাছে দুর্বল। ঈমানের বৃক্ষ তরতাজা রাখতে পানি দিতে থাকতে হবে। পারস্পরিক নাসীহাহ মুমিনদের ঈমানকে তাজা রাখে।

আপনার ঘরের টেবিলের কথাই ভাবুন না। ধরুন, আপনি এক কি দুমাসের জন্য বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গেলেন। কিংবা আপনি বাড়িতেই আছেন কিন্তু বেশ কিছুদিন একে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করতে ভুলে গেলেন। তাহলে কী হবে? একসময় তা ধুলোমলিন হয়ে যাবে। আমরা যখন একে অপরকে নাসীহাহ ও সৎ পরামর্শ দিই তখন এটা আমাদের অন্তরের ওপর জমা ধুলোময়লা দূর করে।

লক্ষ করুন, সূরাতে প্রথমে ঈমান (আমানু) ও আমলের (আমিলুস সলিহাত) বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের দায়িত্বের কথা এখানে এসেছে। কিন্তু যখন সূরাতে পরামর্শ দেয়ার কথা এসেছে তখন মুসলিম হিসেবে দলগত বা সামষ্টিক দায়িত্বের কথা বলা হচ্ছে, কারণ আমরা প্রত্যেকে মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য। কাজেই এটি সামষ্টিক বা দলগতভাবে পুরো উম্মাহর দায়িত্ব। এ সবকিছুই আমরা পাচ্ছি ওয়া তাওয়াসার (وَتَوَاصَوْا) এর অর্থ থেকে।

হক হলো কুরআন ও সুন্নাহ :

সূরা আল-আসরে তৃতীয় যে মূলনীতিটি এসেছে–অর্থাৎ পরস্পরকে হকের নাসীহাহ করা, লেখক মূলত একে দাওয়াহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.....

হক শব্দটির মাধ্যমে এখানে আল্লাহ ﷻ-এর নাযিলকৃত ওয়াহিকে (কুরআন ও সুন্নাহ) বোঝানো হচ্ছে।

www.banglakitab.weebly.com

সবর :

সম্পূর্ণ সূরাব্যাপী সবরের শিক্ষা নিহিত

চতুর্থ ও সর্বশেষ মূলনীতি হলো সবর। এই সূরার অন্যান্য অমূল্য শিক্ষার পর এ থেকে পাওয়া সবরের শিক্ষা হলো অনেকটা বোনাস পুরস্কারের মতো। আপনি যদি সূরা আল-আসরের অন্তর্নিহিত শিক্ষার দিকে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন এই সূরাতে চারবার সবরের কথা এসেছে।

প্রথম হলো,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.....

ঈমানের বিরাট একটি বড় অংশ সবর থেকে উৎসারিত। কিছু কিছু আলিমের মতে, 'সবর হলো ঈমানের অর্ধেক'।[১৬৮] সুতরাং সবরের ইঙ্গিত প্রথম এসেছে এই আয়াতে।

দ্বিতীয় হলো,

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....

অর্থাৎ, যারা নেক আমল করে। সবর কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়? মনে করে দেখুন, আমরা কিন্তু বলেছি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত (নেক) আমলই আমিলুস সালিহাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এখানেও সবরের শিক্ষা এসেছে।

তৃতীয় স্থান হলো,

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ.....

হকের উপদেশ দাও। সবর কি সাধারণভাবে হকের অন্তর্ভুক্ত নয়? অবশ্যই সবর হকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর মাধ্যমে তৃতীয়বারের মতো সবরের উল্লেখ হয়েছে।

সর্বপ্রকার ধৈর্য 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত

সবশেষে সবর শব্দটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, জীবনের পথচলায় ও সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সুগভীর প্রভাবের কথা বোঝানোর জন্য। আর এ কারণেই সূরার শেষে চতুর্থবারের মতো এর উল্লেখ এসেছে।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

১৬৮ ইবনুল জাওযী, *উদ্দাতুস সাবিরিন* : ১/১০৮

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সবর, সব বিপদ-আপদ ও পরীক্ষায় ধৈর্য অবলম্বন করা এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এর আগে দশম দারসে আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মনে রাখবেন। ক্ষুদ্র কিংবা বড় যেকোনো ব্যাপারে ধৈর্যধারণ, এমনকি বিরক্তির সময় সবর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। একঘেয়েমি, বিষণ্নতা, উদাসীনতা, এগুলোর মোকাবেলা করাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। ইবাদত ও নেক আমল থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য শয়তান আপনার মনে একঘেয়েমি আর উদাসীনতার সৃষ্টি করবে। সবরের মাধ্যমে শয়তানের এই কৌশলের মোকাবেলা করতে হবে। আমরা এখন যা করছি, সেই ইলমচর্চার বেলাতেও সবর প্রয়োজন। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেও সবর প্রয়োজন। আপনি বিশাল এক জগ পানি নিয়ে একটা চারাগাছের ওপর ঢেলে দিয়ে, তারপর ওভাবে সেটাকে ফেলে রাখতে পারেন। আবার প্রতিদিন নিয়ম করে এক মগ করে পানি দিতে পারেন। কোনটা ভালো? আপনি যদি একবারে এক জগ পানি পুরোটা ঢেলে দিয়ে তারপর আর পানি না দেন, তাহলে গাছটির বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। গাছটিকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই নিয়মিত এক-দুই মগ করে পানি ঢালতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এ রকম।

শয়তানের একটা কৌশল হলো সে কিছু কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষকে এগিয়ে যেতে দেয়। কেউ হয়তো মাত্র ইসলাম কবুল করার পর, কিংবা কোনো একটা খুতবাহ অথবা লেকচার শুনে হঠাৎ করেই ইশা থেকে ফজর অবধি কিয়ামুল লাইল করার কথা চিন্তা করতে শুরু করে। এ জন্যই 'মুমিনের অন্তরের প্রশান্তি (কিয়ামুল লাইল)'[১৬৯] লেকচারে আমি বলেছিলাম, আপনি শুরু করুন তবে ধীর-স্থিরতার সাথে, ধাপে ধাপে। একসাথে বেশ কিছুটা কাজ করে তারপর সেটা বন্ধ করে ফেলে রাখার চেয়ে, ধাপে ধাপে শুরু করে সেটা নিয়মিত চালিয়ে যায়া উত্তম। শয়তান হয়তো একদিন সারা রাত আপনাকে কিয়াম করতে দেবে, যাতে করে পরের দিন থেকে আপনার উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। আর এভাবে এক রাতের ইবাদতের বিনিময়ে সে আপনাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছরও ওই ইবাদত করা থেকে বিরত রাখে। ইসলামে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি ও উদাসীনতা সৃষ্টির শয়তানী কৌশলের মোকাবেলায় আপনাকে সবর করতে হবে। একইভাবে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রেও সবর প্রয়োজন। আপনারা দেখবেন, অনেকে অনেক আগ্রহ-উদ্যমে ইলম অর্জনে এগিয়ে আসে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই হঠাৎ করে ইসলাম, তাওহিদ ও ইলমের প্রতি তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। তাই আপনাদের অবশ্যই সবর ধরে রাখতে হবে।

কখনো এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ থাকে, আবার কখনো কখনো এটা পুরোপুরিভাবে শয়তানের কারসাজির কারণে হয়। আমি এমন অনেককেই চিনি যারা মদীনা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবার তীব্র আগ্রহ নিয়ে শুরু করে। আপনারা হয়তো জানেন, এখানে ভর্তি হবার একটি মোটামুটি লম্বা প্রক্রিয়া আছে। আবেদনপত্র পাঠানো, সেটা গৃহীত হওয়া ইত্যাদিতে যে

১৬৯ *কিয়ামুল লাইল* নামে বাংলায় প্রকাশিত।

www.banglakitab.weebly.com

সময়টুকু যায়, এর মাঝে অনেকেরই ইলম অন্বেষণের স্পৃহা মলিন হয়ে যায়। তখন তারা আর মদীনায় যেতে চায় না। এ কারণেই মুসা ﷺ-কে খিজির ﷺ বারবার বলেছিলেন,

إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (সূরা আল-কাহফ, ৬৭)

তালিবুল ইলমগণ এক মহৎ পথের পথিক, তাই এ পথে তাদের অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। রাতারাতি ইসলাম শেখা যায় না, এ জন্য প্রয়োজন সবর, অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা।

কখনো কখনো আপনার উস্তাদ ও শিক্ষকের ব্যাপারেও আপনার সবর করতে হবে। আমি বেশ কয়েকজন শাইখের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পেয়েছি। তাদের একজনের কথা আমার মনে আছে। আমি কখনো তাঁর মুখে মুচকি হাসি দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। তাঁর কাছে প্রশ্ন করার পর প্রশ্নকারীকে বকুনি খেতে হয়নি বা লজ্জিত হতে হয়নি, এমন খুব কমই হতো। কিন্তু তাই বলে আমরা সেখান থেকে চলে আসিনি।

শাইখ আহমাদ বাসাফ একবার শাইখ নাসির আল-আকিলকে প্রশ্ন করলেন, আকিদাহর ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশি জানেন? শাইখ নাসির আল-আকিলকে এ প্রশ্ন করার কারণ হলো, তিনি আকিদাহর ওপর মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন। আকিদাহর ব্যাপারে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছ থেকে আকিদাহর শিক্ষা লাভ করেছে। তো শাইখ নাসির আল-আকিলকে প্রশ্ন করা হলো, আকিদাহর ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশি জানেন? তিনি বললেন, পৃথিবীর বুকে এমন কাউকে আমি চিনি না যিনি আকিদাহর ব্যাপারে শাইখ আবদুল্লাহ আল-গুনাইমানের চেয়ে বেশি জানেন। আমি মনে করি শাইখ নাসির আল-আকিলের এই কথা সম্পূর্ণ সঠিক। আমি আর বাবা দুজনেই শাইখ আবদুল্লাহ আল-গুনাইমানের কাছে পড়েছি। শাইখের কাছে বাবা অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি আমাকে পড়ান। তাঁর কাছে পড়ার সময় আমার নিয়মিত তাঁর বাসায় যাওয়া হতো। এ ছাড়া মদীনা ইউনিভার্সিটিতেও তিনি আমাদের পড়াতেন। সপ্তাহে তিন বা চার দিন মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি হারামেও দারস দিতেন।

আমার ভুল হতে পারে, তবে আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি কখনো তাঁর মুখে হাসি দেখিনি। একবার শাইখ গুনাইমানের বাসায় এক বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। দারসের মাঝখানে আমার বন্ধু কিছু একটা জিজ্ঞেস করায় তিনি কড়াভাবে বকুনি দিয়েছিলেন। ফেরার পথে গাড়িতে আমার বন্ধু বলেছিল, তুমি আর কোনো দিন আমাকে এখানে আনবে না। শাইখ খুব শক্ত মানুষ ছিলেন, আর এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য সবাইকে যথাযথ শিক্ষা দেয়া কিংবা এটাই হয়তো তাঁর প্রকৃতি ছিল। আমি এই মহিরুহের কাছে এসেছি ইলম অর্জনের জন্য, এটাই আসল কথা। আল্লাহ ﷻ তাঁকে ও আমার বাবাকে নেক আমলপূর্ণ দীর্ঘ হায়াত দিন এবং বারাকাহ্ দিন।

www.banglakitab.weebly.com

সারকথা হলো, ইলম হাসিলের জন্যও সবর দরকার। আজকের দিনে ছাত্রদের সাথে ছোট বাচ্চার মতো আচরণ না করলে হঠাৎ একদিন দেখা যায় সে অধৈর্য হয়ে উধাও হয়ে গেছে। আপনি যদি তাকে মাথায় তুলে না রাখেন, তাহলে দেখা যাবে সে আপনাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো এক প্রান্তে নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করে বসবে। কিন্তু এমন মনোভাব রাখা যাবে না। সবরকে আপনার দুচোখের মাঝে রাখুন। আপনি একজন তালিবুল ইলম হিসেবে যাত্রা করছেন, কাজেই আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে।

আশ-শাফে'ঈ ﵀-এর বক্তব্য

সূরা আল-আসরের শেষে লেখক ইমাম শাফে'ঈ ﵀-এর যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ইলমের আন্তরিক ও গভীর অধ্যবসায়ী ছাত্রদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ.

> আশ-শাফে'ঈ ﵀ বলেছেন, 'আল্লাহ ﷻ যদি তার বান্দাদের জন্য এই সূরাটি ছাড়া আর কোনো সূরাই নাযিল না করতেন, তাহলে এটাই সবার জন্য যথেষ্ট হতো।'

এই উদ্ধৃতির ব্যাপারে বেশ কিছু কথা আছে। প্রথমত, মন্তব্যটির দিকে লক্ষ করুন। এই বক্তব্যের মূলকথা কিন্তু এই না যে, আমাদের জন্য কেবল এই একটি সূরা ছাড়া আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। সমস্ত কুরআনকে একপাশে রেখে দিয়ে আপনি শুধু সূরা আল-আসরকে নেবেন, এমন কিছু কিন্তু এখান বলা হচ্ছে না। বরং এর অর্থ হলো, হিদায়াত ও মুক্তির পথে চলার অনুপ্রেরণা, সাহস ও সামগ্রিক একটি দিকনির্দেশনা দানে এই একটি সূরাই যথেষ্ট। আলিমগণ যখন এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন তখন এটা বোঝানোই তাদের উদ্দেশ্য।

লক্ষ করুন, আমি বলছি কিছু কিছু আলিম যখন এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন, কারণ আমি একে ইমাম শাফে'ঈ ﵀-এর হুবহু উদ্ধৃতি মনে করি না। *উসুল আস-সালাসাহ*তে আসা এই উদ্ধৃতিটির কোনো সনদ পাওয়া যায় না।

আমার শাইখদের একজন হলেন মালির বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারি ﵀। ফ্রেঞ্চ সন্ত্রাসীদের কবল থেকে বাঁচতে খুব অল্প বয়সে তিনি মালি থেকে হিজরত করে মক্কা-মদীনায় এসেছিলেন। এ পবিত্র ভূমিতে পা দেয়ার পর থেকে আমৃত্যু তিনি ইলমের সাধনা করে গেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের একজন আলিম। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আছেন ইবনু জিবরিন, বকর আবু যায়িদ, সালিহ আলুশ-শাইখ, শাইখ উমার ফাল্লাতাহ এবং শাইখ আতিয়্যাহ সালিম। শেষের দুজন আমার শিক্ষক ছিলেন। শাইখ সালিহ আল-হুসাইনিও তাঁর ছাত্রদের একজন। শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারি ইন্তেকাল করেন ১৯৯৭ এর দিকে। শাইখের ব্যাপারে জানার জন্য আমার কাছে অনুরোধ এসেছে, ইন শা আল্লাহ সুযোগ পেলে আমি তাকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। এ আলোচনাগুলো

www.banglakitab.weebly.com

গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শাইখ হাম্মাদের মতো আলিমরা হলেন সাহাবি ﷺ-দের ওইসব সত্যিকার অনুসারীদের একজন যারা আমাদের সময়ে অত্যন্ত বিরল। আর তাঁর মতো মানুষদের নিয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যখন আপনি সত্যিকারের উলামা সম্পর্কে জানবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন কে সত্যিকার অর্থে আলিম আর কে না।

শাইখ হাম্মাদের একটি লাইব্রেরি ছিল, যা ছিল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এই লাইব্রেরিতে একদিন শাইখকে এই উক্তিটির ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এটি সহিহ হবার ব্যাপারে কোনো সূত্র খুঁজে তিনি পাননি। আরেকজন তালিবুল ইলমের কাছ থেকে শুনেছি, শাইখ আল-আলবানি ﷺ-ও এ ব্যাপারে একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। আমি যদি শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারি ﷺ-এর কাছ থেকে আর কোনো কিছুই না শিখতাম তবুও আজীবন তাঁর জন্য দুআ করার জন্য এটাই যথেষ্ট হতো। আলহামদুলিল্লাহ তিনি আমাকে আরও বহু কিছু শিখিয়েছেন, আল্লাহ ﷻ জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। তিনি তাঁর অনেক বইয়েও এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তিনি এই উদ্ধৃতির কোনো সূত্র পাননি। তবে বাইহাকি ﷺ-এর *মানাকিবুশ শাফে'ঈ*তে একই রকম আরেকটি উদ্ধৃতির সনদ পাওয়া যায়। উদ্ধৃতিটি হলো,

لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ

লোকেরা যদি কেবল এই সূরাটি হৃদয়ঙ্গম করত, তবে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।

*উসুল আস-সালাসাহ*তে আসা উদ্ধৃতির সাথে এটার কিছু পার্থক্য আছে, তবে এই উক্তিটি ইমাম শাফে'ঈ ﷺ-এর হবার ব্যাপারে সনদ পাওয়া যায়। শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারি ﷺ-এর মতে, ইমাম শাফে'ঈ ﷺ থেকে এটি নির্ভুল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে প্রথমত, আমাদের এই উক্তিটিই ব্যবহার করা উচিত; কারণ, এর সনদ আছে। দ্বিতীয়ত, ইমাম শাফে'ঈ ﷺ কী বোঝাতে চাচ্ছেন তা এই উক্তি থেকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু কাসির, আশ-শানকিতি ﷺ সবাই তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে এই উক্তিটিই উল্লেখ করেছেন,

لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ

*উসুল আস-সালসাহ*তে যেভাবে এসেছে সেই উক্তিটি তাঁরা কেউ ব্যবহার করেননি।

তাহলে *উসুল আস-সালাসাহ*র লেখক কেন অন্য উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করলেন?

لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ

এটা দেবার কারণ কী? যখন *মানাকিব আশ-শাফে'ঈ* ﷺ থেকে পাওয়া উক্তিটির সনদ পাওয়া যায় এবং এটি অর্থের দিক থেকেও অনেক স্পষ্ট?

www.banglakitab.weebly.com

এর একটি কারণ হতে পারে যে, লেখক হুবহু উদ্ধৃত না করে এর অর্থ উল্লেখ করেছেন। আপনি যদি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব ﷺ-এর রচনাবলির দিকে তাকান ও যারা তাঁর রচনাসমূহের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন তাদের মন্তব্য লক্ষ করেন, তাহলে দেখবেন কিছু কিছু আলিম বলেছেন উদ্ধৃতি দেয়ার সময় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব ﷺ বক্তব্যের অর্থ প্রাধান্য দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে কারও গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে, তার লেখার ধাঁচ ও ধরন সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা পাবেন। সুতরাং এখানে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অর্থকে প্রাধান্য দেয়ায় কোনো সমস্যা নেই, তবে আমাদের উচিত সহিহ সনদে যে উক্তিটি এসেছে সেটা গ্রহণ করা। কারণ, প্রথমত এর সনদ আছে, আর দ্বিতীয়ত এর অর্থটি আরও স্পষ্ট।

www.banglakitab.weebly.com

দারস ১৪

এটি *উসূল আস-সালাসাহ্*র চৌদ্দতম দারস। আগের তেরোটি দারসে আমরা চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের আলোচনা শেষ করেছি। প্রথম মূলনীতিটি ছিল ইলম–আল্লাহ ﷻ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কিতাব সম্পর্কীয় জ্ঞান, দ্বিতীয়টি হলো এ ইলমের ওপর আমল, তৃতীয়টি হলো এগুলোর দাওয়াহ ও প্রচার এবং চতুর্থটি হলো এর ওপর সবর করা। এই চারটি মূলনীতির দলিল হলো সূরা আল-আসর। সূরা আল-আসর থেকেই এই চারটি মূলনীতি সংগ্রহ করা হয়েছে। চারটি মূলনীতির পক্ষে দলিল হিসেবে লেখক বুখারির একটি অধ্যায়ের শিরোনামকেও এনেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা চারটি প্রাথমিক মূলনীতির আলোচনার পরিসমাপ্তি টানব এবং এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় শেষ করব ইন শা আল্লাহ।

বুখারি থেকে উদ্ধৃত অধ্যায়ের শিরোনাম :

قَالَ البُخَارِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : بَابٌ العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ والعَمَلِ. وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ (محمد: ١٩) فَبَدَأَ بِالعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ والعَمَلِ.

লেখক বলছেন,

'বুখারি ﷺ বলেছেন, অধ্যায় : কথা ও কাজের পূর্বে ইলম। আর এর দলিল হলো, মহান আল্লাহ ﷻ-এর এই বাণী, 'জেনে রাখো (হে মুহাম্মাদ), আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং, তোমার গুনাহর কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করো...।' (সূরা মুহাম্মাদ, ১৯)। কথা ও কাজের আগে ইলমের উল্লেখপূর্বক তিনি ﷻ আয়াত শুরু করেছেন।'

এটি হলো লেখকের উদ্ধৃত *বুখারির* অধ্যায়ের শিরোনাম।

গত দারসে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আশ-শাফে'ঈ ﷺ-এর একটি উক্তির ক্ষেত্রে লেখকের দেয়া উদ্ধৃতিতে সামান্য কিছু পার্থক্য ছিল। হতে পারে লেখক আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত না করে

www.banglakitab.weebly.com

এখানে উক্তিটির অর্থ উদ্ধৃত করার কারণে এমন হয়েছে। এখানে বুখারির উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেও দুটি ছোট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আপনি যখন মূল বুখারির সাথে মেলবেন তখন এ দুটো পার্থক্য দেখতে পাবেন। এ পার্থক্যের পরিমাণ আসলে খুব নগণ্য কিন্তু তালিবুল ইলমদের এটি জেনে রাখা রাখা উচিত।

দেখুন এখানে লেখক বলেছেন,

وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى

কিন্তু *বুখারি*তে বলা হয়েছে,

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى

দুটো কথার অর্থ একই, কিন্তু শাব্দিকভাবে দুটোর মাঝে কিছু পার্থক্য আছে।

দ্বিতীয় আরেকটি পার্থক্য দেখা যায়, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব ﷬-এর দেয়া উদ্ধৃতির শেষ বাক্যে। তিনি এখানে দুটো অতিরিক্ত শব্দ যোগ করেছেন। তিনি উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—সুতরাং কথা ও কাজের আগে ইলমের উল্লেখপূর্বক তিনি আয়াত শুরু করেছেন। 'কথা ও কাজের আগে' এ শব্দগুলো লেখক অতিরিক্ত যুক্ত করেছেন। এ সংযুক্তির কারণে অর্থের কোনো পরিবর্তন আসে না। বরং এটি বুখারির বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে। তবে এটি হুবহু ইমাম বুখারি ﷬-এর দেয়া শিরোনাম নয়।

লেখক ﷬ বলেছেন,

فَبَدَأَ بِالعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ والعَمَلِ

আর ইমাম বুখারি ﷬ এ পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছেন,

فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ

লেখকের পক্ষে থেকে যুক্ত করা শব্দ হলো,

قَبْلَ القَوْلِ والعَمَلِ

লেখক কেন এই অতিরিক্ত অংশটুকু যোগ করলেন? এই পার্থক্যের কারণ কী? হতে পারে যে তিনি শাব্দিকভাবে উদ্ধৃতি দেয়ার বদলে অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন কিংবা আরও একটু ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থকে আরও স্পষ্ট করতে চেয়েছে। কারণ, বর্ধিত অংশটুকুসহ পড়লে অর্থটি আরও সহজে বোঝা যায়। আবার অনেকের মত হলো, লেখক হয়তো আল-বুখারির সংকলনের এমন কোনো সংস্করণ ব্যবহার করছিলেন যেখানে অধ্যায়ের শিরোনামগুলোতে (হাদিসে না) সামান্য পার্থক্য ছিল।

www.banglakitab.weebly.com

বুখারির শিরোনামকে দলিল সাব্যস্তকরণের কারণ :

ইমাম বুখারি ﷺ-এর হাদিস-সংকলনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। এ কথা আমরা সবাই জানি। এটি হলো এমন এক সংকলন যার বর্ণনাকারীরা হলেন আকাশের নক্ষত্রের মতো। এ সংকলনের মান, গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা ইজমার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ হলো এমন এক সংকলন যা মন্দ ও অপবাদের মূলোৎপাটন করেছে। এই গ্রন্থ হক ও হকপন্থীদের সত্যায়ন করেছে। শুধু তা-ই না, এ সংকলনের বিন্যাস, গঠনপ্রণালি ও শিরোনাম নির্বাচনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদ্ধতির দিকে দিকে খেয়াল করলে দেখবেন এগুলো থেকেও শেখার মতো অনেক কিছু আছে। আলিমদের বইতে প্রায়ই দেখবেন নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে দলিল হিসেবে তাঁরা বুখারির উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন,

قَالَ الْبُخَارِيُّ

নিজেদের কথার পক্ষে দলিল হিসেবে তাঁরা *বুখারির* দেখা শিরোনামগুলোকে পেশ করেন। *বুখারির* সংকলনের শিরোনামের যদি এই মর্যাদা হয়, তাহলে চিন্তা করুন এতে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসের মর্যাদা কেমন হতে পারে!

একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

একজন তালিবুল ইলম একবার একটি গবেষণাপত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। এর বিষয়বস্তু ছিল এক সফরে একাধিক উমরাহ করা ভালো নাকি কেবল একটি উমরাহ করা উত্তম? যেমন ধরুন, আপনি এখান থেকে মক্কাতে গিয়ে উমরাহ করলেন। মক্কায় থাকা অবস্থায় আপনি দ্বিতীয়বারের মতো আত-তানিমে গেলেন। এ রকম অনেকে করে থাকে। তারপর আপনি তৃতীয় এবং এভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমবারের মতো গেলেন, আর এভাবে বারবার উমরাহ করলেন। এটা ভালো নাকি এক সফরে কেবল একটি উমরাহ করা উত্তম? এটি একটি ফিকহি মাসআলা এবং এ নিয়ে আলিমদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা ও মতপার্থক্য হয়েছে। এমনকি চার ইমামদের মধ্যেও এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। এই তালিবুল ইলম দীর্ঘ সময় নিয়ে সমস্ত দলিল-প্রমাণাদি পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের পর তার এক বন্ধুকে বলল, সব শেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ব্যক্তির পুরস্কার নির্ভর করবে সে কিসের পেছনে প্রচেষ্টা ব্যয় করছে তার ওপর। তার বন্ধু বলল, ঠিক একই কথা বুখারির একটি অধ্যায়ে শিরোনাম হিসেবে এসেছে,

بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

অর্থাৎ, প্রচেষ্টার পরিমাপ অনুযায়ী উমরাহর সাওয়াবপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ।

আন-নাসাব (النَّصَبِ) মানে আপনি কতটুকু চেষ্টা বা পরিশ্রম করেছেন, সুতরাং প্রত্যেকে তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করবে।

www.banglakitab.weebly.com

সেই তালিবুল ইলম তখন বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা যদি আগে দেখতাম, তাহলে আমার অনেক সময় বেঁচে যেত। কেবল শিরোনাম থেকে তিনি এই উত্তর পেয়ে যেতে পারতেন। তিনি হয়তো *বুখারিতে* চোখ বুলিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে আমরা কোনো কিছু খোঁজার সময় শিরোনামের দিকে তেমন একটা মনোযোগ দিই না। আপনি হয়তো খুঁজতে খুঁজতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে গেছেন কিন্তু এর শিরোনামটাই খেয়াল করেননি। বুখারি ﷬ তার হাদিস সংকলনে অধ্যায়গুলোর যে শিরোনাম দিয়েছেন, সেটা নিয়ে যুগে যুগে আলিমগণ বইয়ের পর বই লিখে গেছেন। ইবনু হাজার ﷬-এর শরাহগ্রন্থে আপনারা এর কিছু নমুনা দেখতে পাবেন। তাঁর শরাহগ্রন্থে তিনি এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। বুখারি ﷬-এর দেয়া শিরোনামের ওপর বই লিখেছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি ﷬ ও ইবনু হামামাহ ﷬। বুখারি ﷬-এর দেয়া শিরোনামগুলো কী শুধু শিরোনাম নাকি এগুলো তাঁর ফিকহি মতামত? এ নিয়ে আলিমদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক লেখালেখি হয়েছে।

তাঁরাই ছিলেন ইলমের মহিরুহ। শুধু হাদিস-সংকলনের অধ্যায়ের শিরোনামের মাঝে এত গভীর জ্ঞান নিহিত আছে। তাঁদের লেখা বইগুলো কতটা সমৃদ্ধ চিন্তা করুন! শুধু ইলম থাকলেই এটা সম্ভব হয় না। ইলমের জগতের এই মহিরুহদের সাথে তাঁদের মালিকের এমন কোনো গূঢ় রহস্য ছিল, যা তাঁদের এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছে। ভাইয়েরা আমাকে একটা প্রোগামের কথা বলেছেন যেখানে ছয় হাজার ইসলামি বই আছে, আর সব মিলিয়ে এসব বইয়ের প্রায় ২০,০০০ খণ্ড আছে। ইন শা আল্লাহ একটি ল্যাপটপ পেলে তাঁরা আমাকে সেটা ডাউনলোড করে দেবেন বলেছেন। একটু চিন্তা করুন। বুখারি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ, ইবনু মাইন, ইবনু হাম্বল, আন- নাওয়াউয়ী, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়্যিম ﷬ প্রমুখ, হাদিসের খোঁজে কখনো কখনো সম্পূর্ণ মহাদেশ পাড়ি দিয়েছেন। আজ এত বিশাল এক জ্ঞানভান্ডার আমাদের হাতের নাগালে। ইলম এত সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও এই কিংবদন্তিদের রচনাবলির ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে এমন কোনো কিছু কেন আজকের তালিবুল ইলম ও আলিমগণ দিতে পারছেন না?

ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম বুখারি ﷬ এবং তাঁদের মতো অন্যান্য আলিমদের (রচনার মান ও সংখ্যার দিক থেকে) রচনাবলির দিকে তাকালে অভিভূত হতে হয়। গাড়ি কিংবা প্লেনে না, এ মানুষগুলো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতেন গাধা ও উটের পিঠে। তারা ল্যাপটপ সাথে নিয়ে সেভেন স্টার হোটেলে ঘুরে বেড়াতেন না। তাঁদের জীবন কেটেছে কারাগারে আসা-যাওয়া করে, আর জীবনভর নানা প্রতিকূলতার মোকাবেলায়। তাঁরা অনেক সময় স্মৃতি থেকে লিখতেন, সামনে বইপত্র নিয়ে কিংবা ল্যাপটপ খুলে বসে না। তাহলে তাঁরা কীভাবে এত বারাকাহ্ পেতেন?

وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ.....

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেন। (সূরা আল-বাকারাহ, ২৮২)

www.banglakitab.weebly.com

হ্যাঁ, ইলম অবশ্যই দরকার, কিন্তু এমন মর্যাদায় উন্নীত হতে হলে আল্লাহ ﷻ ও নিজের মাঝে বিশেষ কিছু গোপনীয়তা আপনাকে বজায় রাখতে হবে, যা কেবল তিনি আর আপনি জানবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁদের এ ধরনের কোনো গোপন সম্পর্ক বা আমল ছিল, যা সম্পর্কে তাঁদের স্ত্রী ও সবচেয়ে কাছের ছাত্ররাও জানতেন না।

আমলের আগে ইলম :

ইমাম বুখারি ﷺ অধ্যায়ের শিরোনামে এই আয়াত ব্যবহার করেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।

ফা'লাম (فَاعْلَمْ) অর্থাৎ জানো। আল্লাহ ﷻ প্রথমে বলছেন, জানো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর তারপর বলছেন এবং নিজ পাপের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। অর্থাৎ কথা ও কাজের আগে আসে ইলম। ইলম হলো তাওহিদের স্বীকৃতি ও আমল কবুলের শর্ত। নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, কথা ও আমলের সঠিক পদ্ধতি ও পূর্ণতা অর্জিত হয় ইলমের মাধ্যমে। আমলের আগে কেন ইলম অর্জন জরুরি, এর স্বপক্ষে ইমাম বুখারি ﷺ এই আয়াতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মনে রাখতে হবে, যখন আমলের কথা বলা হচ্ছে তখন অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল, সবগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। কাজেই কথা ও কাজের আগে একজন মুসলিমকে যে ইলম অর্জন করতে হবে, এ আয়াত হলো তার প্রমাণ। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কিছু করার আগে আপনার সে বিষয়ে জানতে হবে। যা জানেন না সে বিষয়ে কীভাবে আপনি আমল করবেন? এটি নিছক কমনসেন্স থেকেই আমরা সবাই বুঝতে পারি। ধরুন, আপনি চাচ্ছেন আপনার বস, বাবা কিংবা শিক্ষককে সন্তুষ্ট করবেন। তাদের সন্তুষ্ট করার আগে কীভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে, সেটা আপনাকে জানতে হবে। আপনার জানতে হবে কোন কাজগুলো তাঁদের পছন্দনীয়। নইলে এমনও তো হতে পারে যে আপনি এমন কিছু করলেন যাতে সন্তুষ্ট হবার পরিবর্তে তাঁরা বরং রেগে গেলেন। সুতরাং কথা ও কাজের আগে আসে ইলম, দলিল ও কমনসেন্স তা-ই বলে।

হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমরা ফিতরাতিভাবে জানি। আল্লাহ ﷻ-এর একত্ববাদ বা তাওহিদের শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের ফিতরাতের মধ্যে নিহিত। এই ফিতরাহ বা স্বাভাবিক প্রবণতার ওপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রক্ত-মাংসের মতোই মানুষের প্রকৃতিতে মিশে আছে তাওহিদের উপলব্ধি। একটি শিশু যখন প্রথম কথা বলতে শেখে তখন শাহাদাহ পড়িয়ে তাকে ইসলামে প্রবেশ করানো হয় না। আপনি তাকে কালেমা শাহাদাহ শেখান, কিন্তু শাহাদাহ মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে শিশু ইসলামে প্রবেশ করে না। কারণ, সে মুসলিম হয়েই জন্মেছে। ঈমান তার ফিতরাহর সাথে মিশে আছে। তবে মনে রাখতে হবে, ফিতরাতি ব্যাপারেও শিক্ষা

www.banglakitab.weebly.com

অর্জন জরুরি। কারণ, সময়ের সাথে সাথে বাহ্যিক মন্দ শক্তিগুলো এমনভাবে মানুষকে ঘিরে ধরে যে তা ফিতরাতি বিষয়কেও কলুষিত করে। এ কারণে এসব বিষয়েও জানা ও চর্চার প্রয়োজন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

জানো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (সূরা মুহাম্মাদ, ১৯)

আল্লাহ ﷻ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ইলমের কথা বলছেন। এ হলো এমন এক ইলম যা সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারলে অন্য যেকোনো জ্ঞানের অভাব ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জ্ঞান নেই, অন্য কোনো জ্ঞান তার কোনো উপকারে আসবে না। এখানে আমরা চূড়ান্ত সাফল্য ও ক্ষতির কথা, অর্থাৎ আখিরাতের কথা বলছি।

*সুনানুত তিরমিযি*তে আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় যে এই কথাটি (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলবে, এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নাম তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।[১৭০]

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ইলম অর্জনের পেছনে এত সময় দেয়ার কারণ কী? এর অন্যতম কারণ হলো কিছু মুফাসসিরিনের মতে, আল্লাহ ﷻ যখন কুরআনে বলেছেন 'তুমি কি দেখো না কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায় যার শেকড় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত আকাশপানে'[১৭১] তখন তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর কথা বলছেন। তাঁদের মতে, এই পবিত্র বৃক্ষ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এ বৃক্ষের শেকড় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়া হলো আপনার অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর গভীরতা। আর এ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলো হলো আপনার আমল, যা প্রতিনিয়ত আল্লাহ ﷻ-এর কাছে পৌঁছুচ্ছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালিমা তাইয়্যিবাহর উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের দ্বারা?

---

১৭০ *সুনানুত তিরমিযি* : ৩৪৩০; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ২৩১০

১৭১ সূরা ইব্রাহীম, ১৪

www.banglakitab.weebly.com

এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি উৎকৃষ্ট প্রজাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে উত্থিত। (সূরা ইব্রাহীম, ২৪)

রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে নাযিলকৃত আয়াত কি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য?

এটি আসলে উসূলুল ফিকহের একটি ব্যাপার। এই আয়াতে সরাসরি রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে,

فَاعْلَمْ

অর্থাৎ জানো, শেখো। এ নির্দেশ কি আপনার-আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? হ্যাঁ, এই আয়াতের নির্দেশ আমাদের সবার ওপর প্রযোজ্য। রাসূল ﷺ-এর পর আমরাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

এমন আরও আয়াত আছে যেখানে এভাবে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

হে নবি।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

হে রাসূল।

এই আয়াতগুলোও কি আমাদের জন্য প্রযোজ্য? উসূলুল ফিকহের অধিকাংশ আলিমের মতে, অন্য কোনো সুস্পষ্ট দলিল থাকলেই কেবল এ আয়াতগুলো আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় আমরা এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হব না। তবে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ, ইমামুল হারামাইন ও ইমাম সামআনি رحمهم الله-এর মতে, রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশে বলা আয়াতগুলোতে আমরাও শামিল, যদি না শামিল না হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মতটাই অধিকতর শক্তিশালী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

হে নবি, তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তখন তাদের তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে এবং ইদ্দত গণনা কোরো। (সূরা আত-তালাক, ১)

আয়াতের শুরুতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ বলা হয়েছে, কিন্তু এর

www.banglakitab.weebly.com

পরেই পুরো উম্মাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

সূরা আত-তাহরিমে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> হে নবি, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আল্লাহ তো অতীব দয়ালু, ক্ষমাশীল। (সূরা আত-তাহরিম, ১)

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু পরের আয়াতে সমগ্র উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

> আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি-লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (সূরা আত-তাহরিম, ২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধনের পর পরই উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় মতের প্রবক্তারা বলেন, এ আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্দেশ্য এবং সরাসরি সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁকে ﷺ এখানে সম্মানিত করা হয়েছে এবং তাঁর ﷺ পর এই আয়াত উম্মাহর জন্যও প্রযোজ্য। দুটো অভিমতই فَاعْلَم يا أيُّها النَّبِيُّ يا أيُّها الرَّسُولُ শব্দগুলোকে কেন্দ্র করে এসেছে, সে শব্দগুলোতে সরাসরি রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে।

উসুল আস-সালাসাহ পুস্তিকার গঠন-বিন্যাস :

এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা *উসুল আস-সালাসাহ*র প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন, নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ ﷻ-এর রহমত। এ পুস্তিকার পরবর্তী অংশ নিয়ে আলোচনার আগে আগে আমি এই বইয়ের গঠন-বিন্যাস নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। আসলে একেবারে প্রথমেই আমাদের এ আলোচনা করার কথা ছিল। কিন্তু ইচ্ছা করেই আমি বিষয়টি নিয়ে এখন কথা বলছি, কারণ এখন ব্যাপারটি আপনাদের জন্য আরও সহজবোধ্য হবে।

গত তেরোটি দারসজুড়ে আমরা কেবল চারটি প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এইগুলোর দলিল হলো সূরা আল-আসর ও আল-বুখারির উদ্ধৃতি। সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এই আলোচনা করতে আমাদের প্রায় চৌদ্দটি দারস লেগেছে এবং আলহামদুলিল্লাহ চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের ব্যাপারে আলোচনা আমরা শেষ করেছি। কিছুসংখ্যক আলিমের মতানুযায়ী, এই অধ্যায়টি উসুল আস-সালাসাহ পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত না। তাঁদের মতে, এটা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রহ.-এর একটি স্বতন্ত্র

www.banglakitab.weebly.com

রচনা, যা পরবর্তী সময় তাঁর কোনো ছাত্র *উসুল আস-সালাসাহর* শুরুতে যুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং এই আলিমদের মত হচ্ছে, চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের এই আলোচনা একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে রচিত হয়েছিল, পরে লেখকের একজন ছাত্র একে *উসুল আস-সালাসাহর* শুরুতে ভূমিকা হিসেবে যুক্ত করেছেন। আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আপনারা হয়তো আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম নামটির সাথে পরিচিত নন। ১৯৭২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এক অর্থে তিনি ছিলেন একজন মুজাদ্দিদ। তিনিই আধুনিক সময়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর আল-*ফাতাওয়া* সংকলন করেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁর ফাতওয়াগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল। ষাটের দশকে সর্বপ্রথম আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম এগুলো একত্র করেন। এ জন্য তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা পৃথিবী। তিনি তাঁর কার্যক্রম শুরু করেন আরব উপদ্বীপ থেকে। ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর কোনো লেখা, ফাতওয়া কিংবা বক্তব্য যা-ই পেতেন, তিনি সেগুলো সংগ্রহ করতেন। তারপর ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর ফাতওয়ার খোঁজে তিনি মিসরে যান। প্রথমবার মিসর সফরে শেষে তাঁকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। তবে দ্বিতীয়বার মিসর থেকে তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর বেশ কিছু লেখা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। তারপর তিনি যান লেবাননে। বার্ধক্যের কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় এ সফরে ছেলে মুহাম্মাদকেও তিনি সাথে নেন। লেবাবনে পৌঁছতে পারলেও পার্শ্ববর্তী শামে যাওয়া তাঁর জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাই ছেলেকে সেখানে পাঠান। আল্লাহ ﷻ শামবাসীদের কবুল করুন এবং তাঁদের বিজয় ত্বরান্বিত করুন। শাম থেকে তাঁর ছেলে ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর নিজ হাতে লেখা আট শ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন, যা এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ হলো, ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশ শামে পার করেছিলেন। এরপর তাঁরা প্যারিসে গিয়ে সেখান থেকে ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর লেখা এমন তেরোটি মাসায়িল উদ্ধার করেন, যা সারা আরববিশ্বে খুঁজে পাননি। তারপর তাঁরা বাগদাদে যান এবং আরও বেশ কিছু রচনা সংগ্রহ করেন, যার মধ্যে ছিল আর-*রিসালাতুত তাদমুরিয়াহ*, যা ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলির অন্যতম।

এভাবে গোটা পৃথিবী চষে তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ-এর রচনাবলি মোট সাঁইত্রিশটি খণ্ডে সংকলন করেন, যা আজ *আল-ফাতাওয়া* নামে সুপরিচিত।

আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিমের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : আবদুল্লাহ ইবনু জিবরিন, হামুদ বিন উকলাহ আশ-শুয়াইবি এবং আবদুল্লাহ ইবনু ঘ্রাইয়ান ﷺ। আপনাদের সবার পরিচিত শাইখ হামুদ বিন উকলাহ আশ-শুয়াইবি ﷺ তাঁর পালকপুত্র ছিলেন। তেরো বছর বয়সে শাইখ হামুদ ﷺ-কে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি তাঁকে দত্তক নেন, লেখাপড়া শেখান, বিভিন্ন শাইখদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠান। এভাবেই ঘরছাড়া সেই কিশোর এক সময় আমাদের সময়ের মহান ইমামদের একজনে

www.banglakitab.weebly.com

পরিণত হন। যাদের কথা বললাম, তাঁদের কেউই আজ জীবিত নেই, রহমাতুল্লাহি আলাইহি আজমাইন। আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম ﷺ-এর আরেকজন ছাত্র আবদুল্লাহ আল ফ্রাইয়ান ﷺ সমগ্র আরব উপদ্বীপে কুরআনের হালাকাহর আয়োজন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আমার ও বাবার শিক্ষকদের একজন। আল-ফাতাওয়ার পাশাপাশি ইবনু কাসিম ﷺ উলামায়ে নাজদের ষোলো খণ্ডবিশিষ্ট *আদদুরারুস-সুন্নিয়্যাহ* সংকলন করেন। ইবনু কাসিম ﷺ-কে নাজদি দাওয়াহর একজন ইমাম গণ্য করা হয়। *উসূল আস-সালাসাহ* নিয়ে আল-হাশিয়াহ নামে তাঁর রচিত প্রায় এক শ পৃষ্ঠার একটি ছোট ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে।

এতদিন আমরা যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছি, ইবনু কাসিম ﷺ-এর মতে সেটি *উসূল আস-সালাসাহ* পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর মতে এটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ﷺ-এরই লেখা, তবে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রচনা। আমার কাছে এই মতকেই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়েছে। আসলে আগে আমি এ মতের ব্যাপারে অনড় ছিলাম বলা যায়। কিন্তু শাইখ আলী আল-খুদাইর (আল্লাহ ﷻ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন) এ বিষয়ে বিপরীত মত দিয়েছেন। তাঁর মতে এই অধ্যায়টি *উসূল আস-সালাসাহ* পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত এবং *উসূল আস-সালাসাহর* ভূমিকা হিসেবেই লেখক এটি রচনা করেছেন। শাইখ আলী আল-খুদাইরের অভিমতের কারণেই আমি কিছুটা দ্বিধার সাথে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করছি, যদিও আমি মনে করি ইবনু কাসিম ﷺ-এর মতটিই অধিকতর সঠিক। এই ব্যক্তিগণ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ﷺ-এর রচনাবলির ওপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এ ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান বিশদ ও বিস্তৃত। শুধু লেখকের-ই নয়, বরং তাঁর পরবর্তী দুই থেকে তিন প্রজন্মের ছাত্রদের রচনার ব্যাপারেও তাঁরা সমান পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান রাখেন। তাঁরা এ বিষয়ে বিস্তারিত ও গভীর অধ্যয়ন-গবেষণা করেছেন, যার ফলে এই পুস্তিকার অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনা এবং এর বিন্যাস ও গঠনশৈলীর ব্যাপারে বোঝা আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। এর মর্মার্থ উদ্ধার করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়েছে। তাঁর এই বিশদ গবেষণা না থাকলে পড়ার সময় আমাদের মনোযোগ হয়তো বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। *উসূল আস-সালাসাহ* পুস্তিকাটির ব্যাপারে এ বিষয়গুলো জানাও উপকারী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এ পুস্তিকাটি শেখার পেছনে আমরা প্রচুর সময় ব্যয় করি। আর এ ব্যাপারে উল্লেখ করা না হয়, বিশেষ করে ইংরেজি বা অন্যান্য অনারব ভাষার ছাত্রদের মাঝে, তাহলে একসময় এ তথ্যগুলো বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে।

অনেককেই দেখবেন শেক্সপিয়ার কিংবা এডগার অ্যালান পো'র মতো লোকের লেখা নিয়ে অর্থহীন গবেষণায় বছরের পর বছর ব্যয় করে। এর পেছনে তারা পুরো জীবন পার করে দেয়। তারা এত গভীরভাবে এসব লেখকদের ব্যাপারে গবেষণা করে যে, আপনি তাদের কয়েক পৃষ্ঠা লেখা দেখিয়ে যদি জানতে চান এটা শেক্সপিয়ারের লেখা কি না, তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা বলে দিতে পারবে। তারা যেকোনো নকল লেখা ধরে ফেলতে পারবে এবং বলবে যে এটা কোনোভাবেই শেক্সপিয়ারের লেখা হতে পারে না, কারণ তিনি এই শব্দ

www.banglakitab.weebly.com

এভাবে ব্যবহার করবেন না, তিনি অমুক শব্দের বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম হিসেবে আমাদের মধ্যে ইবনু কাসিম, আলী আল-খুদাইর এবং নাসির আল-ফাহাদের মতো মানুষ আছেন, যারা ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব ﵀ এবং তাঁর অনুসারী নাজদি উলামায়ে কেরামের রচনাবলি গভীরভাবে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও গবেষণার মহান কাজটি করেছেন ও করছেন। আল্লাহ ﷻ তাঁদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন এবং তাঁদের মাঝে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের ওপর রাহমাহ নাযিল করুন।

এ বিষয়ে প্রকৃত গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন শাইখ নাসির আল-ফাহাদ। তিনি শুধু এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ নন; বরং এ পুস্তিকার লেখক, তাঁর ছাত্র এবং বিগত শতাব্দীগুলোতে যারা তাঁদের অনুসারী, তাঁদের সবার প্রায় সমস্ত রচনাবলি তিনি মুখস্থ করেছেন। এমন কিছু কিছু বিষয় থাকে, যা আপনার কাছে অনেক সময় সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। আপনি হয়তো একটি বই পড়লেন যেখানে এক রকম লেখা আছে, আবার অন্য বইয়ে দেখলেন কিছুটা পার্থক্য আছে, ফলে আপনার মনে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কিংবা দুটো বইয়ের বক্তব্যে আপনি ভিন্নতা দেখতে পান এবং তখন আপনাকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। এখানে কেন পার্থক্য হচ্ছে? কেন এখানে এমন বলা হলো? এমন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তখন প্রয়োজন হয়। কিংবা হতে পারে সূরা আল-আসর নিয়ে ইমাম শাফে'ঈ কিংবা ইমাম বুখারি ﵀-এর উদ্ধৃতি বিষয়ে যে পার্থক্যের আলোচনা আমরা করেছি, এমন কিছু বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে বছরের পর বছর গবেষণা ও অধ্যয়নের দরকার হয়, আর শাইখ নাসির আল-ফাহাদ এমনই গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন বিশেষজ্ঞ। উসমানি খিলাফাহর ওপর লেখা তাঁর বইয়ে এর কিছু নমুনা দেখতে পাবেন।

যা হোক, এ আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়টি পরিষ্কার করা যে, কেউ কেউ বলেছেন চারটি প্রাথমিক মূলনীতি-সংক্রান্ত অধ্যায়টি আসলে উসুল আস-সালাসাহর অংশ নয়। এটি লেখকের একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রচনা, যা পরে তাঁর কোনো ছাত্র ভূমিকা হিসেবে উসুল আস-সালাসাহর শুরুতে যুক্ত করেছেন।

এবার আসুন আমরা কীভাবে এই পুস্তিকাটা নিয়ে অগ্রসর হব তা নিয়ে একটা ধারণা দেয়া যাক। আমি এভাবে অন্য কোথায় পড়াতে দেখিনি তবে আমাদের দারসের জন্য আমরা এই পদ্ধতির অনুসরণ করব।

প্রথম অধ্যায় হলো চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের আলোচনা। আমরা আলহামদুলিল্লাহ এই আলোচনা শেষ করেছি। যেমনটা বলেছি, ইবনু কাসিম ﵀-এর মতে এই অংশটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা যেটি পরে লেখকের ছাত্ররা ভূমিকা হিসেবে সংযুক্ত করেছে। আবার শাইখ আলী আল-খুদাইরের মতে এটি মূল পুস্তিকারই অংশ।

www.banglakitab.weebly.com

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুও হয়েছে প্রথম অধ্যায়ের মতো ই'লাম রহিমাকাল্লাহ-এর আলোচনা দিয়ে। ই'লাম রহিমাকাল্লাহ–অবগত হোন, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রহম করুন। ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ দিয়ে শুরু হবার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলোকে 'তিনটি মাসায়েল' নামকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ। তাওহিদের আর-রুবুবিয়্যাহর আলোচনাকে আবার ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো তাওহিদ আল-উলুহিয়্যাহ বা শিরক এর আলোচনা। আর তৃতীয়টি হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর সাথে সম্পৃক্ত আলোচনা। এই গেল পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে মূলত মিল্লাতু ইব্রাহীমের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে। লেখক এখানে মিল্লাতু ইব্রাহীমের কথা বলেছেন এবং তিনি এ কথা বলে শুরু করেছেন,

اِعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ

জানুন, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

এটি হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায়। তবে এগুলো কি লেখক নিজে উসুল আস-সালাসাহ পুস্তিকায় যুক্ত করেছেন, নাকি তাঁর ছাত্ররা পরে এগুলোকে উসুল আস-সালাসাহর ভূমিকা হিসেবে সংযুক্ত করেছেন, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এ সবই ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব ؒ-এর লেখা এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়টি শুরু করা হয়েছে এভাবে,

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُوْلُ الثَّلَاثَةُ؟

যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সেই তিনটি মূলনীতি কী?

চতুর্থ অধ্যায়টিই এই পুস্তিকার মূল নির্যাস। এই অধ্যায়ে তিনি সেই তিনটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন, যে ব্যাপারে আমাদের কবরে প্রশ্ন করা হবে এবং পরিশেষে তিনি কুফর বিত তাগুত (الكفر بالطاغوت) ও আখিরাতের জীবন নিয়ে কিছু উপসংহার এনেছেন।

মূলত এইভাবেই পুস্তিকাটি বিন্যস্ত হয়েছে। মোটামুটি এই হলো আমাদের আলোচনার মূল আউটলাইন। আমরা এভাবে চারভাগে বিভক্ত করে, চারটি অধ্যায় ধরে নিয়ে অগ্রসর হব। আশা করি এভাবে চিন্তা করলে পুরো ব্যাপারটা বোঝা এবং আমরা কীভাবে এতদিন পড়ে এসেছি ও কীভাবে সামনে আলোচনা করব তার কাঠামোটা ধরা আপনাদের জন্য সহজ হবে। আহামদুলিল্লাহ এই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এবার আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করব।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

www.banglakitab.weebly.com

Ilmhouse

www.banglakitab.weebly.com